সংকলন

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ণ

মৎস্য সপ্তাহ '৯৮

২৩-২৯ জুলাই

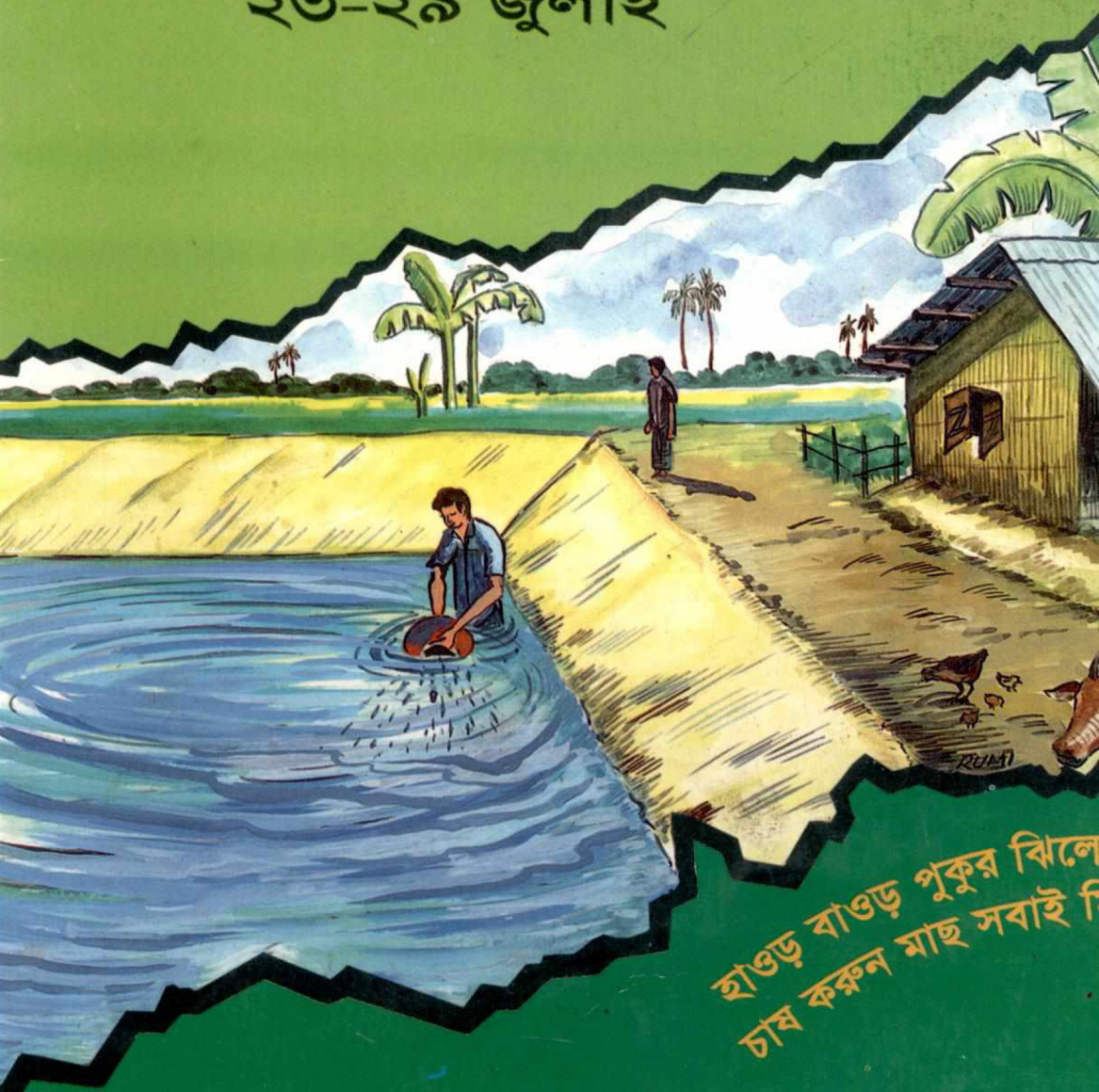

হাওড় বাওড় পুকুর ঝিলে
চাষ করুন মাছ সবাই মি

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন

মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ সংকলন

২৩ - ২৯ জুলাই

মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ উপলক্ষে সংসদ ভবন লেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক পোনা অবমুক্তকরণ

মৎস্য অধিদপ্তর

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ সংকলন

সম্পাদনা পরিষদ

এস এন চৌধুরী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	আহ্বায়ক
মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	সম্পাদক
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন প্রকল্প পরিচালক	সদস্য
মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ উপ-প্রধান	সদস্য
এস এম নাজমুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	সদস্য
ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী সহকারী প্রধান	সদস্য
অর্জুন চন্দ্র চন্দ সহকারী প্রধান	সদস্য
মোঃ আমিনুল ইসলাম মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য
এ বি এম জাহিদ হাবিব গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ লিয়াকত হোসেন যুগ্ম সম্পাদক, তথ্য দপ্তর	সদস্য
মোঃ মনির হোসেন গবেষণা কর্মকর্তা	সদস্য
মোঃ আবু বক্কার সিকদার প্রধান সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	সদস্য সচিব

প্রকাশনায়

মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

প্রকাশকাল
২৩ জুলাই ১৯৯৮

আর্থিক সহায়তা
বৃটিশ সরকারের ডি এফ আই ডি

প্রচ্ছদ
সৈয়দ রাকিবুল মইন রুমী
সিনিয়র ফটো আর্টিস্ট

কম্পিউটার কম্পোজ ও ডিজাইন
প্রিয়া কম্পিউটার
ও
বন্ধু কম্পিউটার

প্রচার সংখ্যা
১৫০০০
(সৌজন্যমূলক বিতরণের জন্য)

মুদ্রণে
গোল্ডেন প্রিন্টিং এন্ড প্যাকেজেস
২৮/বি, টয়েনবি সার্কুলার রোড
মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৫৬৯৬৫১

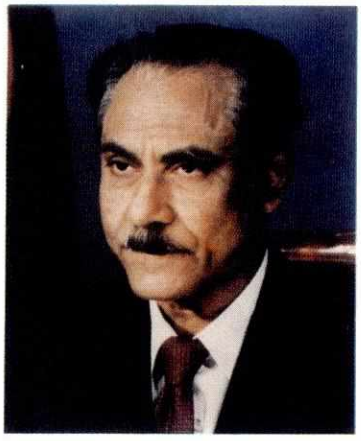

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা

০৮ শ্রাবণ ১৪০৫
২৩ জুলাই ১৯৯৮

বাণী

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত "মৎস্য সপ্তাহ ১৯৯৮"-কে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের জনগণের আমিষজাতীয় খাদ্যের চাহিদা পূরণ এবং রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের বিপুল সম্ভাবনাকে ফলপ্রসূভাবে কাজে লাগাতে হবে। জলজ সম্পদের যথার্থ ব্যবহারের মাধ্যমে বেকার জনগোষ্ঠীর একাংশের কর্মসংস্থানও সম্ভব। আধুনিক প্রযুক্তির যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত হলে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন নিশ্চিত হবে এবং দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এ খাত তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। এজন্যে জনগণের আগ্রহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণ প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে মৎস্য সপ্তাহ পালন কার্যকর ভূমিকা রাখবে বলে আমি আশাবাদী।

আমি মৎস্য সপ্তাহের সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

বিচারপতি সাহাবুদ্দীন আহমদ

প্রধানমন্ত্রী

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

০৮ শ্রাবণ ১৪০৫
২৩ জুলাই ১৯৯৮

বাণী

উন্নত ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করে দেশে বিদ্যমান সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহারের মাধ্যমে জনগণের জীবন-মান উন্নয়ন করা সম্ভব। এই লক্ষ্য অর্জনে মৎস্য খাত এক বিরাট ভূমিকা পালন করতে পারে। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে পরিবেশসম্মত মাছ ও চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণ এবং যথাযথ সংরক্ষণের বিষয়ে গণসচেতনতা সৃষ্টির জন্য মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ উদ্‌যাপন করা হচ্ছে জেনে আমি আনন্দিত।

দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে মৎস্য খাত অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক ভূমিকা পালন করে আসছে। আধুনিক ও লাগসই প্রযুক্তির ব্যাপক প্রচারণা ও প্রদর্শনীর মাধ্যমে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে মাছ চাষ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার মধ্য দিয়ে দেশে মাছের উৎপাদন কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে উন্নীত করা যেতে পারে। এ কার্যক্রমের সফল বাস্তবায়নে সরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকেও এগিয়ে আসতে হবে।

জনগণের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে মৎস্যচাষ ও সংরক্ষণ কার্যক্রমকে একটি সামাজিক আন্দোলনে পরিণত করার মাধ্যমে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও দারিদ্র বিমোচনের ক্ষেত্রে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করে জাতির জনকের 'সোনার বাংলা' গড়ার ক্ষেত্রে মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি।

আমি মৎস্য সপ্তাহ '৯৮-এর সার্বিক সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

শেখ হাসিনা

প্রতি মন্ত্রী

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৮ শ্রাবণ ১৪০৫
২৩ জুলাই ১৯৯৮

বাণী

আবহমানকাল ধরে এদেশের সর্বস্তরের জনগণের বিশেষ করে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর প্রাণীজ আমিষের চাহিদা মিটাতে, আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে ও দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য খাতের অবদান অনস্বীকার্য। বিগত বছরগুলোতে সরকারী উদোগে লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেলেও ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদার তুলনায় তা অপ্রতুল। এহেন পরিস্থিতিতে চলতি অর্থ বছরে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ১৬ লক্ষ মেট্রিক টন ধার্য করা হয়েছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে সরকারী পর্যায়ে গৃহীত বিভিন্ন কর্মসূচীর মধ্যে রয়েছে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ, সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা, উন্মুক্ত জলাশয়ে সুফলভোগীদের অংশীদারিত্বে জলমহাল ব্যবস্থাপনা, চিংড়ি সম্পদ উন্নয়ন এবং হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীর লক্ষ্যে লাগসই প্রযুক্তির উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়ন।

আমাদের দেশের মৎস্য সম্পদের বিস্তৃত উৎস এবং এর উন্নয়নের ব্যাপক সুযোগের কথা বিবেচনা করে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ সেক্টরের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সূচিত এ সেক্টরের উন্নয়নের স্রোতধারাকে অধিকতর গণমুখী করার লক্ষ্যে বিগত বছরের ন্যায় এ বছরও মৎস্য সপ্তাহ উদযাপন করার জন্য দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। দেশের মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং মৎস্যচাষে জনসাধারণকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে এবারের মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয় হলো **হাওড়-বাওড়, পুকুর-ঝিলে, চাষ করুন মাছ সবাই মিলে**।

আধুনিক পদ্ধতিতে মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রমে জনগণকে সম্পৃক্ত করতে পারলে তা তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই সর্বস্তরের জনগণকে মাছ ও চিংড়ি চাষ কার্যক্রমে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনাকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার জন্য বর্তমান সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যে আহ্বান জানিয়েছেন, মৎস্য সপ্তাহ উদযাপনের মাধ্যমে তা একটি অভিযানে রূপ নিবে বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমি মৎস্য সপ্তাহ '৯৮-এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক

সতীশ চন্দ্র রায়

সচিব

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা

০৮ শ্রাবণ ১৪০৫
২৩ জুলাই ১৯৯৮

বাণী

নদীমাতৃক এ বাংলাদেশ ঐতিহ্যগতভাবে মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ। এদেশে যেমন রয়েছে মিঠা পানির প্রাচুর্য তেমনি রয়েছে বিশাল সামুদ্রিক জলায়তন। দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য খাতের অবদানও তাই বিরাট। তবে জনগণের ক্রমবর্ধমান আমিষ চাহিদা পূরণ, বৈদেশিক অর্থ উপার্জন এবং কর্ম-সংস্থান সৃষ্টিতে এ খাতের অবদান আরো বাড়ানোর সুযোগ রয়েছে।

দেশের সকল জলাশয়কে মৎস্যচাষের আওতায় আনয়ন, মৎস্য চাষে আধুনিক প্রযুক্তি সম্প্রসারণ, পল্লী দারিদ্র্য বিমোচন তথা ৫ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের উদ্দেশ্যে ব্যাপক জনগোষ্ঠীকে এ কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ উদ্‌যাপন করতে যাচ্ছে।

বিগত বছরগুলোর ন্যায় চলতি বছরের এ প্রচেষ্টা আরো সাফল্য নিয়ে আসুক এটাই আমার প্রত্যাশা।

আইয়ুব কাদরী

মুখবন্ধ

আমাদের কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নয়নে, গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান ও দারিদ্র্য বিমোচনে, প্রাণিজ আমিষ ঘাটতি পুরণে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্য খাতের গুরুত্ব অপরিসীম ও অত্যন্ত সম্ভাবনাময়। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র ও মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের যথেষ্ট সুযোগ থাকায় মৎস্য চাষকে একটি সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বর্তমান গণতান্ত্রিক সরকার এ খাতের উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। মৎস্য খাতের অগ্রগতি ও উন্নয়ন প্রবৃদ্ধির গতিধারা অত্যন্ত আশাব্যঞ্জক বিধায় এ খাতের উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

দেশে বিদ্যমান বিশাল জলসম্পদের অপরিসীম সম্ভাবনা, মৎস্য উন্নয়নে সরকার প্রদত্ত সুযোগ সুবিধা গ্রহণের মাধ্যমে জাতীয় উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার মানসিকতা সৃষ্টি এবং সে সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে মৎস্য সপ্তাহ পালিত হচ্ছে। মৎস্য সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এ বছরও দেশব্যাপী ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। মৎস্য সপ্তাহের প্রতিপাদ্য বিষয়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্য সকল স্তরের জনগণের নিকট উপস্থাপনের জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর সাথে মৎস্য বিষয়ক বিশেষ সংকলন প্রকাশ করে সৌজন্যমূলক বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ সংকলনে সমাজের সকল স্তরের জনগণের জন্য বিশেষ করে মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী, মৎস্য রপ্তানিকারক, মৎস্য ঋণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সম্প্রসারণ কর্মী, গবেষক ও নীতি নির্ধারকদের উপযোগী করে বিজ্ঞানসম্মত, তথ্য সম্বলিত ও বস্তুনিষ্ঠ প্রবন্ধসমূহ সহজবোধ্য করে উপস্থাপন করা হয়েছে। সংকলনটি যাদের উদ্দেশ্যে নিবেদিত তাদের উপকারে আসলে এর প্রকাশনা স্বার্থক হবে।

২৩ জুলাই ১৯৯৮

মোঃ লিয়াকত আলী
মহাপরিচালক
মৎস্য অধিদপ্তর, বাংলাদেশ

সূচী

১। মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কৌশল ❑ ১
মোঃ লিয়াকত আলী

২। মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও আহরণে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অবদান ❑ ৬
গোলাম মুর্তাজা

৩। প্রযুক্তি উন্নয়নে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউটের ভূমিকা ❑ ৯
ডঃ এমএ মজিদ

৪। মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের গুরুত্ব ❑ ১৩
মোঃ নরুল আমিন

৫। উপকুলীয় মৎস্য সম্পদের উপর বেহুন্দি জালের প্রভাব ❑ ১৬
মোঃ মাসুদুর রহামন

৬। মাছ চাষে কারিগরি সমস্যা ও সমাধানের উপায় ❑ ১৮
মোঃ নজরুল ইসলাম ও মোঃ মনিরুজ্জামান

৭। উন্নতমানের মৎস্য পোনা উৎপাদনে হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা ❑ ২২
ডঃ এম জি হোসেন

৮। পুকুর ব্যবস্থাপনায় মাটি ও পানির গুণাগুণের প্রভাব ❑ ২৫
মোঃ আমিনুল ইসলাম

৯। এ্যাকুরিয়ামে দেশীয় বাহারী পুঁটি মাছ ❑ ৩১
প্রফেসর, মোহাম্মদ শফি

১০। মুক্তা চাষ সম্ভাবনা ও করণীয় ❑ ৩৪
ভূইয়া এস এইচ এম কাশেম

১১। ক্ষুদ্রাকার ঘেরে গলদা চিংড়ি-কার্প মিশ্র চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল ❑ ৩৯
মোঃ রেজাউল করিম

১২। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি ❑ ৪২
মেছবাহ্ উদ্দিন আহম্মদ ও শিবব্রত নন্দী

১৩। চিংড়ি রোগ নিরাময় এবং স্বাস্থ্য সুবিধা ব্যবস্থাপনা কৌশল ❑ ৪৬
মোঃ রেজাউল করিম ও হাবিবুর রহমান খন্দকার

১৪। চিংড়ি চাষে পরিবেশ ও সমাজিক সমস্যা এবং তার প্রতিকার ❑ ৪৮
মোঃ আবুবক্কার সিকদার ও অর্জুন চন্দ্র চন্দ

১৫। কাঁকড়া চাষ ব্যবস্থাপনা ❑ ৫২
হাবিবুর রহমান খন্দকার ও মোঃ রেজাউল করিম

১৬। আর্টিমিয়া চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ ❑ ৫৫
অধ্যাপক আবদুল মালেক ভুঁইয়া

১৭। মৎস্যসম্পদ উন্নয়নে দূরশিক্ষণের ভূমিকা ❑ ৫৭
মোঃ শাহ আলম সরকার

১৮। বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য শিল্পের সম্ভবনা ❑ ৬০
সৈয়দ জাফর সাদেক

১৯। কর্মসংস্থান ও আয়ের লক্ষ্যে বিল এলাকায় মাছ চাষ ❑ ৬২
ডঃ এস ডি ত্রিপাঠি ও দেবাশীষ মজুমদার

২০। সেচ প্রকল্প এলাকায় সমন্বিত মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম ❑ ৬৪
কে ইউ এম সহিদুর রহমান

২১। কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৌশল ❑ ৬৮
এম এ হাই

২২। অংশীদারিত্বমূলক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা ❑ ৭০
মোঃ আবদুল খালেক ও সৈয়দ আরিফ আজাদ

২৩। মৎস্য চাষে পল্লী উন্নয়ন ❑ ৭২
এ কে বর্মণ

২৪। রুই জাতীয় মাছ চাষ ও সম্প্রসারণ কৌশল ❑ ৭৪
মোঃ আবদুল লতিফ খান

২৫। মৎস্য ও পশু সম্পদ উন্নয়নে ডাকউইডের ভূমিকা ❑ ৭৭
মুহঃ আজিজুল করিম

২৬। সমাজভিত্তিক মৎস্য অভয়াশ্রম ঃ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল ❑ ৭৯
মোঃ মোকাম্মেল হোসেন ও এস এম নাজমুল আলম

২৭। উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ ❑ ৮৫
আনোয়ারা বেগম শেলী ও এস এম নাজমুল আলম

২৮। সুন্দরবনে মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ❑ ৮৭
ডঃ মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্

২৯। হ্যাসাপ ভিত্তিক মৎস্য মাননিয়ন্ত্রণে ভেরিফিকেশনের গুরুত্ব ❑ ৯১
এস এন, চৌধুরী ও মোঃ রফিকুল ইসলাম

৩০। প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় মাথাযুক্ত চিংড়ি সরবরাহ মানোন্নয়নের পূর্বশর্ত ❑ ৯৫
মোঃ কদর আহমদ ও জি.কে.এস.এম সৈয়দ আমিন

৩১। মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরনে সামগ্রীক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ❑ ৯৮
প্রফেসর ডঃ মোঃ কামাল ও পল্লব কুমার সরকার

৩২। মৎস্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান ❑ ১০০
রাখাল চন্দ্র কংশ বণিক ও নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন

৩৩। প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর ❑ ১০৩

৩৪। মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ শ্রেণীয় কর্মসূচী ১০৮

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা কৌশল

মোঃ লিয়াকত আলী
মহাপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর

ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি মিটাতে মৎস্য সম্পদের ভূমিকা অতীব গুরুত্বপূর্ণ। জাতীয় আয়ের ৫ ভাগ এবং কৃষি সম্পদের ১৬.৭ ভাগ মৎস্য সম্পদের অবদান। সার্বক্ষণিক ১২ লক্ষ এবং খন্ডকালীনভাবে ১ কোটি ২০ লক্ষ লোক মৎস্য সেক্টরে নিয়োজিত থেকে জীবিকা নির্বাহ করছে। পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ অন্যান্য আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মাধ্যমে মৎস্য সম্পদের অবদান উত্তরোত্তর বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে। অভ্যন্তরীণ জলাশয় এবং সামুদ্রিক ও তৎসংলগ্ন উপকূলীয় অঞ্চল মৎস্য উৎপাদন ও আহরণের উৎস। অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪৩.৩৭ লক্ষ হেক্টর-এর মধ্যে প্লাবনভূমিসহ মুক্ত জলাশয় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর, পুকুর-দীঘি ১.৪৭ হেক্টর এবং উপকূলীয় চিংড়ি খামারসহ বাঁওড় ১.৪৩ লক্ষ হেক্টর। তটরেখা বরাবর ২০০ নটিকেল মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকাসহ সামুদ্রিক জলাশয়ের আয়তন প্রায় ১.৬৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার। ১৯৯৬-৯৭ সনে দেশে মাছের মোট উৎপাদন ১৩.৭০ লক্ষ মেট্রিক টন। যার মধ্যে ১০.৭৯ লক্ষ মেট্রিক টন অভ্যন্তরীণ জলাশয় থেকে এবং ২.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন সামুদ্রিক উৎস থেকে।

জাতীয় অর্থনীতিতে, কর্মসংস্থানে এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও এ সেক্টরের উন্নয়নের জন্য জাতীয় পর্যায়ে প্রচেষ্টা সব সময়ই সীমিত ছিল। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে মোট সরকারী বরাদ্দের শতকরা ১.৫৮ ভাগ (৩৫০ কোটি টাকা), চতুর্থ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় মোট বরাদ্দের শতকরা ১.৭৮ ভাগ (৭৫০ কোটি টাকা) এ সেক্টরের জন্য নির্ধারিত ছিল। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শতকরা ০.২৯ ভাগ (৫৮৬ কোটি টাকা) মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য বরাদ্দ করা হয়েছে এবং এই পরিকল্পনার শেষ বছরে (২০০১-২০০২ সালে) দেশে ২০.৭৫ লক্ষ মেট্রিক টন মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হলো মৎস্যচাষী ও মৎস্যজীবীদের স্থিতিশীল সুবিধা নিশ্চিতকরণের নিমিত্তে মৎস্য সম্পদের উৎপাদন ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন, বেসরকারী উদ্যোক্তাদের উৎসাহ ও সেবা প্রদান, সার্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি সাধন এবং বেকার যুব সমাজের কর্মসংস্থান ও আয়ের সুযোগ সৃষ্টি করা। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রধান উদ্দেশ্যগুলো হলো ঃ

- মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি ও পুষ্টিমান উন্নয়ন।
- মৎস্য ও মৎস্য সংশ্লিষ্ট শিল্পে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি।
- মৎস্যজীবী, মৎস্যচাষী ও মৎস্যখাতে নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট সকলের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।
- চিংড়ি, মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানী আয় বৃদ্ধি করা।
- জলজ পরিবেশ ও জনস্বাস্থ্য উন্নীত করা।
- মৎস্য সম্পদের জৈবিক ও প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থাপনা প্রক্রিয়ার উন্নয়ন।
- মৎস্য আহরণ, অবতরণ ও বাজারজাতকরণের ব্যবস্থা উন্নয়ন।
- মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের মান উন্নয়ন।
- মৎস্য গবেষণা, ব্যবস্থাপনা, সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড উন্নয়ন।

উন্নয়ন সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্র

মৎস্য ক্ষেত্রে উন্নয়নের অপরিমেয় সম্ভাবনা রয়েছে। বিদ্যমান এ সম্ভাবনাকে উৎসারিত করে কাঙ্ক্ষিত ফলাফলে রূপান্তর করতে প্রয়োজন উদ্ভাবিত লাগসই প্রযুক্তি সম্পর্কে মৎস্যচাষীদের প্রশিক্ষণ, উদ্বুদ্ধকরণ এবং উপকরণ সহজলভ্য করার জন্য প্রয়োজনীয় বিনিয়োগ। মৎস্য ক্ষেত্রে

বিনিয়োগে ঝুঁকি কম এবং বিনিয়োগকৃত অর্থ ফেরত আসে অল্প সময়ে। জাতীয় পুষ্টি চাহিদা পূরণ, গ্রামীণ কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও রপ্তানী আয় বৃদ্ধির জন্য নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে উন্নয়ন কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে।

(ক) বদ্ধ জলাশয়ের মৎস্য চাষ নিবিড়করণ ঃ আমাদের দেশে প্রায় ১৩ লক্ষ পুকুর-দীঘি রয়েছে যার আয়তন ১,৪৬,৮৯০ হেক্টর। মৎস্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারণ সেবার ফলে বদ্ধ জলাশয়ে উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়ে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন ২ টনে উন্নীত হয়েছে। এখানে উল্লেখ্য যে, মৎস্য অধিদপ্তরাধীন উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ প্রকল্প এলাকায় দীঘি-পুকুরে হেক্টর প্রতি ১০ টন পর্যন্ত মাছ উৎপাদিত হয়েছে। উন্নয়ন প্রকল্প এলাকায় কারিগরী জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তার তত্ত্বাবধানে উন্নততর প্রযুক্তি হস্তান্তর, মৎস্য চাষীদের প্রশিক্ষণ, প্রদর্শন, উদ্বুদ্ধকরণ ও মনিটরিং এবং সেই সাথে উৎপাদন উপকরণ সহজ প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে এ অধিক উৎপাদন সম্ভব হয়েছে। বদ্ধ জলাশয়ে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ করতে হবে।

(খ) গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদন ঃ মাছ চাষের প্রধান উপকরণ পোনা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে স্বাধীনতাত্তোরকালে দেশে সরকারী পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তরের অধীনে শতাধিক মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার প্রতিষ্ঠা করা হয়। এসব খামার হতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে বেসরকারী পর্যায়ে ৬৩১টি হ্যাচারী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারী-বেসরকারী এসব হ্যাচারী হতে বছরে প্রায় ১১৬০০০ হাজার কেজি রেণু উৎপাদিত হয়। হ্যাচারী পরিচালনাকারীদের কৌলিতাত্ত্বিক জ্ঞানের সীমাবদ্ধতার জন্য আন্তঃপ্রজনন সমস্যার সমাধানকল্পে হ্যাচারী পরিচালনাকারীদের উন্নত ব্রুড মাছ ব্যবস্থাপনা ও কোলিতত্ত্বের মৌলিক বিষয়ে সম্যক ধারণা প্রদানের জন্য ব্যাপকভিত্তিতে প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন কার্যক্রম পরিচালিত হচ্ছে।

(গ) মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা প্রতিষ্ঠা ঃ গুণগত মানসম্পন্ন পোনার পাশাপাশি উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রধান অন্তরায় তৈরী খাদ্যের অভাব। দেশে মাত্র ২-৩টি মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা রয়েছে। বর্তমানে বার্ষিক ৫-৬ লক্ষ টন তৈরী মৎস্য খাদ্যের চাহিদা রয়েছে। গুণগত মানসম্পন্ন তৈরী মৎস্য খাদ্য উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে এ ধরনের শিল্প স্থাপনে বেসরকারী উদ্যোক্তাদের সহজ শর্তে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা প্রদান করতে হবে।

(ঘ) মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ঃ দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের প্রায় ৫০ শতাংশ আসে উন্মুক্ত জলাশয় থেকে। কিন্তু এ উৎপাদন প্রায় সবটাই প্রকৃতিনির্ভর হওয়ায় উৎপাদন হার অত্যন্ত কম। উৎপাদন হার বৃদ্ধি করতে হলে মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ, মৎস্য আইন বাস্তবায়ন এবং কমিউনিটিভিত্তিক ব্যবস্থাপনা, অভয়াশ্রম স্থাপন, মাছের আবাসস্থল সংরক্ষণ ও উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। বাংলাদেশের প্রায় ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর মুক্ত জলাশয়ে সহনীয় উৎপাদন বজায় রাখার লক্ষ্যে নির্দিষ্ট উন্মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ, প্লাবনভূমিতে নার্সারী স্থাপন এবং জৈব পরিচর্যা বজায় রাখতে হবে। মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাকে সম্পৃক্ত করতে হবে। মৎস্যজীবীদের প্রশিক্ষণ, জাটকা ও ছোট মাছ ধরা নিষিদ্ধকরণ আইন বাস্তবায়ন এবং জৈব পরিচর্যা শীর্ষক প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়নে দক্ষ জনশক্তি নিয়োগ করতে হবে।

(ঙ) পরিবেশ সহনীয় চিংড়ি চাষ উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশের অর্থনীতিতে চিংড়ি সম্পদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিশ্ব বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের উপকূলীয় জেলাসমূহে চিংড়ি চাষের ব্যাপক বিস্তার ঘটে। সরকার চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নের মাধ্যমে এ থেকে বছরে ৩০০০ কোটি টাকার সমপরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা সম্ভব। চিংড়ি সম্পদ উন্নয়নে চিংড়ির আহরণোত্তর মান নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা আন্তর্জাতিক মানে উন্নীতকরণ, বিপণন ব্যবস্থা জোরদারকরণ ও সঠিক মূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

(চ) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ বর্তমানে মাছের মোট উৎপাদনের প্রায় শতকরা ২৫ ভাগ সামুদ্রিক মৎস্যের অবদান। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণে মন্ত্রিপরিষদ অনুমোদিত ৭৩টি ট্রলারের মধ্যে ১৩টি ট্রলার সামুদ্রিক মৎস্য ও ৪৭টি ট্রলার চিংড়ি আহরণে নিয়োজিত রয়েছে। প্রাপ্ত তথ্য অনুসারে সমুদ্রের তলদেশের মাছের মজুদ-এর ভিত্তিতে বর্তমানে সর্বোচ্চ সীমায় মৎস্য আহরণ করা হচ্ছে। অন্যদিকে গভীর সমুদ্রে উপরিস্তরের মাছের

মজুত সম্বন্ধে কোন তথ্য না থাকায় এর বাণিজ্যিক আহরণ হচ্ছে না। সমুদ্রের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে বিচরণশীল ট্যুনা ও মেকারেলজাতীয় উপরিস্তরের মাছের উপস্থিতি, প্রাচুর্য ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য আহরণের জন্য অনুসন্ধান কার্যক্রম লাগাতারভাবে চালিয়ে যেতে হবে।

(ছ) মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণ ঃ রপ্তানী আয়ে মাছ ও মৎস্যজাত পণ্যের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আমদানীকারক দেশগুলো মাছ ও চিংড়ির যথাযথ মান বজায় রাখার লক্ষ্যে উৎপাদন, আহরণ, পরিবহন, প্রক্রিয়াজাতকরণ, জাহাজীকরণসহ সকল পর্যায়ে কঠোর মান নিয়ন্ত্রণ নিশ্চিত করার শর্ত আরোপ করছে। রপ্তানীযোগ্য মাছ ও চিংড়ির গুণগতমান নিশ্চিত করার প্রথম শর্ত হিসেবে সরকারী পর্যায়ে পর্যাপ্ত সংখ্যক অবতরণ কেন্দ্র স্থাপন করতে হবে এবং বেসরকারী উদ্যোগে বরফ কল প্রতিষ্ঠায় সহজ শর্তে বিনিয়োগ সুবিধা দিতে হবে।

উন্নয়ন কর্মধারা বাস্তবায়ন

মৎস্য অধিদপ্তরের বর্ণিত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অর্জনের জন্য সীমিত জলবল দিয়ে বিভিন্ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করে আসছে। এর মধ্যে উন্নয়ন প্রকল্পের মাধ্যমে যে সকল কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে তন্মোধ্যে মৎস্য চাষ ব্যবস্থাপনা জোরদারকরণ ও উন্নয়ন, মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ, ট্রিকল ডাউন পদ্ধতির মাধ্যমে পুকুর, দীঘি ও অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য চাষ কার্যক্রম জোরদারকরণ, উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্যজীবীদের অংশীদারিত্বে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা, লোনা ও মিঠা পানির চিংড়ি পোনা উৎপাদনের লক্ষ্যে হ্যাচারী স্থাপন ও উন্নয়ন, সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারী এবং বেসরকারী উদ্যোক্তাদের মৎস্য চাষ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশিক্ষণ ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাছাড়া ক্ষুদ্র কৃষক ও ভূমিহীনদের সংগঠিত করে কারিগরী সহায়তা ও ঋণ প্রদান এবং উৎপাদন উপকরণ সরবরাহের মাধ্যমে বাণিজ্যিকভিত্তিতে মৎস্য উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হবে। বিদেশে চিংড়ি রপ্তানী বৃদ্ধির লক্ষ্যে চিংড়ির গুণগত মান সংরক্ষণকল্পে চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র ও সার্ভিস সেন্টার স্থাপন এবং হ্যাসাপভিত্তিক মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণ প্রকল্পও সময়োপযোগী করা হচ্ছে। মৎস্য চাষী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান, গবেষণার মাধ্যমে বিভিন্ন প্রজাতির মৎস্য উৎপাদন ও চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন এবং প্রযুক্তি হস্তান্তর সংক্রান্ত কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্যও প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতায় ১৯টি প্রকল্প বিভিন্ন আঙ্গিকে মৎস্য খাতের উন্নয়নের ধারাকে ত্বরান্বিত করছে। এই সকল প্রকল্পগুলো দেশের মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি, জনগণকে মৎস্য চাষে আগ্রহী করাসহ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করছে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রতিবন্ধকতা

অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে ক্রমাগত হারে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও লাগসই প্রযুক্তি প্রয়োগ এবং সম্প্রসারণ সেবা সীমিত থাকায় অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের উৎপাদনশীলতা কাঙ্ক্ষিত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে না। জলাশয়ে অতিমাত্রায় মৎস্য আহরণ, মৎস্য প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রগুলোর পরিবেশগত ক্ষতি সাধন ইত্যাদি কারণে উৎপাদন হ্রাস পাচ্ছে। সামুদ্রিক মৎস্যের ক্ষেত্রে আর্টিশনাল মৎস্যজীবীর সংখ্যাধিক্যের কারণে মৎস্য আহরণ সর্বোচ্চ সহনশীল মাত্রায় উপনীত হয়। দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের পথে চিহ্নিত সমস্যাগুলো নিম্নে উল্লেখ করা হলো ঃ

(ক) দেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়হীনতা ও অপরিকল্পিত উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের ফলে মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে সৃষ্ট সমস্যাদি, যেমন কৃষি কাজে সেচের জন্য বাঁধ নির্মাণ, কলকারখানা ও পৌর এলাকার বর্জ্য পদার্থের দ্বারা জলাশয় দূষণ, নদীর তলদেশ ভরাট হয়ে যাওয়ার ফলে মাছের প্রাকৃতিক প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্রগুলো বিনষ্ট করে ফেলা।

(খ) সরকারী জলাশয়ের ব্যবহার অধিকার এবং প্রাপ্যতা সম্পর্কে নীতিমালার অভাব, বিনিয়োগের নিমিত্তে ব্যক্তিগত পুঁজির অভাব, প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দক্ষ জনশক্তির অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ প্রাপ্তির অপ্রতুলতা এবং মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের জন্য প্রাতিষ্ঠানিক দুর্বলতা।

(গ) উপকূলীয় চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে চিংড়ি পোনা এবং উৎপাদন সামগ্রীর অপ্রাপ্যতা, চিংড়ি পোনার জন্য প্রাকৃতিক উৎসের ওপর অধিক মাত্রায় নির্ভরতা, চিংড়ির রোগ-বালাই, উচ্চ বিনিয়োগ খরচ, ভূমি ব্যবহারে আন্তঃখাতের প্রতিযোগিতা, নিরাপত্তার অভাব, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রযুক্তি প্রয়োগ সংক্রান্ত জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও সমন্বিত নীতিমালার অভাব।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের কৌশল

(ক) মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনা ঃ পঞ্চম পরিকল্পনাকালে মুক্ত জলাশয়ের বিভিন্ন উৎস, যথা- নদ-নদী, বিল-বাওড়, কাপ্তাই লেক, প্লাবন ভূমি এবং আধা-বদ্ধ জলাশয়ের বর্তমান উৎপাদন ৬.৫৮ লক্ষ টন হতে ১০.৯৮ লক্ষ টনে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এ আলোকে বর্ধিত উৎপাদন লক্ষ্যমাত্রায় উপনীত হওয়ার জন্য যে সকল কৌশল ও কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে তা নিম্নরূপ ঃ

(১) মৎস্য আইন প্রয়োগ আরো জোরদারকরণ এবং মৎস্যজীবীদের অংশীদারিত্বমূলক সমাজভিত্তিক মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সর্বোচ্চ সহনশীল পর্যায়ে মৎস্য আহরণের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা।

(২) নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর, প্লাবন ভূমি এবং আধা-বদ্ধ জলাশয়ে দ্রুত বর্ধনশীল মাছের পোনা মজুদের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৩) মাছ ও চিংড়ির প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র সংরক্ষণ করা।

(৪) মাছের বংশ বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন নদ-নদীতে বিশেষ উপযোগী স্থানে অভয়াশ্রম স্থাপনের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্ব আরোপ করা।

(৫) ধান ক্ষেতে মৎস্য চাষাবাদ প্রযুক্তির প্রসার করা।

(৬) নদী বা যে কোন প্রাকৃতিক উৎস হতে পোনা আহরণ বন্ধ বা সীমিতকরণের পদক্ষেপ নেয়া।

(৭) কৃষি কাজে ব্যবহৃত কীটনাশকের ব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করা।

(খ) বদ্ধ জলাশয়ে মৎস্য চাষ ঃ বাংলাদেশের বদ্ধ জলাশয়গুলো মাছ উৎপাদনের সম্ভাবনাময় উৎস। বর্তমানে ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর পুকুর এবং ৬ হাজার হেক্টর বাঁওড় এবং অসংখ্য চাষোপযোগী বদ্ধ জলাশয় রয়েছে। দেশের মোট মৎস্য উৎপাদনের শতকরা ২৮ ভাগ আসে বদ্ধ জলাশয় থেকে। পঞ্চম পরিকল্পনাকালে বদ্ধ জলাশয়ে মাছ চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের মাধ্যমে ৩.৩৫ লক্ষ টন হতে ৪.৭৭ লক্ষ টনে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

মৎস্য চাষের মাধ্যমে বর্ধিত উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিম্নোক্ত কৌশল গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

(১) দেশের চাহিদা মত মৎস্য বীজ উৎপাদনের ব্যবস্থা গ্রহণ, বেসরকারী পর্যায়ে এই প্রযুক্তির ব্যাপক সম্প্রসারণ এবং হ্যাচারী নির্মাণে সরকার ও ব্যাংক কর্তৃপক্ষের সহায়তা নিশ্চিতকরণ।

(২) দেশী-বিদেশী দ্রুত বর্ধনশীল ও উন্নত ফলনশীল মাছ চাষে জনগণকে উৎসাহিত করা।

(৩) পুকুর উন্নয়ন আইন বলবৎ করার মাধ্যমে দেশের দীঘি-পুকুরে মাছ চাষ বাধ্যতামূলক করা।

(৪) মৎস্য চাষীদের জন্য সহজ শর্তে পর্যাপ্ত ঋণ সুবিধা প্রদান করা। এনজিও-এর মাধ্যমে গরীব ও প্রান্তিক চাষীদের জন্য ঋণ সুবিধা বিস্তার করা।

(৫) থানা পর্যায়ে মাছ চাষে বিভিন্ন প্রযুক্তির ওপর প্রদর্শনী খামার পরিচালনা।

(৬) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি গড়ে তোলা।

(গ) উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষ উন্নয়ন ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে চিংড়ির চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় দেশের উপকূলীয় লোনা পানি অঞ্চলে চিংড়ি চাষ ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করে। বিগত এক দশকে চিংড়ি চাষের আয়তন ৫০ হাজার হেক্টর থেকে ১.৪০ লক্ষ হেক্টরে উন্নীত হয়েছে এবং চিংড়ির উৎপাদন ১১ হাজার টন থেকে ৪৫ হাজার টনে বৃদ্ধি হয়েছে। বেসরকারী উদ্যোক্তাদের জন্য হ্যাচারী স্থাপন, চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণ এবং সম্প্রসারণ সেবা প্রদানের মাধ্যমে চলতি পঞ্চম পরিকল্পনাকালে ৬০ হাজার টন চিংড়ি উৎপাদন করার জন্য নিম্নবর্ণিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে ঃ

(১) উপকূলীয় এলাকায় জনগণকে চিংড়ি চাষ উন্নয়ন কর্মকান্ডে ব্যাপকভাবে জড়িত করা।

(২) প্রাকৃতিক উৎস হতে চিংড়ির পোনা আহরণ প্রক্রিয়াকে উন্নত করা এবং কৃত্রিম প্রজননের মাধ্যমে চিংড়ি পোনার উৎপাদন বৃদ্ধি করা।

(৩) চিংড়ি খামারের সংখ্যা ও আয়তন সীমিত রেখে খামারের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা।

(৪) রোগ নির্ণয়ের জন্য দক্ষ জনবল সৃষ্টি এবং সঠিক প্রযুক্তির উন্নয়ন।

(ঘ) সামুদ্রিক মৎস্য সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা ঃ দেশের ৪৮০ কি.মি. বিস্তীর্ণ উপকূল এবং ২০০ নটিক্যাল মাইল একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চলে ১.৬৬ লক্ষ বর্গকিলোমিটার সামুদ্রিক জলাশয় আছে। স্বাধীনতা উত্তরকালে সামুদ্রিক

মৎস্য আহরণ ৮৫ হাজার টন থেকে বর্তমানে প্রায় ২.৬০ লক্ষ টনে উন্নীত হয়। বর্তমানে আর্টিশোনাল মৎস্যজীবীদের ৩.৪ হাজার ইঞ্জিনচালিত নৌকা এবং ১.১৪ লক্ষ সনাতনী নৌকা দিয়ে উপকূলীয় মৎস্য আহরণ করে। চলতি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে সামুদ্রিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ ২.৯৪ লক্ষ টন হতে ৪.০০ লক্ষ টনে উন্নীত করার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নোক্ত কৌশল অবলম্বন করা হচ্ছে-

(১) সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ জরিপের মাধ্যমে সহনশীল মাত্রায় আহরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা।

(২) চিংড়িসহ কতিপয় মাছের প্রজনন ক্ষেত্রে বছরের নির্দিষ্ট একটি মৌসুমে মৎস্য আহরণ বন্ধ রাখা।

(৩) গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণ জোরদার করা।

(৪) সামুদ্রিক মৎস্য আইনের প্রয়োগ জোরদার করা।

(৫) বিস্তীর্ণ উপকূলে সনাতনী ও যান্ত্রিক নৌযানের ওপর বিস্তারিত আইনের ধারাসমূহ বলবৎ বা কার্যকর জোরদার করার ব্যবস্থা করা।

উপসংহার

উন্নয়ন কর্মপরিকল্পনার সঠিক বাস্তবায়নের পূর্বশর্ত হচ্ছে লাগসই প্রযুক্তির উদ্ভাবন এবং টেকসই ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তা বাস্তবায়ন। এ লক্ষ্যে সরকারী-বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, উদ্যোক্তা এবং জনগোষ্ঠির সম্পৃক্ততা অপরিহার্য। এই সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে একবিংশ শতাব্দীতে এই খাত কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছাবে বলে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস।

মৎস্যসম্পদ উন্নয়ন ও আহরণে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশনের অবদান

গোলাম মুর্তাজা
চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন

"মাছে ভাতে বাঙ্গালী" প্রবাদটি আক্ষরিক অর্থে অনেকটা মলিন হয়ে পড়েছে। মিঠা পানির জনপ্রিয় মাছের পরিমাণ লোকসংখ্যার অনুপাতে বৃদ্ধি না পাওয়ায় প্রয়োজনীয় প্রানিজ আমিষ এর ঘাটতি পড়ে। বঙ্গোপসাগরে বিশাল সামুদ্রিক মৎস্যসম্পদ মাছ সরবরাহতে ভূমিকা পালন করতে পারে এ বিশ্বাস এবং উপলব্ধি মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণে সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা প্রদান ও পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালনের জন্য সরকারী খাতে একটি সংস্থা সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এই আঙ্গিকে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন বিগত ১৯৬৪ সালে তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তান অর্ডিন্যান্স ৪ বলে স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে বাংলাদেশ স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার পর ১৯৭৩ সালের এ্যাক্ট নং ২২ ধারায় উহা অবলুপ্ত করে নতুনভাবে বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন নামকরণ করা হয়। সরকারী মালিকানাধীন একটি স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান যাহা সম্পূর্ণরূপে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদ ও মৎস্য শিল্পের উন্নয়নে নিবেদিত।

১৯৬৪ সালে প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) সামুদ্রিক মৎস্য জরিপ ও গবেষণা, মৎস্য আহরণ, গভীর সমুদ্রে মৎস্য আহরণের নিমিত্তে ট্রলার বহরের প্রচলন, দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণ, উন্নতমানের যান্ত্রিক নৌকা প্রচলন, সর্বপ্রকার আধুনিক মৎস্য জাল উৎপাদন, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা স্থাপন, বরফকল স্থাপন, উপকূলীয় এলাকায় আধুনিক স্বাস্থ্য সম্মত মৎস্য বন্দর, মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র স্থাপন, রাঙ্গামাটি হ্রদের মৎস্য ব্যবস্থা, বিপণন ও বিতরণ, জনশক্তি উন্নয়নকল্পে মেশিন ফিশারীজ একাডেমী স্থাপন ইত্যাদি অবকাঠামো ও উন্নয়নমূলক কাজকর্ম করে আসছে।

এ আঙ্গিকে বিএফডিসি কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে প্রধানতঃ উপকূলীয় অঞ্চলে প্রতিষ্ঠিত মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণে অবিচ্ছেদ্য সুবিধাদির বিবরণ নিম্নে পরিবেশিত হল ঃ

বিদ্যমান সুবিধাদি

(ক) **অবকাঠামো নির্মাণ** ঃ মৎস্য বন্দর ঃ ১টি, মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র ও পাইকারী মৎস্য বাজার ঃ ১০টি।

(খ) বরফ কলের সংখ্যা মোট ঃ ১৩টি, দৈনিক বরফ উৎপাদন ক্ষমতা ঃ ২৭৯ টন।

(গ) হিমাগার সংখ্যা মোট ঃ ১০টি, ধারণ ক্ষমতা ঃ ৬৩৫ টন।

(ঘ) ফ্রিজিং প্ল্যান্টের সংখ্যা মোট ঃ ৪টি, ফ্রিজিং ক্ষমতা ঃ ৬১ টন দৈনিক, ব্লাস্ট ফ্রিজিং ঃ ৪৯ টন দৈনিক, প্লেট ফ্রিজিং ঃ ১২ টন দৈনিক।

(ঙ) ফ্রোজেন স্টোরে ধারণ ক্ষমতা মোট ঃ ১৩৭০ টন

(চ) ফিশমিল প্ল্যান্টের সংখ্যা মোট ঃ ৪টি, উৎপাদন ক্ষমতা দৈনিক ঃ ৮ টন।

(ছ) মৎস্য নিলাম কেন্দ্র ঃ ১০টি

(জ) মৎস্য পরিবহন ভ্যান ঃ ১০টি

(ঝ) ট্রলার সংখ্যা ঃ ৮টি

(ঞ) মৎস্য জাল কারখানা মোট ঃ ৩টি
জাল উৎপাদন ক্ষমতা (বাৎসরিক) ঃ ৪.২০ লক্ষ পাউন্ড

(ট) মেরিন ওয়ার্কশপ মোট ঃ ১টি

(ঠ) ডকইয়ার্ড/স্লিপওয়ে মোট ঃ ২টি

উপর্যুপরি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে বিএফডিসি'র সুনির্দিষ্ট অবদান নিম্নে বিশদভাবে লিপিবদ্ধ করা হল ঃ

বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদের জরিপ ও গবেষণা

জাতি সংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সহায়তায় বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন ১৯৬৬-৭১ সাল পর্যন্ত ৫ বৎসর সময়ে বঙ্গোপসাগরের সামুদ্রিক মৎস্য সম্পদ নিরূপণে প্রাক বিনিয়োগ জরিপ প্রকল্পের মাধ্যমে ব্যাপক জরিপ ও গবেষণা কার্য পরিচালনা করে। এতে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য সম্পদের জরিপ, মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রের অবস্থান নির্ণয়, বাণিজ্যিক প্রজাতির মাছ চিহ্নিতকরণ, মৎস্য সম্পর্কীয় মৌলিক পরিসংখ্যান সংগ্রহ ইত্যাদি কার্যাদি সহ সম্পন্ন করে। আবিষ্কৃত মৎস্য আহরণ ক্ষেত্রগুলোর অবস্থান নিম্নরূপ ঃ

(ক) সাউথ প্যাসেস (কক্সবাজার হতে ১০-১৫ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত)

(খ) ওয়েস্ট অব এলিফ্যান্ট পয়েন্ট (সাউথ ওয়েস্ট অব সাউথ প্যাসেস এলিফ্যান্ট পয়েন্ট হতে ৩০ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত)।

(গ) ইস্ট অব সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড হতে প্রায় ৪০ মাইল দূরে অবস্থিত)।

(ঘ) সোয়াচ অব নো গ্রাউন্ড (পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দিক ঘিরে)।

অধিকন্তু ৪৭৫টি প্রজাতির মাছের মধ্যে ৪৪টি উচ্চ বাণিজ্যিক গুরুত্বসম্পন্ন। এই জরিপের মাধ্যমে প্রথমবারের মত সামুদ্রিক জেলে গ্রাম, মৎস্য পরিবার, জেলে, মৎস্য আহরণ সামগ্রী এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার একটি কাঠামো নিরূপণ করা হয়।

বঙ্গোপসাগরে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ট্রলার দ্বারা মৎস্য শিকার প্রবর্তন

প্রকৃতপক্ষে বিগত ১৯৭২ সালে বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ কার্যক্রম এর সূত্রপাত। ১৯৭২ সালে সাবেক সোভিয়েত সরকার ১০টি ট্রলারের একটি বহর উপহার হিসেব প্রদান করে। উক্ত ট্রলারগুলোর পরিচালনার ভার বিএফডিসি এর উপর ন্যাস্ত করা হয়। প্রথম দিকে এগুলো রাশিয়ান জনশক্তি দ্বারা পরিচালিত হয়। পরবর্তীতে পর্যায়ক্রমে প্রশিক্ষিত বাংলাদেশী জনবল তাদের স্থলাভিসিক্ত হয়। পর্যাপ্ত প্রশিক্ষিত জনবল তৈরীর জন্য ১৯৭৩ সালে সোভিয়েত রাশিয়ার সহায়তায় বিএফডিসি একটি ট্রেনিং ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করে বিভিন্ন বিষয়ে যেমন- নেভিগেশন, মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফিশ প্রসেসিং, ফিশিং গিয়ার টেকনোলজি, ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রোনিক ইত্যাদি বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়। বর্তমানে প্রায় দেশের ৬০টি ট্রলার ঐ সমস্ত দক্ষ জনবল চালনা করছে। তাছাড়া এ ইনস্টিটিউটের প্রশিক্ষিত উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জনবল বর্তমানে মধ্যপ্রাচ্য ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ সমূহে কর্মরত আছে।

ট্রলারের দ্বারা বঙ্গোপসাগরে মৎস্য আহরণ প্রক্রিয়ায় বিএফডিসির ভূমিকা তথা ট্রলার প্রবর্তন মূলতঃ পথপ্রদর্শক এর ভূমিকা রাখে। এতে ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান উৎসাহিত বোধ করে যার ফলে বর্তমানে প্রায় ৫৫টি গভীর সমুদ্রে মৎস্য ধরার ট্রলার মৎস্য আহরণে রত আছে। ফলশ্রুতিতে সামুদ্রিক মৎস্য ও চিংড়ির আহরণ বৈজ্ঞানিক গতিলাভ করে। এতে পূর্বের নগণ্য পরিমাণ আহরিত মাছের স্থলে বর্তমানে প্রায় ৪০০০ টন চিংড়ি এবং ১৫০০০ টন মাছ আহরিত হয়।

দেশীয় নৌকা যান্ত্রিকীকরণ এবং মাছ ধরার সরঞ্জাম আধুনিকায়ন

১৯৬৪ সালে বিএফডিসি প্রতিষ্ঠার পূর্ব পর্যন্ত মৎস্য আহরণের কোন যান্ত্রিক ব্যবস্থা অনুপস্থিত ছিল। ১৯৬৬ সালে বিএফডিসি জাতিসংঘের খাদ্য ও কৃষি সংস্থার সাহায্যে "Freedoom from hunger campain scheme" এর আওতায় ২৬৫টি ইঞ্জিন সংগ্রহ করে ২৬৫টি দেশীয় জেলে নৌকাকে যান্ত্রিকীকরণ করে। অশিক্ষিত ও দরিদ্র জেলে সম্প্রদায় এই যান্ত্রিক নৌকা প্রবর্তনে মোটেও আগ্রহী ছিল না। বিএফডিসি তাদেরকে উৎসাহ উদ্দীপনা প্রদানের মাধ্যমে এর কার্যকারিতা সম্পর্কে নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। ফলে ক্রমশঃ ২৫০০ মাছ ধরা নৌকায় মেরিন ডিজেল ইঞ্জিন সংযোজনের মাধ্যমে একটি বিশাল যান্ত্রিক জেলে ইউনিট প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এতদ্ব্যতীত ১৯৭৮-৮৪ পর্যন্ত সময়ে বিএফডিসি ডানিডা সাহায্যে ও তত্ত্বাবধানে নির্মিত নৌকা নির্মাণ প্রকল্পে প্রস্তুতকৃত ৭৫০টি যান্ত্রিক নৌকা জালসহ অপেক্ষাকৃত স্বল্প মূল্যে বিতরণ করে। এই সাফল্য পরবর্তীতে বেসরকারী পর্যায়ে যান্ত্রিক জেলে ইউনিট সম্প্রসারিত হয়। ফলশ্রুতিতে ধৃত মাছের পরিমাণ প্রায় ৮০,০০০ টন হতে বৃদ্ধি পেয়ে ২,৬০,০০০ টনে উন্নীত হয়। তদুপরি জেলে সম্প্রদায়ের জীবনে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে ইতিবাচক প্রভাব পড়ে।

মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ উন্নয়নে এবং রপ্তানী বাণিজ্য সম্প্রসারণে অবদান

প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার পূর্ব পর্যন্ত কোন উল্লেখযোগ্য মৎস্য/চিংড়ি প্রক্রিয়াকরণ কারখানা বিদ্যমান ছিল না। বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন পথপ্রদর্শক হিসেবে বিজ্ঞানভিত্তিক এবং স্বাস্থ্যসম্মতভাবে চিংড়ি এবং মৎস্য প্রক্রিয়াকরণের নিমিত্তে চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, মংলা এবং ঢাকায় প্রক্রিয়াকরণ প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করে। বেসরকারী রপ্তানীকারকগণ এই সমস্ত প্ল্যান্টের সুবিধাধি এবং সেবা গ্রহণ করে পরবর্তীতে স্বউদ্যোগে প্রায় ১২৩টি মৎস্য প্রসেসিং প্ল্যান্ট প্রতিষ্ঠা করে। এতে মৎস্য/চিংড়ি এবং মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন ও রপ্তানী উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পায়। ১৯৭২ সালে এই খাতে অর্জিত ৩.০০ কোটি টাকা থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ১৯৯৫-৯৬ ইং সালে ১৫০০.০০ কোটি টাকা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়।

মৎস্য অবতরণ ও বাজারজাতকরণে বিএফডিসির ভূমিকা

বিএফডিসি কক্সবাজার, খুলনা, চট্টগ্রামে অবস্থিত তিনটি উপকূলীয় মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে বেসরকারী পর্যায়ে জেলে ও মৎস্য ব্যবসায়ীদেরকে আধুনিক মৎস্য অবতরণ সুবিধাদি প্রদান করে গুণগত মৎস্য অবতরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে উক্ত তিনটি অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে প্রায় ৬৬৩৪ মেট্রিক টন সামুদ্রিক মাছ অবতরণ এবং বিপণন করা হয়েছে। ১৯৯৪ সালে জাপানী আর্থিক সহায়তায় ৫৫.০০ কোটি টাকা ব্যয়ে চট্টগ্রামের মহোহরখালীতে একটি আধুনিক মৎস্য অবতরণ, সংরক্ষণ ও বিতরণ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। এখানে বৎসরে প্রায় ৪৫,০০০ মেট্রিক টন মাছ অবতরণ ও বিপণনের সর্বপ্রকার সুবিধাদি বিদ্যমান আছে। বরিশাল এবং পাথরঘাটায় আরো দুটি মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র শীঘ্রই পুরোদমে কাজ শুরু করতে যাচ্ছে। কক্সবাজার এবং পাথরঘাটা পাইকারী মৎস্য বাজার দুটি ৮.২৫ কোটি টাকা ব্যয়ে আধুনিকীকরণ এবং সম্প্রসারণ করা হচ্ছে। উক্ত পাঁচটি অবতরণ কেন্দ্র পুরোদমে কার্যক্রম শুরু করলে বৎসরে প্রায় ৭৭,০০০ মেট্রিক টন মাছ (সামুদ্রিক মাছের ৩০%) আধুনিক এবং স্বাস্থ্যসম্মত অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে অবতরণ এবং বিপণন সম্ভবব হবে। উপরন্তু ১৯৯৬-৯৭ সালে বিএফডিসি কাপ্তাই এবং রাঙ্গামাটি অবতরণ কেন্দ্রের মাধ্যমে কাপ্তাই লেক হতে ৫০৯২ টন মিঠা পানির মাছ অবতরণ ও বাজারজাতকরণ করা হয়েছে।

কর্পোরেশনের নিজস্ব উদ্যোগে সরাসরি মৎস্য বাজারজাতকরণ

বিএফডিসি সীমিত আকারে সরাসরি মাছ বাজারজাত কার্য পরিচালনা করে আসছে। বিএফডিসি ট্রলারের ধৃত মাছ,

কাপ্তাই লেকের শেয়ারে প্রাপ্ত মাছের অংশ, ঢাকা মহানগরের জলাশয় হতে ধৃত মাছ এবং যশোহরস্থ বিল বাঁওড়ের মাছ সরাসরি তত্ত্বাবধানে বাজারজাতকরণ করে থাকে। উপরন্তু কর্পোরেশন মৎস্য ব্যবসায়ী এবং মৎস্য চাষীদের নিকট হতে সরাসরি মাছ সংগ্রহ করে বাজারজাত করছে। মৎস্য শিকার মৌসুমে বিএফডিসি ৪টি ফ্রিজিং প্ল্যান্টের মাধ্যমে হিমায়িত মাছ মজুত করে পবিত্র রমজান মাসে এবং মাছের দুষ্প্রাপ্যতার সময় সরবরাহ করে থাকে। ঢাকা মহানগরে বিএফডিসি সরাসরি বাজারজাতকরণ, বাফার স্টক গঠন এবং যথাসময়ে বাজারজাতকরণ প্রক্রিয়া সার্বিকভাবে মাছের মূল্য স্থিতিশীলকরণে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

বিএফডিসি ১৯৭৬-৭৭ সাল হতে ৫টি খুচরা বিপণী বিতান এবং ৩০টি রিক্সা ভ্যানের মাধ্যমে সরকারী কর্মচারী এবং নিম্ন আয়ের লোকদের জন্য সুষম মূল্যে গুণমানসম্পন্ন মাছ সরবরাহ করে আসছে। ১৯৯৬-৯৭ সালে ঢাকা সহরে প্রায় ২০০ মেঃ টন মাছ এ প্রক্রিয়ায় খুচরা বিক্রয় করা হয়েছে।

মৎস্য আহরণ সামগ্রীর উন্নতিসাধনে অবদান

গতানুগতিকভাবে কার্পাস সূতার তৈরী জাল দ্বারা প্রধানতঃ মৎস্য আহরণ করা হতো। বিগত ১৯৬৫ সালে কুমিল্লায় প্রথম আধুনিক মৎস্য জাল কারখানা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সূতার জালের পরিবর্তে নাইলন জালের প্রচলন শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে মংলায় এবং চট্টগ্রামে আরো দু'টি অনুরূপ জাল কারখানা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এগুলোকে নাইলন এবং পলিপ্রপেলিন সূতা দ্বারা গিলনেট তৈরী শুরু করা হয়। উদ্ভাবিত এ সকল উন্নত মৎস্য শিকার সামগ্রীর প্রতি বেসরকারী উদ্যোক্তারা উদ্বুদ্ধ হয়ে এধরনের জাল কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নেয় এবং বর্তমানে প্রায় ২০টি এ ধরনের জাল কারখানা দেশে বিদ্যমান আছে। এ প্রক্রিয়ায় মৎস্য আহরণ সামগ্রীর আধুনিকায়নে বিএফডিসি'র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সামুদ্রিক মাছের জনপ্রিয়তা অর্জনে বিএফডিসি'র অবদান

সামুদ্রিক মাছ মূলতঃ উপকূলীয় অঞ্চলের অধিবাসীদের কাছে বহুল পরিচিত এবং জনপ্রিয় থাকলেও দেশের অন্যান্য স্থানে ইহা ছিল অজানা, অচেনা এবং অপ্রিয়। ঢাকা মহানগরে এ অবস্থা ছিল প্রকট। বিএফডিসি এর ট্রলার দ্বারা ধৃত সামুদ্রিক মাছ ঢাকা মহানগরে ১৯৭৫ সাল থেকে বাজারজাতকরণ করা শুরু করে এবং ১৯৮৭-৮৮ সাল পর্যন্ত প্রায় ৩,০০০ টন সামুদ্রিক মাছ বিপণন করে। পর্যায়ক্রমে ঢাকা মহানগর ও অন্যান্য স্থানেও সামুদ্রিক মাছ জনপ্রিয়তা লাভ করে।

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় অধীন একটি সরকারী প্রতিষ্ঠান। দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়ন ও আহরণে সর্বোতভাবে সহযোগিতা প্রদানে ইহা নিবেদিত। বঙ্গোপসাগরে বিদেশী ট্রলার দ্বারা অবৈধভাবে মৎস্য শিকার প্রতিহত করতে বিএফডিসি ওয়াচ ডগের ভূমিকা পালন করছে।

প্রযুক্তি উন্নয়নে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের ভূমিকা

ডঃ এম.এ মজিদ
মহাপরিচালক, বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট

মাছ বাঙ্গালীর দৈনন্দিন খাদ্য, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির এক অবিচ্ছেদ্য অংশ। আর সেকারণেই মাছে-ভাতে বাঙ্গালী– এই প্রবাদ বাক্যের মধ্যে দিয়ে ঘটেছিল বাঙ্গালীর পরিচিতি। কিন্তু দ্রুত জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে দেশে আজ মাছের আকাল। প্রবাদ বাক্যের সেই কিংবদন্তী তাই আজ ম্লান হতে চলেছে। অথচ দেশ জুড়ে মৎস্য উৎপাদনের যে বিশাল ক্ষেত্র রয়েছে, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিপুল পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি করা যায়।

একদা মৎস্য খাতে বাণিজ্য বাঙ্গালীর কল্পনায়ও আসেনি। অথচ আজ গবেষণা ও প্রযুক্তির উন্নয়নের সুবাদে এই খাতে পরিলক্ষিত হচ্ছে দ্রুত শিল্পায়ন–প্রতিষ্ঠিত হয়েছে অনেক হ্যাচারি, মৎস্য খাদ্য ও হিমায়িত খাদ্য তৈরীর কারখানা। বাণিজ্যিক মৎস্য চাষ ও মৎস্য খাতে শিল্পায়নে বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৮৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকে ইনষ্টিটিউট মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে অগ্রাধিকারভিত্তিক বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা পরিচালনা করে আসছে। ফলে উন্নত মৎস্য চাষ ও ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি উদ্ভাবিত হয়েছে। গবেষণা ও প্রযুক্তি উন্নয়ন ক্ষেত্রে অবদান ও ব্যাপক সাফল্যের জন্য ইনষ্টিটিউট প্রধানমন্ত্রীর মৎস্য সপ্তাহ '৯৭ স্বর্ণপদক লাভ করেছে।

উদ্ভাবিত প্রযুক্তি

উদ্ভাবিত প্রযুক্তি মৎস্য অধিদপ্তরসহ বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে চাষী পর্যায়ে সম্প্রসারণের ফলে মৎস্য উৎপাদন ১৯৮৫ সালে ৭.৭৪ লক্ষ টনের স্থলে ১৯৯৭ সালে ১৩.৭৩ লক্ষ টনে উন্নিত হয়েছে। বেসরকারী খাতে বহু মৎস্য ও চিংড়ি খামার, মৎস্য ও চিংড়ি হ্যাচারি, মৎস্য খাদ্য ও হিমায়িত মৎস্য পণ্য উৎপাদন কারখানা, অসংখ্য অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক বাণিজ্যিক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের মহিলা সমাজও মৎস্য চাষে সম্পৃক্ত হয়ে আয় ও পুষ্টি সংস্থানের পথ খুঁজে পেয়েছে। জনসংখ্যা বৃদ্ধিরোধ ও পরিবেশের ভারসাম্যতাকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিয়ে মৎস্য উন্নয়ন কর্মসূচীকে এগিয়ে নিতে সরকার তাই আজ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। এ প্রেক্ষাপটে আজ মৎস্য খাত কর্মসংস্থান ও গ্রামীন দারিদ্র্য বিমোচনের প্রধান হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। মৎস্য উন্নয়ন কর্মকান্ডকে সঠিক বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তিভিত্তিক পরিচালনা করতে পারলে দারিদ্র্য বিমোচন কর্মকান্ড ত্বরান্বিত হবে। ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিসমূহের সংক্ষিপ্ত পরিচিতিমূলক বর্ণনা নিম্নে পরিবেশিত হলো।

১। রুই জাতীয় মাছের উন্নত প্রজনন ও হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা

পুকুরে রুই জাতীয় মাছের আজ মূলত হ্যাচারি উৎপাদিত পোনার ওপর নির্ভরশীল। মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের সাথে সাথে বর্ধিত পোনার চাহিদা মিটানোর জন্য সারাদেশে সরকারী/বেসরকারী উদ্যোগে অসংখ্য হ্যাচারি স্থাপিত হয়েছে। সুস্থ, সবল পোনা উৎপাদনের জন্য হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা পদ্ধতির উন্নয়ন অত্যাবশ্যক। মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট দীর্ঘ গবেষণার মাধ্যমে হ্যাচারি ব্যবস্থাপনা ও ব্রুড মাছ পরিচর্যা পদ্ধতি উন্নয়ন করে সুস্থ, সবল ও দ্রুত বর্ধনশীল পোনা উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ব্রুড মাছ পরিচর্যা ও সঠিক সময়ে পরিমিত মাত্রায় হরমোন ইনজেকশন ব্যবহার এই প্রযুক্তির মূল মন্ত্র। এই প্রযুক্তির প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ঃ একই মাছকে বছরে দুই বা ততোধিকবার প্রজননে ব্যবহার করে বেশী পোনা উৎপাদন এবং নির্বাচিত প্রজনন ও লাইন ক্রসিং পদ্ধতি ব্যবহার করে উন্নতজাত উদ্ভাবন ও আন্তঃপ্রজনন সমস্যা এড়ানো।

২। রুই জাতীয় মাছের উন্নত আঁতুড় পুকুর ব্যবস্থাপনা

বাংলাদেশে উৎকৃষ্ট জাতের পোনার যথেষ্ট ঘাটতি রয়েছে। পোনা লালন পদ্ধতি সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞানের অভাবে এমনটি ঘটছে। এই প্রেক্ষাপটে নার্সারি পদ্ধতি, পোনার মজুদ হার, সার ও খাদ্য প্রয়োগের পরিমাণ ইত্যাদির পরিমিত মাত্রা নির্ধারণ করে দুই ধাপ নার্সারি প্রক্রিয়ায় অল্প সময়ে, অল্প পরিসরে সুস্থ, সবল ধানী ও মজুদযোগ্য আঙ্গুলী পোনা উৎপাদন করা যায়। এতে পোনার বাঁচার হার ৭০-৮০% এ উন্নীত হওয়ায় নার্সারী ব্যবস্থাকে বাণিজ্যিকভাবে অধিক লাভজনক করে তুলেছে। এই প্রযুক্তিতে ৪-৫ দিন বয়সের পোনা প্রথম ধাপ নার্সারিতে ৫০-৬০ লক্ষ ঘনত্বে ৩-৪ সপ্তাহ লালনের পর ৫-৬ লক্ষ ঘনত্বে পরবর্তী ৮ সপ্তাহ লালন করলে চাষের পুকুরে মজুদোপযোগী ৩-৪ ইঃ আকারে পোনা উৎপাদন করা যায়। এতে মাসে একর প্রতি ১০,০০০ টাকা ব্যয় করে ৮০,০০০-১,০০,০০ টাকা লাভ করা সম্ভব।

৩। কৃত্রিম প্রজননের জন্য পিটুইটারী গ্ল্যান্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষন পদ্ধতি

কৃত্রিম প্রজননে পিটুইটারী গ্ল্যান্ড (সংক্ষেপে পিজি নামে পরিচিত) এর ব্যবহার সর্বজন স্বীকৃত। এই গ্ল্যান্ড ব্যবহারে স্ত্রী ও পুরুষ মাছ প্রজননে উজ্জীবিত হয়ে উঠে। দেশী-বিদেশী রুই জাতীয় মাছের মাথার মগজের নীচ হতে এই গ্ল্যান্ড চিমটা দিয়ে সংগ্রহ করে ২০-৩০ সিসি মাপের এ্যালকোহল বা এসিটোন ভর্তি ছোট শিশিতে রাখতে হবে। ২৪ ঘন্টা পর এ্যালকোহল বা এসিটোর্ন বদলিয়ে নতুনভাবে শিশি ভরে নিতে হবে।

পরিমিত পরিমাণ পিজি ব্যবহার করে খুব সহজেই হ্যাচারিতে রুই ও মাগুর জাতীয় মাছের পোনা উৎপাদন করা যেতে পারে। সংগৃহীত পিজি প্রতি গ্রাম ২,৫০০-৩,০০০ টাকায় বিক্রি করে প্রচুর মুনাফাও অর্জন করা যায়। এ প্রযুক্তি গ্রামীণ বেকার মহিলা ও যুবক শ্রেণীর আয়ের পথ সুগম করতে পারে।

৪। পুকুরে উচ্চ উৎপাদনশীল মাছের মিশ্র চাষ

পুকুরে পানির বিভিন্ন স্তরে বিদ্যমান প্রাকৃতিক খাবারের ওপর ভিত্তি করে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিভিন্ন প্রজাতির মাছ উপযুক্ত অনুপাতে একত্রে চাষ করলে পুকুরের সকল স্তরের খাবারের পূর্ণ ব্যবহার হয়। এতে একই স্তরের খাবারের জন্য বিভিন্ন প্রজাতির মাছের মধ্যে প্রতিযোগিতা দেখা দেয় না। ফলে মাছের মোট উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক উপায়ে পুকুর প্রস্তুতের পর প্রতি শতাংশে ৩৪-৫০টি হারে রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কার্পিও, গ্রাস কার্প ও রাজপুঁটি আনুপাতিক হারে মজুদ করতে হয়। প্রতিদিন মাছের ওজনের ২-৩% হারে সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারে হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন উৎপাদন পাওয়া যায় যা অর্থনৈতিকভাবে যথেষ্ট লাভজনক।

৫। পুকুরে রাজপুঁটির চাষ

বছরে ৮৪-৫ মাস পানি থাকে এমন মৌসুমী পুকুরে চাষের জন্য এই মাছ খুবই উপযোগী। যে কোন প্রকার ডোবা, নালার ঘোলা পানিতে বিরূপ পরিবেশেও এই মাছ চাষ করা যায়। আবার বারোমাসী পুকুরে রুই জাতীয় মাছের সাথেও চাষযোগ্য। পুকুর প্রস্তুতির পর প্রতি শতাংশে ৫-১০ গ্রাম ওজনের ৬০-৬৫ টি হারে পোনা মজুদ করতে হয়। পোনা মজুদের পর প্রতি শতাংশে ৪-৫ কেজি গোবর ও সম্পূরক খাদ্য হিসেবে মাছের ওজনের ৩-৫% হারে চাউলের কুড়া প্রয়োগ করলে ৪-৫ মাসে মাছ বিক্রির উপযোগী হয় এবং হেক্টর প্রতি ১.৫-২.০ টন মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়।

৬। পুকুরে হাঁস/মুরগী ও মাছের সমন্বিত চাষ

মাছ চাষে খাদ্যের বিকল্প হিসেবে হাঁস ও মুরগীর সাথে মাছের সমন্বিত চাষ করা হয়। বারোমাসী পুকুরে এই পদ্ধতিতে মাছের মিশ্র চাষ করা যায়। প্রতিটি হাঁস-মুরগির জন্য ২-৪ বর্গ ফুট হারে পুকুরের উপর ঘর তৈরী করে প্রতি শতাংশ পুকুরে ২টি হারে হাঁস-মুরগী মজুদ করতে হবে। প্রতিটি হাঁস-মুরগীর জন্য ১০০-১২০ গ্রাম করে বিভিন্ন উপাদান মিশ্রিত খাদ্য ব্যবহার করতে হবে। হাঁস-মুরগির বিষ্ঠা পুকুরে সারের কাজ করে থাকে। এই প্রযুক্তিতে প্রতি হেক্টরে ৫-৬ টন মাছের উৎপাদন ছাড়াও বছরে প্রতিটি হাঁস-মুরগী থেকে ২৫০-৩০০টি ডিম পাওয়া যায়। তাছাড়া ব্রয়লার মুরগী ব্যবহারে ৪ সপ্তাহে ২ কেজি ওজনের বিক্রয়যোগ্য ব্রয়লার পাওয়া যায় যা অধিক লাভজনক।

৭। উন্নত শংকর জাতের মাগুরের পোনা উৎপাদন ও চাষ

দেশীয় স্ত্রী মাগুর ও আফ্রিকার পুরুষ মাগুরের সাথে প্রণোদিত প্রজনন পদ্ধতিতে শংকর জাতের মাগুর উদ্ভাবন করা হয়েছে। এই মাগুর আকৃতিতে দেশী মাগুরের মত কিন্তু আফ্রিকান মাগুরের মত দ্রুত বর্ধনশীল, খেতেও খুব সুস্বাদু, পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর নয়। অধিক ঘনত্বে মিনি পুকুর ও চৌবাচ্চায় গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগীর নাড়ি-ভূড়ি ব্যবহার করে চাষ করা যায়। প্রতি শতাংশে ৩-৪″ সাইজের ৫০০-১০০০ টি পোনা ব্যবহার করে তিন মাসে বাজার উপযোগী ২৫০ গ্রাম ওজনের মাগুর পাওয়া যায়। এতে শতাংশে ৮-৯ হাজার টাকা মুনাফা পাওয়া যায়।

৮। পাবদা ও গুলশা মাছের প্রজনন ও পোনা উৎপাদন

অত্যন্ত প্রিয় ও সুস্বাদু এ মাছ দুটি দেশের খাল-বিল, হাওড়-বাঁওড় ও নদী-নালায় পাওয়া যেতো। কিন্তু পরিবেশ বিপর্যয় ও বিবর্তনের প্রভাবে মাছ দুটি আজ বিলুপ্ত প্রায়। গবেষণার মাধ্যমে হরমোন প্রয়োগে এদের কৃত্রিম প্রজনন কৌশল উদ্ভাবন করে পোনা উৎপাদন করা হচ্ছে। মৌসুমী বা অগভীর জলাশয়ে চাষ করলে এ মাছগুলো ৫-৬ মাসে বিক্রয়যোগ্য হয়।

৯। থাই-পাঙ্গাস মাছের কৃত্রিম প্রজনন ও চাষ

মুক্ত জলাশয়ের এই মাছটি উচ্চফলনশীল ও খেতে সুস্বাদু। ডিম ধারণ ক্ষমতা বেশী বলে কৃত্রিম প্রজননে বহুল পরিমাণে পোনা পাওয়া যায়। তাছাড়া যে কোন খাদ্যে অভ্যস্ত বলে পুকুরে একক অথবা রুই জাতীয় মাছের সাথেও চাষ করা যায়। কৃত্রিম প্রজনন কৌশল রুই জাতীয় মাছের অনুরূপ, তবে পোনা লালন পদ্ধতি অনেকটা জটিল। রেণু পোনার জন্য প্রাথমিক পর্যায়ে আর্টিমিয়া বা টিউবিফেক্স খেতে দিতে হয়। দিন বয়সের পোনা নার্সারি পুকুরে প্রতি শতাংশ ২,০০০-২,৫০০ হারে মজুদ করে সরিষার খৈল, চালের কুড়া ও ফিশমিল মিশ্রিত সাধারণ খাদ্য ব্যবহারে সুস্থ-সবল পোনা পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত গভীর পুকুর অর্থাৎ ৬-৮ ফুট এই মাছ চাষের জন্য উপযোগী। ২-৩″ আকারের ৫০-৬০টি পোনা প্রতি শতাংশে মজুদ করতে হয়। মিশ্র চাষের ক্ষেত্রে পাঙ্গাসের পোনার সংখ্যা অর্ধেক এ নামিয়ে এনে বাকি অর্ধেক রুই জাতীয় মাছ আনুপাতিক হারে ব্যবহার করা যেতে পারে (সিলভার কার্প ১০, কাতল ৬, রুই ১২ এবং পাঙ্গাস ২২)। এ পদ্ধতিতে বছরে ১-১.৫ কেজি আকারে পাঙ্গাসের হেক্টর প্রতি ৫-৬ টন উৎপাদন পাওয়া যায়।

১০। মৌসুমী পুকুরে গিফট জাতের তেলাপিয়া/লাল তেলাপিয়ার চাষ

মৌসুমী পুকুরে গিফট জাতের তেলাপিয়া ও লাল তেলাপিয়া ৪-৬ মাস চাষ করে প্রতি হেক্টরে ২.৫-৩.৫ টন উৎপাদন পাওয়া যায়। অত্যন্ত শক্ত এই তেলাপিয়া অধিক ঘনত্বে বিরূপ পরিবেশেও চাষ করা যায়। শরীরের ওজনের ৩-৫% হারে শুধুমাত্র চাউলের কুড়া খাওয়ায়েই ৩-৪ মাসে এ মাছ

বিক্রয়যোগ্য হয়। নির্বাচিত প্রজনন ও জেনেটিক গবেষণার মাধ্যমে ইনষ্টিটিউট হতে গিফ্‌ট জাতের এই তেলাপিয়ার মান উন্নয়ন করা হয়েছে। ইহা দেশে বিদ্যমান অন্যান্য জাতের তেলাপিয়ার চেয়ে ৪০-৫০% অধিক উৎপাদনশীল।

১১। ধান ক্ষেতে মাছ চাষ

আমাদের দেশের ধান ক্ষেতে এক সময় কৈ, শিং, মাগুর, টেংরা, পুঁটি, শোল, টাকি ইত্যাদি ছোট মাছের যথেষ্ট প্রাচুর্যতা ছিল। কিন্তুআজ নানা কারণে এর বিলুপ্তি ঘটেছে। তাই আজ প্রয়োজন হয়ে দেখা দিয়েছে ধান ক্ষেতে মাছ/চিংড়ির সমন্বিত চাষের। এই প্রযুক্তির সুবিধা হলোঃ ধান ক্ষেতে অতিরিক্ত ফসল হিসেবে মাছের উৎপাদন, মাছ ধানের অনিষ্টকারী পোকা ভক্ষণ করায় কীটনাশকের প্রয়োজনীয়তা হ্রাসপূর্বক পরিবেশের উন্নয়ন, মাছের বিষ্ঠায় উর্বরাশক্তি ও ধানের ফলন বৃদ্ধি। ধান ক্ষেতের আইল উঁচু করে নিয়ে ধান রোপনের ১০-১২ দিন পর ৩´ আকারের রাজপুঁটি এবং মিরর কার্প অথবা তেলাপিয়ার পোনা প্রতি হেক্টরে ৩-৪ হাজারটি করে ছাড়তে হবে। ২-৩ মাসের মধ্যেই রাজপুঁটি, মিরর কার্প ১০০-১৫০ গ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। এতে ৩-৪ মাসে একর প্রতি ২০০-২৫০ কেজি মাছ এবং ১.২-২.০ টন ধানের ফলন পাওয়া যায়। একর প্রতি শুধু মাছ থেকে অতিরিক্ত ৬,০০০ টাকা মুনাফা পাওয়া যায় এবং ধানের ফলনও ১৫% বেশী হয়ে থাকে।

১২. পেনে মাছ চাষ

বাংলাদেশের অগণিত খাল, নদী-নালা, হাওড়-বাঁওড় ও আন্যান্য জলাধারে পেন তৈরি করে মাছ চাষের অফুরন্ত সুযোগ গ্রহণের ক্ষেত্রে এই প্রযুক্তি খুব উপযোগী। কেননা এ সকল মুক্ত জলাশয় নিবিড় চাষের আওতায় আনা যায়না। বাঁশের বানা বা টায়ার কর্ড জাল দিয়ে খুটির সাহায্যে পেন তৈরী করতে হয়। ৪-৫´ আকারের রুই, কাতলা, মৃগেল, সিলভার কার্প, কমনকার্প প্রতি হেক্টরে ১৬-২০ হাজার ঘনত্বে মজুদ করা যায়। মজুদকৃত মাছের ওজনের ১% হারে সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগে ৬-৮ মাসে ২.৫-৩.০ টন উৎপাদন পাওয়া যায়।

১৩। গলদা চিংড়ি গৃহাঙ্গণ হ্যাচারি

গলদা মিঠাপানির চিংড়ি। তাই সারা দেশে এর চাষের ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। কিন্তু উপকূলীয় অঞ্চলে ছাড়া পোনার দুষ্প্রাপ্যতা পুকুরে গলদা চাষের প্রধান অন্তরায়। গলদা মিঠাপানির চিংড়ি হলেও প্রজননকালে মৃদু লোনাপানির প্রয়োজন হয়। উপকূলীয় এলাকা হতে ঘন লোনাপানি সংগ্রহ করে পূনঃসঞ্চালন পদ্ধতিতে অনবরত ব্যবহারের মাধ্যমে গৃহাঙ্গণ হ্যাচারি উদ্ভাবন করা হয়েছে। দেশজ কাঁচামাল যেমন মাটি অথবা সিমেন্টের চাড়ি, প্লাষ্টিকের বালতি ও একটি এয়ার ব্লোয়ার ব্যবহার করে মাত্র ২৫-৩০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই হ্যাচারি তৈরী করা যায়। এতে একটি উৎপাদন চক্রে ১.০-১.৫০ লক্ষ চিংড়ি পোনা উৎপাদন করে একজন চাষী বছরে প্রায় লক্ষাধিক টাকা আয় করতে পারেন।

১৪। পুকুরে গলদা চিংড়ির চাষ

গলদা চিংড়ি দ্রুত বর্ধনশীল বিধায় ৪-৫ মাসে বিক্রয় উপযোগী হয়। তবে ২-৩ মাস বয়স হলেই আহরণপূর্বক পুনরায় চিংড়ি পোনা মজুদ করা যেতে পারে। রুই, কাতলার সাথে গলদার মিশ্রচাষ অধিক লাভজনক। প্রতি শতাংশে চিংড়ি ৪৮টি সিলভার কার্প-৬, কাতলা-৭, রুই-৭ এবং রাজপুঁটি ৯টি হারে ছেড়ে ১৫ দিন অন্তর অন্তর সার ও ফিশ মিল সমৃদ্ধ সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারে প্রতি হেক্টর ১ টন চিংড়ি ও ৪-৫ টন মাছের উৎপাদন পাওয়া যায়। পুকুরে চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য নারিকেল বা খেজুরের পাতা, গাছের ডাল-পালা ব্যবহার করা যায়। অক্সিজেনের অভাবে পুকুরে চিংড়ি ভাসতে থাকতে দেখা গেলে অতিরিক্ত পানি সরবরাহের মাধ্যমে প্রতিকারের ব্যবস্থা নিতে হবে।

১৫। ঘেরে বাগদা চিংড়ির চাষ

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলীয় অঞ্চলে বাগদা চিংড়ি চাষের উজ্জ্বল সম্ভাবনার আলোকে ব্যবস্থাপনা পদ্ধতি উন্নয়নের মাধ্যমে সনাতনী বাগদা চাষ পদ্ধতির উন্নয়ন সাধন করা হয়েছে। ঘেরের আয়তন ২-৪ হেক্টরের মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রস্তুতির পর হেক্টর প্রতি ১০,০০০ সুস্থ পোনা ছাড়তে হবে। নিয়মিত পানি ও মাটির গুণাগুণ ব্যবস্থাপনা এবং স্বল্প মাত্রায় তৈরী দানাদার খাদ্য প্রয়োগে প্রতি হেক্টর ৫০০ কেজি চিংড়ি উৎপাদিত হয়।

১৬। চিংড়ি চাষের আর্থ-সামাজিক প্রভাব

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে চিংড়ি চাষের প্রভাব ও সমস্যা মূল্যায়ন জরিপে দেখা যায় যে ঃ

চিংড়ি চাষের সাথে ভূমি ব্যবহার ও উৎপাদন অংশিদারিত্বে সংঘাত রয়েছে।

চিংড়ি চাষের জমিতে ধানের উৎপাদন হ্রাস পায় না বরং চিংড়ি চাষীদের দেরীতে জমি ধান চাষে জন্য ছেড়ে দেয়া, দেরীতে ধানের বীজ রোপন কিংবা আগাম ধান কেটে নেয়া প্রভৃতি কারণে ধানের স্বাভাবিক উৎপাদন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্থ হয়।

চিংড়ি চাষে ব্যবহারের জন্য নির্বিচারে উপকূলীয় নদী পোনা সংগ্রহ, ভেড়ী বাঁধের ক্ষতি সাধন, ম্যানগ্রুভ বনাঞ্চল ধ্বংস, জমিতে লবণাক্ততা বৃদ্ধির ফলে চারণভূমির অভাব, ফলজ ও জলজ গাছপালার ক্ষতিসাধন প্রভৃতি পরিবেশগত বিপর্যয় উপকূলীয় অঞ্চলে ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে।

১৭। চিংড়ি পোনা জরিপ ও প্রাপ্যতা নির্ণয়

বাংলাদেশে চিংড়ি চাষ মূলতঃ প্রাকৃতিক উৎস হতে সংগৃহীত পোনার ওপর নির্ভরশীল। দেশের দক্ষিণাঞ্চলের নদীসমূহে বাগদা চিংড়ির পোনা সারা বছর ধরে পাওয়া গেলেও ফেব্রুয়ারী হতে মধ্য এপ্রিল পর্যন্ত সময়ে সবচেয়ে বেশী ধরা পড়ে। সাধারণ জোয়ার-ভাটার চেয়ে অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ার-ভাটায় বাগদার পোনা অনেক বেশী হারে ধরা পড়ে।

ভরা মৌসুমে প্রত্যেক পোনা সংগ্রহকারী গড়ে দিনে গড়ে প্রায় ৭৮টি বাগদার পোনা সংগ্রহ করে থাকে।

গবেষণায় প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা গেছে যে, একটি বাগদার পোনা সংগ্রহ করতে গড়ে ৩৮টি অন্যান্য প্রজাতির চিংড়ি, ৬টি মাছের পোনা ও ৫৬টি বিভিন্ন প্রজাতির জুপ্ল্যাংটন বিনষ্ট হয়। এ অবস্থা চলতে থাকলে ক্রমশঃ সামুদ্রিক মৎস্য ভান্ডার শূন্য হয়ে পড়বে। তাই চিংড়ি পোনা সংগ্রহকালে অন্যান্য মাছের পোনা পানিতে ছেড়ে দিতে হবে এবং চিংড়ি হ্যাচারি গড়ে তুলে ক্রমান্বয়ে প্রাকৃতিক উৎস থেকে চিংড়ি পোনা আহরন বন্ধ করতে হবে।

১৮। ইলিশ মাছ উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনা

ইনষ্টিটিউটের গবেষণাভিত্তিক অনুসন্ধানের মাধ্যমে ইলিশ মাছের প্রজনন ও বিচরণ ক্ষেত্র সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। মেঘনা নদীর নিম্নাঞ্চল বিশেষ করে হাতিয়া-সন্দ্বীপ-মনপুরার কালিরচর নামক স্থানে ইলিশ মাছের একটি বৃহৎ প্রজনন ক্ষেত্র সনাক্ত করা হয়েছে। তাছাড়া কিশোর ইলিশের (জাটকা) দুটি বিচরণ ক্ষেত্র সনাক্ত করা হয়েছে। সর্ববৃহৎ বিচরণ ক্ষেত্রটি চাঁদপুরের ষাটনল থেকে হাজীমারা হয়ে নীলকমল পর্যন্ত বিস্তৃত। অপর বিচরণ ক্ষেত্রটি খুলনা জেলার দুবলার চর থেকে পটুয়াখালী জেলার কুয়াকাটা সমুদ্র সৈকত পর্যন্ত বিস্তৃত। অপর বিচরণ ক্ষেত্রটি খুলনা পর্যন্ত বিস্তৃত। কারেন্ট জালের সাহায্যে ফেব্রুয়ারী থেকে মে মাস পর্যন্ত সময়ে প্রায় ৩,৪৫৬ টন (৪৪.২২ মিলিয়ন) জাটকা ধরা হয়। উক্ত জাটকা ধরা না হলে বৎসরে প্রায় ৩.৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত ইলিশ মাছ পাওয়া যেতো। গবেষণালব্ধ ফলাফলের উপর ভিত্তি করে ইলিশ মাছ সংরক্ষণের জন্য ৪" ফাঁসের ছোট জাল ও কারেন্ট জালব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ইলিশের সর্বোচ্চ প্রজননকাল ১৫ই সেপ্টেম্বর হতে ১৫ই অক্টোবর ১ মাস অথবা অমাবশ্যা এবং পূর্ণিমার আগে পরে ৭ দিন প্রজনন ক্ষেত্রে ইলিশ আহরণ বন্ধ করা উচিৎ।

গবেষণা ভিত্তিক মৎস্য প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম

মাৎস্য গবেষণা ইনিষ্টিটিউট স্বল্প পুঁজি বিনিয়োগের মাধ্যমে সম্ভাব্য সর্বাধিক মৎস্য উৎপাদনে যে কয়টি লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন করেছে, তা দেশের সার্বিক মৎস্য উৎপাদন এবং কৃষকের আয় বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়তা করতে পারে। ইহা একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান বিধায় এর নিজস্ব কোন সম্প্রসারণমূলক কাঠামো নেই। সেকারণে ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহ কৃষক পর্যায়ে হস্তান্তরের জন্য মাঠ পর্যায়ে উপযোগীতা যাচাইকল্পে মৎস্য অধিদপ্তর, বিভিন্ন কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠান, বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় এবং এন.জি.ও এর সাথে যৌথ কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরীক্ষামূলক প্রযুক্তি হস্তান্তর কার্যক্রম ইতিমধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে। এতে প্রযুক্তি হস্তান্তরের পাশাপাশি বাংলাদেশের বিভিন্ন পরিবেশগত অঞ্চলে উদ্ভাবিত প্রযুক্তিসমূহের কার্যকারিতা যাচাই এবং প্রণোদিত করা সম্ভব হচ্ছে।

প্রাপ্ত ফলাফলে দেখা যায় যে, মৌসুমী পুকুরে বৎসরে প্রতি হেক্টরে ২-৩ টন এবং বারোমাসী পুকুরে ৫-৬ টন মাছ উৎপাদন সম্ভব। মৌসুমী ও বারোমাসী পুকুরে গড়ে ১ কেজি মাছ উৎপাদানের খরচ মাত্র ৬-১২ টাকা অথচ ১ কেজি বিক্রয়যোগ্য মাছ থেকে প্রকৃত মুনাফা আসে ৩০-৫০ টাকা, যা নিঃসন্দেহে যে কোন কৃষিজ পণ্যের চেয়ে লাভজনক।

আমাদের দেশে ১০.৮ মিলিয়ন হেক্টর ধানের জমি রয়েছে। এর মধ্যে ৮.৩ মিলিয়ন হেক্টর জমিতে বর্ষা মৌসুমে ৩-৪ মাস পানি থাকে যেখানে সমন্বিত পদ্ধতিতে ধান ক্ষেতে মাছ চাষ করা সম্ভব। বিগত ২ বৎসর যাবৎ সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে ইনষ্টিটিউট উদ্ভাবিত ধান ক্ষেতে মাছ চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে একটি কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। এই কর্মসূচীর আওতায় ২৪টি জেলায় ২৪টি বেসরকারী সংস্থা ও ৩টি সরকারী সংস্থার মাধ্যমে প্রায় ১২০০ চাষীর প্লটে এই প্রযুক্তি উপযোগীতা প্রদর্শিত হয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে অংশ গ্রহণকারী সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার ২০০ জন সম্প্রসারণকর্মী ও ১১০০ জন চাষীর প্রশিক্ষণ এবং ৫০টি চাষী র‍্যালী কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং হচ্ছে এর ফলে অংশীদারীত্বমূলক সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার তৎপরতায় ক্রমান্বয়ে অধিক হারে চাষীরা ধান ক্ষেতে মাছ চাষ কার্যক্রম শুরু করেছে। সমন্বিত ধান ও মাছ চাষ প্রযুক্তি ব্যবহারের ফলে চাষীর আয় ৩০-৪০% বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে দেশের মাছ উৎপাদনের পরিমাণ প্রায় ১৪ লক্ষ টন। প্রয়োজনীয় প্রাণিজ আমিষের চাহিদা মিটাতে হলে এই উৎপাদন ২০ লক্ষ টনে উন্নীত করতে হবে। একটি সমীক্ষায় দেখা যায় যে, যদি দেশে বিদ্যমান মোট ধান ক্ষেতের ১০% জমিতে সমন্বিত মাছ চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে বৎসরে প্রায় অতিরিক্ত ২.৫ লক্ষ টন মাছ অতি সহজেই উৎপাদিত হতে পারে।

সরেজমিন গবেষণার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, দেশব্যাপী নির্বাচিত চাষীরা একদিকে যেমন মাছ চাষের বিবিধ প্রযুক্তির ব্যবহার করে সরাসরি হাতে কলমে প্রশিক্ষণ পাচ্ছে অন্যদিকে চাষকৃত পুকুরসমূহ প্রদর্শনী পুকুরের আকারে আশেপাশের শত শত চাষীদের মাছ চাষে উৎসাহিত করছে।

মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনায় প্রাতিষ্ঠানিক সমন্বয়ের গুরুত্ব

মোঃ নূরুল আমিন
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

মৎস্য সম্পদ, ব্যবস্থাপনা এবং সমন্বয়–এ ৩টি বিষয় গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে মৎস্য সম্পদের ব্যাপ্তি, এর সম্ভাবনা, জাতীয় অর্থনীতিতে অবদানের সাথে উল্লেখিত বিষয়গুলো উতপ্রোতভাবে জড়িত। সুষ্ঠু ও বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থাপনা ছাড়া যেমন বর্তমান জটিল অর্থনৈতিক পরিমন্ডলে কোন সম্পদকেই সম্পদ হিসেবে টিকে রাখা যায় না তেমনি আধুনিক রাষ্ট্র ও সরকার ব্যবস্থায় আন্তঃ সমন্বয় ছাড়া কোন ব্যবস্থাপনাও অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে না। গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-মেঘনা বিধৌত বাংলাদেশ মিঠাপানি এবং সামুদ্রিক জলায়তন এ উভয়বিধ মৎস্য সম্পদেই বিপুলভাবে সমৃদ্ধ। আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের অবদানও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বর্তমানে দেশের মোট জাতীয় উৎপাদনর শতকরা ৩ ভাগ, রপ্তানী আয়ের শতকরা ৮ ভাগ এবং কৃষি সেক্টরের শতকরা ১৪ ভাগ মৎস্য খাতের অবদান। জনগণের প্রানিজ আমীষের শতকরা ৬০ ভাগ চাহিদা মিটায় মাছ, দেশের মোট জনশক্তির শতকরা ১০ ভাগের কর্মসংস্থান করে মৎস্য খাত। এ খাতের রয়েছে বিপুল সম্ভাবনা। দেশের অভ্যন্তরীন এবং সামুদ্রিক জলায়তনের সঠিক ব্যবহার, আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ, বিজ্ঞানসম্মত সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং আন্তঃ সমন্বয়ের মাধ্যমেই কেবলমাত্র বর্তমানের বার্ষিক উৎপাদন ১৩.৭৩ লক্ষ টন থেকে ২০০১-২০ সালে ২০.৭৫ লক্ষ টনের লক্ষ্যমাত্রা অর্জন সম্ভব।

ব্যবস্থাপনার সুবিধার্থে বাংলাদেশের মৎস্য সম্পদকে ৩টি শ্রেণীতে বিন্যস্ত করা যায়

(ক) অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত জলাশয় (নদ-নদী, খাল, হাওড়, প্লাবন ভূমি, কাপ্তাই হ্রদ)

(খ) অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় (বাঁওড়, পুকুর, দিঘি, উপকূলীয় নদীমোহনা বা অন্যান্য জলাশয়)

(গ) বঙ্গোপসাগরের একান্ত অর্থনৈতিক অঞ্চল।

অভ্যন্তরীন উন্মুক্ত জলাশয়ের মোট আয়তন আনুমানিক ৪০.৪৭ লক্ষ হেক্টর; তন্মধ্যে নদ-নদী ১০.৩২ লক্ষ হেক্টর, প্লাবন ভূমি ২৮.৩২ লক্ষ হেক্টর, বিল ১.১৪ লক্ষ হেক্টর এবং কাপ্তাই হ্রদ ০.৬৯ লক্ষ হেক্টর। অভ্যন্তরীন বদ্ধ জলাশয়ের মধ্যে দিঘি-পুকুর ১.৪৭ লক্ষ হেক্টর, বাঁওড় ০.০৫ লক্ষ হেক্টর, ডোবা-নালা ৮.০০ লক্ষ হেক্টর। উপকূলীয় অঞ্চলের সনাতনী চিংড়ি চাষ এলাকা ১.৪০ লক্ষ হেক্টর এবং আধা-নিবিড় চিংড়ি চাষ এলাকা প্রায় ১৫০০ হেক্টর। বাংলাদেশের ৪৮০ কি.মি. বিস্তীর্ণ উপকূল থেকে ২০০ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত একান্ত অর্থনৈতিক এলাকার আয়তন ১৬৬.০৭ লক্ষ হেক্টর। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জলাশয়ে ২৬০ প্রজাতির মিঠা পানির মাছ, ১৪ প্রজাতির বিদেশী মাছ এবং ২৪ প্রজাতির চিংড়ি রয়েছে। দেশের বর্তমান মোট মৎস্য উৎপাদন ১৩.৭৩ লক্ষ টনের শতকরা ৪৪.০৬ ভাগ উন্মুক্ত জলাশয়, শতকরা ৩৪.৫২ ভাগ বদ্ধ জলাশয় এবং শতকরা ২১.৪১ ভাগ আসে সামুদ্রিক জলাশয় থেকে।

ব্যবস্থাপনা ও সমন্বয়

আমাদের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার পর্যায়গুলোকে নিম্নরূপভাবে বিন্যাস করা যায়। সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থাগুলোর আন্তঃ সমন্বয় একান্ত জরুরী ঃ

(ক) জলাশয়

মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় দেশের মৎস্য উৎপাদনের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রণালয় হলেও দেশের অভ্যন্তরীন জলাশয়গুলির মালিকানা এ মন্ত্রণালয়ের নেই, বরং খাস খতিয়ানভুক্ত জলাশয়ের মালিক ভূমি মন্ত্রণালয় এবং অন্যান্য সরকারী জলাশয়ের মালিক পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়। ইতিপূর্বে ২০ একরের নীচের বদ্ধ খাস জলাশয়গুলি ভূমি মন্ত্রণালয় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয় এবং ২০ একরের উর্ধ্বের বদ্ধ জলাশয়গুলি ভূমি প্রশাসন বোর্ডের নিয়ন্ত্রণে ছিল। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় তাদের প্রকল্পের প্রয়োজনে জলাশয় ব্যবহার করতে পারবে এ সিদ্ধান্ত থাকলেও বাস্তবে ঐগুলি প্রাপ্তি প্রক্রিয়া খুবই জটিল ছিল। বর্তমানে ২০ একর পর্যন্ত জলাশয় যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ে ন্যস্ত করা হয়েছে। মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়কে ভূমি ও যুব মন্ত্রণালয়ের সাথে একটা আন্তঃ মন্ত্রণালয় সমঝোতায় আসতে হবে; নচেৎ খাস বদ্ধ জলাশয়ের পুরোটাই মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি প্রক্রিয়ার বাইরে থাকবে। অনুরূপভাবে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ ও সেচ প্রকল্প এলাকার জলাশয়গুলো পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়ের আওতাভুক্ত; এ জলাশয়গুলোকে আধুনিক পদ্ধতিতে মৎস্য চাষ কার্যক্রমের আওতাভুক্ত করতে উক্ত মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের মধ্যে সমঝোতা এবং সমন্বয়ের প্রয়োজন। তেমনি মাঠ পর্যায়ে মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে

সমন্বয়ের অভাব থাকলে চলবে না। রেললাইন এবং সড়ক-মহাসড়কের পার্শ্বস্থ ডোবা-নালায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের জন্য যোগযোগ মন্ত্রণালয় এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথেও সমঝোতা-সমন্বয় আবশ্যক। সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সংলগ্ন জলাশয়, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল বিভাগের রাস্তা-স্থাপনা সংলগ্ন জলাশয়ের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়গুলোর সাথে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সমঝোতা-সমন্বয় জরুরী। বর্তমানে প্রচলিত প্রতিটি মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্পের ব্যাপারে পৃথক পৃথক সমঝোতা স্মারকের পরিবর্তে প্রতিটি মন্ত্রণালয়ের সাথে সকল প্রকল্পের ব্যাপারে ১টি করে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হতে পারে। মাঠ পর্যায়ে সমন্বয় আরো বৃদ্ধি করতে হবে। এনজিও প্রতিষ্ঠানগুলো বিশেষতঃ বৃহৎ এনজিও যেমন ঃ গ্রামীণ মৎস্য ফাউন্ডেশন, ব্র্যাক, কারিতাস, আশা, প্রশিকা প্রভৃতি তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় জলাশয়ে মৎস্য চাষ কার্যক্রম সম্প্রসারিত করছে। এদের সাথে জলাশয়ের সমস্যা, আঞ্চলিক প্রভাব, মাটি ও পানির গুণাগুণ ইত্যাদি ব্যাপারে মৎস্য অধিদপ্তর তথ্য/ উপাত্ত বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তঃ সম্পর্ক বৃদ্ধি করতে পারে যা প্রকারান্তরে দেশের মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধিতে সহায়ক হবে।

অভ্যন্তরীন জলাশয়ের সাথে সাথে আমাদের বিশাল সামুদ্রিক জলায়তনকে বিদেশী ট্রলারের মৎস্য আহরণ, ক্ষতিকর বর্জ্য নিক্ষেপ ইত্যাদি থেকে নৌবাহিনী এবং কোষ্ট গার্ড রক্ষা করতে পারে; এ ক্ষেত্রেও মৎস অধিদপ্তরের ঐ দুটি সংস্থার সাথে নিবিড় সমন্বয়ের প্রয়োজন।

(খ) মৎস্য চাষ

মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনার ২য় পর্যায় হচ্ছে মৎস্য চাষ। এ ক্ষেত্রে আন্তঃ মন্ত্রণালয় এবং আন্তঃ সংস্থা সমন্বয় অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মৎস্য চাষের আধুনিক কলা কৌশল নিয়ে গবেষণার দায়িত্ব প্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট। মৎস্য সেক্টরের কিছু কিছু এনজিও প্রতিষ্ঠানও মৎস্য চাষে গবেষণামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করছে। আনসার-ভিডিপি অধিদপ্তর এবং বিআরডিবিও পল্লী অঞ্চলে মৎস্য চাষে অংশ নিচ্ছে। সুতরাং মৎস্য অধিদপ্তরের সাথে ঐ সব প্রতিষ্ঠানের সকল পর্যায়েই মৎস্য চাষ সংক্রান্ত ব্যাপারে তথ্য এবং কারিগরি জ্ঞানের বিনিময় এবং হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদন এবং পোনার টেকসই মার্কেটিং ব্যবস্থারও সমন্বয় প্রয়োজন। উপকূলীয় অঞ্চলের স্বল্প লবণাক্ত পানিতে নানা প্রজাতির চিংড়ি, কোড়াল এবং মিল্ক ফিস উৎপাদনের ব্যাপারেও সমন্বয় হতে পারে। এ ক্ষেত্রে এক এক সংস্থার এক এক পর্যায়ের উৎপাদন অন্য সংস্থার পরিপূরক হতে পারে। বিদেশ থেকে আমদানী নিষিদ্ধ মাছের রেণু এবং পি.এল চোরাই পথে এসে দেশে ঢুকে মৎস্য চাষ যাতে বিঘ্নিত না করতে পারে সে লক্ষ্যে বিডিআর, কোষ্ট গার্ড, পুলিশ এবং এনবিআর এর সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একইভাবে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সাথে বাণিজ্য ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় প্রয়োজন। ধান ক্ষেতে মৎস্য চাষ এবং কৃষি কাজে ক্ষতিকারক সার, কীটনাশক ব্যবহার ইত্যাদি বিষয়ে কৃষি বিভাগ এবং কৃষি মন্ত্রণালয়ের সাথে যথাক্রমে মৎস্য অধিদপ্তর এবং মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সমন্বয় জরুরী।

(ঘ) পানির গুণাগুণ সংরক্ষণ, মৎস্য খাদ্য সরবরাহ এবং রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ

মৎস্য চাষ চলাকালীন পানির সঠিক গুণাগুণ সংরক্ষণ, সুষম খাদ্য সরবরাহ এবং মাছে রোগব্যাধি নিয়ন্ত্রণ মৎস্য উৎপাদন নিশ্চিত করে। এগুলির ব্যাপারে মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট যেমন মৎস্য অধিদপ্তরকে তাদের গবেষণালব্ধ প্রযুক্তি দ্বারা সহায়তা প্রদান করতে পারে তেমনি আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো যেমন ইকলার্ম, নাকা, বিওবিপি, ফাও, ইনফো ফিশ, সিফডেক প্রভৃতি আর্থিক এবং কারিগরি সহায়তা দান করতে পারে। হঠাৎ করে Global কোন রোগব্যাধি দেখা দিলে বাংলাদেশে মৎস্য অধিদপ্তর বা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের পক্ষে নিয়ন্ত্রণ করা দুঃসাধ্য ব্যাপার হতে পারে ইহা আন্তঃ আঞ্চলিক বা আন্তর্জাতিক সংস্থার সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে সহজেই নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। মৎস্য খাদ্য উৎপাদন এবং প্রয়োজনে যৌথ উদ্যোগে অগ্রসর দেশের সাথে মৎস্য খাদ্য উৎপাদন কারখানা নির্মাণসহ খাদ্য আমদানী করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে শিল্প ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে সমন্বয়ের প্রশ্ন জড়িত।

(ঙ) সংগ্রহ ও বাজারজাতকরণ

মৎস্য ব্যবস্থাপনার পরবর্তী পর্যায় মৎস্য আহরণ (হারভেষ্টিং) ও বাজারজাতকরণ। এ পর্যায়েও আন্তঃ সমন্বয়ের গুরুত্ব অনেক। দেশের বিভিন্ন এলাকার খাবার উপযোগী মৎস্য সংগ্রহ; হিমায়িতকরণ এবং রাজধানীসহ অভ্যন্তরীন বাজারে (স্বল্প উৎপাদন এলাকায়) পরিবহন ইত্যাদি বিষয়ে বিএফডিসি এর সাথে মৎস্য অধিদপ্তরের অধিকতর সমন্বয় হওয়া প্রয়োজন। বিএফডিসি বর্তমানে বাঁওড় এবং কাপ্তাই লেকের উদ্বৃত্ত মাছ ঢাকা শহরে বাজারজাত করে থাকে। ভবিষ্যতে বিএফডিসির বাজারজাতকরণ ক্ষমতা বর্ধিত করা যেতে পারে অথবা একাধিক জাতীয় বা আঞ্চলিক এনজিও সংস্থা এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে পারে।

বিদেশে আমাদের মৎস্য জাতপণ্য রপ্তানীর ব্যাপারে বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরোর সাথে মৎস্য

ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, মৎস্য অধিদপ্তর এবং বাংলাদেশ হিমায়িত খাদ্য রপ্তানীকারক সমিতির মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সর্ব সময়েই প্রযোজ্য।

বিগত ১৯৯৭ সালের ৩০শে জুলাই বাংলাদেশের মৎস্য পণ্যের ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশসমূহে রপ্তানীর উপর আরোপিত অস্থায়ী নিষেধাজ্ঞা যেভাবে সমন্বিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে মোকাবিলা করা হয়েছিল এবং ৬টি প্রতিষ্ঠানের মৎস্যজাত পণ্য রপ্তানীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহৃত হয়েছিল একইভাবে অন্যান্য মান উন্নীত প্রতিষ্ঠানের মৎস্য জাত পণ্য রপ্তানীর উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারসহ মার্কিন খাদ্য প্রশাসনের হ্যাচাপ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সম্ভাব্য নিষেধাজ্ঞা আমাদেরকে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এবং পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তঃ সমন্বয়ের মাধ্যমে মোকাবিলার পদক্ষেপ নিতে হবে। মৎস্য অধিদপ্তর, রপ্তানী উন্নয়ন ব্যুরো এবং ব্রাসেলস ও ওয়াশিংটনস্থ আমাদের দূতাবাসের মাঝেও যথাযথ সমন্বয় গড়ে তুলতে হবে।

(চ) মৎস্য বিষয়ক আইন, অধ্যাদেশ, বিধি, নীতি

মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ এবং সর্বোচ্চ আহরণ মাত্রা বজায় রাখার স্বার্থে এ যাবৎ দেশে যে সব আইন, অধ্যাদেশ, বিধি ও নীতি জারি হয়েছে ঐ গুলি নিম্নরূপ ঃ

(১) পুকুর উন্নয়ন আইন, ১৯৩৯

(২) ইষ্ট বেংগল প্রটেকশন এ্যান্ড কনজারভেশন অব ফিশ অ্যাক্ট, ১৯৫০।

(৩) মেরিন ফিশারিজ অডিন্যান্স, ১৯৮৩।

(৪) মেরিন ফিশারিজ রুলস্, ১৯৮৩।

(৫) দি প্রটেকশন এ্যান্ড কনজার্ভেশন অব ফিশ রুলস্, ১৯৮৫।

(৬) চিংড়ি চাষ অভিকর আইন, ১৯৯২।

(৭) ফিশ এ্যান্ড ফিশ প্রডাক্টস (ইন্সপেকশন এ্যান্ড কোয়ালিটি কন্ট্রোল) আইন, ১৯৯৭।

(৮) জাতীয় মৎস্য নীতি, ১৯৯৮।

মৎস্য সম্পদ সংক্রান্ত উপরোক্ত আইন, অধ্যাদেশ, বিধি এবং নীতি বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর, জেলা প্রশাসন এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থাসমূহের মাঝে যথাযথ সমন্বয় ছাড়া কার্যকরভাবে সম্ভব নয়।

(ছ) মুক্ত জলাশয়ে মাছের মজুদ বৃদ্ধি, শিল্প বর্জ্যের কারণে কতিপয় নদীর মৎস্যহীনতা, মাছের চোরাচালান, ব্যাংক ঋন, অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা, ফিশপাস নির্মাণ, জলজ পরিবেশ সংরক্ষণ

বিগত কয়েক দশকে প্রাকৃতিক কারণ, মৎস্যজীবীদের অতিরিক্ত মৎস্য আহরণ, বর্ধিত জনসংখ্যার খাদ্য সংস্থান, উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন, প্রাকৃতিক উৎস থেকে অত্যধিক পোনা আহরণ, শস্য ক্ষেত্রে কীটনাশক ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ ইত্যাদির ফলে মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন মারাত্মকভাবে হ্রাস পাওয়ায় উন্মুক্ত নদ-নদী এবং বিল-হাওড়ে মাছের মজুদ বৃদ্ধি এবং অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। আবার শিল্প কারখানার রাসায়নিক বর্জ্য নিক্ষেপের বা স্বাভাবিক পতনের ফলে দেশের শিল্প-ঘন অঞ্চলের নদীসমূহ যেমন শীতলক্ষ্যা, বুড়িগঙ্গা, আপার মেঘনা, নিম্ন কর্ণফুলী, নিম্ন রূপসা প্রভৃতি প্রায় মৎস্যবিহীন হয়ে পড়েছে। আবার কোন প্রজাতির মাছ চোরাচালানের মধ্যমে যেমন বাংলাদেশে আসছে তেমনি ইলিশসহ সাতক্ষীরা অঞ্চলের উপকূলীয় বিপুল মৎস্য চোরাচালান হচ্ছে। এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া এসে পড়ছে দেশের মৎস্য ব্যবস্থাপনার উপর। দেশে বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ এবং সেচ প্রকল্প গড়ে তোলার ফলে বর্ষাকালে মাছের উন্মুক্ত জলাশয়ে স্বাধীনভাবে চলাচলের স্বাভাবিক পথ রুদ্ধ হয়ে পড়ায় ঐ সব স্থাপনায় ফিশ পাস নির্মাণ জরুরী হয়ে পড়েছে। মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যাংক ঋণ অবশ্যই প্রয়োজন। মৎস্যসম্পদ ব্যবস্থাপনার সাথে প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষভাবে জড়িত বিষয়গুলো উদ্ভুত কৃষি, শিল্প, পানি সম্পদ, পরিবেশ ও বন, মৎস্য, অর্থ এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাঝে আন্তঃ সমন্বয় ছাড়া সমস্যাবলী সমাধানে সম্ভব নয়।

পরিশেষে এ কথা বলা যায় যে, আধুনিক ব্যবস্থাপনা যেহেতু আন্তঃ সমন্বয় ছাড়া চলতে পারে না সেহেতু আমাদেরকে মৎস্য সম্পদের ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সকল সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় এবং সংস্থার সাথে যথাযথ সমন্বয়ের মাধ্যমেই একবিংশ শতকের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে হবে।

উপকূলীয় মৎস্য সম্পদের উপর বেহুন্দি জালের প্রভাব

মোঃ মাসুদুর রহমান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশের সমগ্র উপকূলব্যাপী ব্যাপকহারে বেহুন্দি জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ হয়ে থাকে। যে সমস্ত এলাকায় এই জাল পাতা হয় তা অগভীর পানির ছোট মাছ বা চিংড়ির আবাসস্থল এবং সামুদ্রিক চিংড়ি ও মাছের নার্সারী গ্রাউন্ড। ফলে বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ যেমন ঃ হরিণা, হনি, চাগা, বাগদা, রুডা, গলদা, ছুটি, হোদ্রা, পোয়া ইত্যাদি কিশোর ও অপ্রাপ্ত বয়সের চিংড়ি ও মাছ বেহুন্দি জাল দ্বারা নিধন হচ্ছে।

আমাদের দেশে মালটি স্পিসিস-মালটি গিয়ার ফিশারী বিদ্যমান। তাই এক জালে যে কোন সময় বহু প্রজাতির ও বিভিন্ন আকারের মাছ ধরা পড়ে; আবার একই প্রজাতির মাছ বা চিংড়ি বিভিন্ন বয়সে / দৈর্ঘ্যে বিভিন্ন এলাকায় / গভীরতায় বিভিন্ন জালে ধরা পড়ে। তাই এ ফিশারীর ব্যবস্থাপনা অত্যন্ত জটিল। অপরদিকে শীতকালীন দেশগুলোতে সিংগেল স্পেসিস-সিংগেল গিয়ার ফিশারী বিরাজমান থাকাতে তার ব্যবস্থাপনা তুলনামূলকভা অনেক সহজ। তাছাড়াও ঐ সমস্ত দেশগুলিতে অনেক বছর ধরে বৈজ্ঞানিক উন্নত ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তি চালু রয়েছে।

গভীর সমুদ্রে অধিকাংশ মাছ ও চিংড়ির প্রজনন ঘটে। স্রোতের টানে পোনাগুলি উপকূলের কাছাকাছি এলাকায় এবং মোহনাঞ্চলে প্রবেশ করে। এ এলাকায় তারা কিছুকাল অতিবাহিত করে এবং আকারে কিছুটা বড় হয়। এ পর্যায়ে তাদের শরীরে প্রয়োজনীয় উপাদানের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং খাদ্যাভাসের পরিবর্তন ঘটতে থাকে। এ অবস্থায় তারা ধীরে ধীরে গভীর সমুদ্রের দিকে যেতে থাকে যতক্ষণ না মাতৃকূলের সন্ধান পায়। এমনিভাবে পুরাতন মজুদের সাথে নতুন প্রজন্মের যোগ হয়, নতুন প্রবেশনকারীরা বড় হয় এবং প্রজন্মের সৃষ্টি করে।

মোহনাঞ্চল ও তার জলজ পরিবেশ

বাংলাদেশের ৪৮০ কিলোমিটার তটরেখা বরাবর বিস্তৃর্ণ মোহনাঞ্চল রয়েছে। এই মোহনাঞ্চলে সামুদ্রিক মাছ ও চিংড়ির নার্সারী গ্রাউন্ড। নার্সারী গ্রাউন্ডকে সব সময় দুষণমুক্ত রাখা বাঞ্ছনীয়। কারণ বাচ্চা অবস্থায় মাছ ও চিংড়ি সহনশীল ক্ষমতা কম থাকায় তারা অত্যন্ত নাজুক অবস্থায় থাকে। পরিবেশের একটু তারতম্যের জন্য তাদের মৃত্যুর হার অনেক বেড়ে যেতে পারে। কিন্তু বর্তমানে উপকূলীয় এলাকায় - ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল ধ্বংস, জাহাজ কাটার কার্যক্রম তৈল জাতীয় পদার্থ আহরণ ইত্যাদি কার্যক্রমের ফলে সাগরের পরিবেশ দূষণ হচ্ছে। এছাড়াও সামুদ্রিক ও উপকূলীয় নৌযান থেকে পরিত্যক্ত তৈল ও অন্যান্য বর্জ্য পদার্থ প্রতিনিয়ত সমুদ্রে নিঃসরণ সহ শিল্প কারখানা থেকে দূষিত পদার্থ সাগরের পানিতে গিয়ে মিশ্রিত হচ্ছে। ফলে সাগরের পরিবেশ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে। বর্তমান চিংড়ি পোনা সংগ্রহকারী কর্তৃক বিপুল পরিমাণ জু-প্লাংকটন ধ্বংস করা হচ্ছে। ফলে উপকূলীয় পানিতে প্রাণীকূলের ভারসাম্য নষ্ট, মাছ ও চিংড়ির খাবারের অভাব এবং ফুড-চেইন এর ভারসাম্য নষ্ট হবার সমূহ আশংকা দেখা দিয়েছে।

বেহুন্দি জালে কিশোর চিংড়ি আহরণ ও তার প্রতিক্রিয়া

পূর্বেই আলোকপাত করা হয়েছে যে, যে সকল এলাকায় বেহুন্দি জাল পাতা হয় তা অগভীর পানির ছোট মাছ বা চিংড়ির আবাস স্থল এবং সামুদ্রিক চিংড়ি ও মাছের নার্সারী গ্রাউন্ড। সময়ের ব্যবধানে বেহুন্দি জাল অনেকটা গভীর পানিতে বিস্তার লাভ করেছে; যেমন সোনাদিয়া, দুবলা, সোনারচর, হাঁসেরচর ইত্যাদি নিম্নাঞ্চল। বেহুন্দি জালকে তিনভাগে ভাগ করা যায় যেমন- মোহনাঞ্চলে, চ্যানেলে এবং গভীর পানিতে। এই জালের সংখ্যা দিন দিন বেড়েই চলেছে। গভীর পানিতে যে সকল বেহুন্দি জাল পাতা হয় তাতে মাছ ও চিংড়ির জুভেনাইল কম ধরা পড়ে। তবে কিছু কিছু সামুদ্রিক প্রজাতির প্রি-এডাল্ট ধরা পড়ে। মোহনাঞ্চলে এ সকল প্রজাতির কেবল জুভেনাইল ধরা পড়ে। বেহুন্দি জালে আহরিত কিশোর বয়সী সামুদ্রিক চিংড়ির (পিনাইড) বাৎসরিক উৎপাদন ১০,০০০ হতে ১২,০০০ টনের মধ্যে। এই উৎপাদনের সবটুকুই সামুদ্রিক ষ্টকের অংশ। বেহুন্দি জালে আটকা না পড়লে প্রাকৃতিক মৃত্যুর সামান্য অংশ বাদ দিয়ে বাকিগুলি যদি সাগরে তাদের চারণভূমিতে ফিরে গিয়ে পরিপক্ব আকার ধারণ করার সুযোগ পেতো তা হলে হয়ত বেশ কয়েকগুণ বেশী ফলন হতে পারতো। এক্ষেত্রে বেহুন্দি জাল দ্বারা বড় জাতের সামুদ্রিক চিংড়ির দৈহিক বৃদ্ধির স্তরে অতি আহরণ (Over fishing) হচ্ছে। উপরন্তু কিশোর অবস্থায় ধরা পড়ছে বলে প্রজননে তারা অংশ নিতে পারছে না। সাগরে ফিরে গেলে অধিকাংশই মৃত্যুর পূর্বে প্রজননে অংশ নিতে এবং পরবর্তী বৎসরের বর্ধিত মজুদের জন্য প্রজন্মের যোগান দিয়ে যেতে পারতো।

অন্যান্য জাল ও জেলেদের উপর বেহুন্দি জালের প্রভাব

উপকূলীয় এলাকায় বেহুন্দি জালের পাশাপাশি অন্যান্য জাল বা উপকরণ দিয়ে উপকূলীয় জেলে সম্প্রদায় মৎস্য আহরণ করে থাকে। বেহুন্দি জালে অপ্রাপ্তবয়স্ক বা কিশোর অবস্থায় মাছ ও চিংড়ি অধিক হারে আহরিত হওয়ার ফলে মাছ ও চিংড়িগুলি বড় হওয়ার সুযোগ পাচ্ছে না। এগুলি যদি বেহুন্দি জালে ধরা না হতো তা হলে বড় হয়ে এগুলির সহযোগে অন্যান্য জাল দ্বারা আহরিত মাছ ও চিংড়ির পরিমাণ বৃদ্ধি পেতো।

বেহুন্দি জেলেদের আয় ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যান্য জাল ও জেলেদের দ্বারা বাধাগ্রস্থ

বেহুন্দি জেলেদের আয় অত্যন্ত সীমিত; কারণ তারা কিশোর চিংড়ি ও মাছ আহরণ করে থাকে যা সংখ্যায় অনেক বেশী হলেও ওজনে কম হওয়াতে বাজারে এর মূল্য অত্যন্ত কম। এ ছড়াও উপকূলীয় এলাকায় ব্যবহৃত অন্যান্য জাল বিশেষ করে চিংড়ি পোনা ধরার জাল অধিক। বিভিন্ন প্রজাতির মাছ ও চিংড়ির পোনা ধ্বংস করার ফলে বেহুন্দি জালে আহরিত মাছের পরিমাণ কম। উপকূলীয় এলাকায় যদি শুধুমাত্র বেহুন্দি জাল দ্বারা মৎস্য আহরণ করা হতো তাহলে বেহুন্দি জেলেদের আয় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেতো।

বিভিন্ন এলাকায় বেহুন্দি জেলেদের আর্থ-সামাজিক অবস্থা

বেহুন্দি জেলেদের শতকরা ৫৩ জন পুরুষ ও ৪৭ জন মহিলা এবং ১০ বৎসর বয়স পর্যন্ত ছেলে মেয়েদের সংখ্যা শতকরা ২০ জন। প্রতিটি পরিবারে অঞ্চল বিশেষ সদস্য সংখ্যা ৫-৮ জন এবং পুরুষ ও মহিলাদের মধ্যে যথাক্রমে ৫৭% ও ৮১% অশিক্ষিত। তাদের ঘরবাড়ী সাধারণতঃ এক/দুই কক্ষবিশিষ্ট খড়ের তৈরী, তারা মেঝেতে ঘুমায় এবং উল্লেখযোগ্য কোন আসবাবপত্র নাই। প্রায় এলাকায় জেলেদের আয় তাদের ব্যয়ের সহিত সংগতিপূর্ণ নয় বিধায় পরবর্তী মৎস্য মওসুমের প্রস্তুতির জন্য সর্বদাই ঋণ সংগ্রহের অপেক্ষায় থাকে এবং স্থানীয় মহাজন ও দাদনদার থেকে অতিরিক্ত সুদে এই অর্থ সংগ্রহ করে। উক্ত ঋণের টাকা তারা সম্পূর্ণভাবে পরিশোধের অপারগতায় ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে ক্রমশই গরীব হয়ে পড়ে। সমগ্র উপকূলীয় এলাকায় বেহুন্দি জেলেদের অবস্থা প্রায় একরকম হলেও কক্সবাজার অঞ্চলের জেলেদের আর্থসামাজিক অবস্থা অপেক্ষাকৃত উন্নত। এই এলাকার জেলেরা দারিদ্র্যসীমার উপরে বসবাস করে।

বেহুন্দি ফিশারীর ব্যবস্থাপনার সুযোগ

আর্টিসেনাল ফিশারীতে ব্যবহৃত ক্ষতিকারক জালগুলির মধ্যে বেহুন্দি জালকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এ জালের ফাঁস নিয়ন্ত্রণ বা অন্য কোন উপায়ে তা ব্যবস্থাপনার সুযোগ নেই। কারণ বেহুন্দি জালের ফাঁসের আকার বড় করলে তাদের জালে কোন মাছ ধরা পড়বে না। তাই এ ফিশারী ব্যবস্থাপনার একমাত্র সুযোগ হচ্ছে মৎস্য আহরণের জন্য নিষিদ্ধ এলাকা ও সময় নির্ধারণ করা এবং পর্যায়ক্রমে তা বাস্তবায়ন করা। সম্প্রতি মৎস্য অধিদপ্তরে সামুদ্রিক মৎস্য জরিপের ফলাফলে দেখা যায় যে, কক্সবাজার অঞ্চলে বিশেষ মৌসুমে এ কার্যক্রম বন্ধ রাখলে অন্ততঃ শতকরা ৪০ ভাগ কিশোর চিংড়ি ও মাছ নিধন বন্ধ হবে।

বেহুন্দি ফিশারীর ব্যবস্থাপনার প্রশ্নে জেলেদের উপর তাৎক্ষণিক ক্ষতিকারক প্রভাব

অধিকাংশ জেলেরা মনে করে বেহুন্দি জাল দ্বারা মাছ ধরা ছাড়া তাদের বাঁচার আর কোন বিকল্প পথ নেই। কারণ পুরুষানুক্রমে তারা এ পেশায় নিয়োজিত। বিশেষ করে হিন্দু জেলে সম্প্রদায় মনে করেন, সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক তাদের বাৎসরিক মৎস্য আহরণের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়। তাই, ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কোন পরামর্শ তাদের কাছে অর্থবহ মনে হয় না। তাদের মধ্যে কেহ কেহ মনে করে সামান্য আর্থিক ঋণ বা সাহায্য পেলে তারা অন্য কোন ফিশারীতে স্থানান্তর হতে পারবে। এতে তাদের আয় বৃদ্ধি সহ ভালভাবে জীবনযাপন করার ব্যবস্থা হবে।

পূনর্বাসনের প্রয়োজনীয়তা

মোহনাঞ্চলে বেহুন্দিজাল দ্বারা মৎস্যাহরণ বন্ধ করার ক্ষেত্রে আপাততঃ কোন বিকল্প নেই। তবে বর্তমানে এই ফিশারীর উপর নির্ভরশীল জেলের সংখ্যা প্রায় ৫৫,০০০। তাই রাতারাতি এ ফিশারীকে বন্ধ করা সমীচীন হবে না। ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক এলাকাভেদে পর্যায়ক্রমে এ জালকে সম্পদের জন্য ক্ষতিকারক নয় এমন কোন জাল বা উপরকণ দ্বারা পুনর্বাসনের মাধ্যমে বেহুন্দি জালের ক্ষতিকারক প্রভাব থেকে সম্পদকে রক্ষা করতে হবে।

পুনর্বাসনের সুবিধা ও অসুবিধা

আর্টিসেনাল ফিশারীর মধ্যে বেহুন্দি ফিশারী হতে ভাসান জাল ফিশারী ও বড়শী ফিশারীতে স্থানান্তর হওয়ার সুযোগ রয়েছে। কিন্তু গভীর সমুদ্রে যান্ত্রিক নৌযান দ্বারা উক্ত দুইটি ফিশারীর মৎস্য আহরণ হয়ে থাকে। উপরন্তু বেহুন্দি জেলেরা অন্য ফিশারীতে স্থানান্তরের জন্য আর্থিক, প্রযুক্তিগত ও মানসিক দিক দিয়ে অসমর্থ।

বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা

মোহনা অঞ্চলে বেহুন্দি জাল বন্ধ করার সাথে সাথে উক্ত জালের উপর নির্ভরশীল জেলে সম্প্রদায়কে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা একান্তই অপরিহার্য্য। ফিশারীর বাহিরে বিকল্প আয়ের সুযোগ সীমিত হলেও ভিতরে এর সুযোগ রয়েছে।

ফিশারীতে আয়-বর্ধক কার্যক্রম

উপকূলীয় এলাকায় বর্তমানে শুধু বাগদা চিংড়ির চাষ করা হচ্ছে। এর পাশাপাশি অন্যান্য, যেমন-বাটামাছ, কোরাল মাছ , ওয়েষ্টার, সামুদ্রিক শৈবাল, কাঁকড়া, ফ্যাটেনিং ইত্যাদির চাষের মাধ্যমে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

বেহুন্দী জেলেদের বিকল্প আয়-বর্ধক কার্যক্রম

বিকল্প আয়ের সুযোগ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। সম্প্রতি গবেষণা কাজের ফলাফলে সম্ভাব্য কিছু আয়-বর্ধক কার্যক্রম চিহ্নিত করা হয়েছে। এ সকল কাজের গ্রহণযোগ্যতা বেহুন্দি জেলেদের নিকট কতটুকু তা পর্যবেক্ষণ করা প্রয়োজন। এছাড়াও সম্প্রসারণ কর্মসূচীর আওতায় জেলেদেরকে উক্ত কাজগুলি গ্রহণ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা প্রয়োজন। ইহা বাস্তবায়নের জন্য আন্তঃবিভাগীয় সম্বন্বয়, ঋণদান কর্মসূচী এবং সরকারী ও বেসরকারী সংস্থার গুরুত্ব অপরিসীম।

মাছ চাষে কারিগরী সমস্যা ও সমাধানের উপায়

মোঃ নজরুল ইসলাম
মোঃ মনিরুজ্জামান
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

বাংলাদেশে মাছ চাষ অতি দ্রুত সম্প্রসারিত হচ্ছে। একই সাথে চাষের নতুন নতুন কলা কৌশলও উদ্ভাবিত হয়েছে। দেশী চাষযোগ্য মাছের সাথে দ্রুত বর্ধনশীল ও চাষের সুবিধার কথা বিবেচনা করে অনেক জাতের বিদেশী মাছ এ দেশে আমদানি করা হয়েছে। পূর্বে মাছের পোনার জন্য প্রাকৃতিক উৎসের উপর নির্ভর করা হত। কিন্তু হ্যাচারীতে রেণু উৎপাদনের প্রযুক্তি মাঠ পর্যায়ে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেশে পর্যাপ্ত পোনা উৎপাদনের নার্সারী গড়ে উঠেছে। এখন শুধু প্রয়োজন ভাল জাতের বড় পোনা উৎপাদন নিশ্চিত করা। অন্যদিকে মাছ চাষের এ প্রসার অব্যাহত রাখার জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণ সহজলভ্য করা আবশ্যক। চাষের জন্য অতি প্রয়োজনীয় উপকরণ এখনও দেশের সর্বত্র সহজপ্রাপ্য নয়। বিশেষ করে রোটেনন, ফসটক্সিন, চা বীজ, বিভিন্ন ধরনের হরমোন, ডিপটারেক্স, ডলোমাইট, জিওলাইট, এলাম, ফিসমিল এবং গুণগত মানের তৈরী সম্পূরক খাবার। এসব উপকরণ সংগ্রহ করতে খামারীগণকে অধিকাংশ সময় সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়।

আমাদের দেশে পরিকল্পিতভাবে নির্মিত পুকুর জলাশয় কিংবা খামার খুবই কম আছে। গ্রামীণ পুকুর, দীঘি, ডোবা ইত্যাদি জলাশয়গুলোর অধিকাংশের পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহের ব্যবস্থা নেই। প্রায় সকল ক্ষেত্রে গ্রামের এসব জলাশয়ের পানি গৃহস্থালীয় নানা কাজে ব্যবহার করা হয়। ফলে পুকুরে মাছ চাষের উপযুক্ত পরিবেশ ঠিক রাখা যায় না। মাছ পানিতে বাস করাতে সার্বক্ষণিকভাবে এগুলো দৃষ্টিগোচর হয় না। তাই কৃষি ফসল ও গবাদি পশুপাখী পালনের ন্যায় মাছের সুবিধা অসুবিধাগুলো সহজে সনাক্ত করা যায় না। চাষের একটি উৎপাদন মৌসুমে নানাবিধ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অতিক্রম করতে হয়। এসময় খামারীগণকে বিভিন্ন সমস্যাকে মোকাবিলা করতে হয়। এ সব সমস্যার মধ্যে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে এ নিবন্ধে আলোচনা করা হল।

পুকুরে পানি সরবরাহের উৎস্য

আমাদের দেশে পুকুর, দীঘিও জলাশয়ে পানির প্রধান উৎস বৃষ্টি। বর্ষার মৌসুমে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়। এ বৃষ্টির পানি পুকুর দীঘি ও জলাশয়ে মজুদ হয়। প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ পানি ব্যবহার করে মাছ-চাষ করা হয়। অনাবৃষ্টি এবং সময়মত বৃষ্টির অভাবে উৎপাদন মৌসুমে পুকুরে পর্যাপ্ত পানির নিশ্চয়তা বিধানের জন্য নিকটবর্তী গভীর নলকূপ অথবা অন্যান্য জলাশয় হতে পানি সরবরাহ করতে হবে।

পুকুরের পানি কমে যাওয়া

শুষ্ক মৌসুমে পুকুরের পানি বাষ্পাকারে এবং পাড় ও তলার সূক্ষ্ম ছিদ্র পথে চুয়ায়ে কমে যায়। সাধারণতঃ অধিক বালিযুক্ত পুকুরের পানির ধারণ ক্ষমতা কম। তাছাড়া কৃষি কাজে ব্যবহৃত মাটির তলার পানি সেচের মাধ্যমে তুলে ফেলাতে পানির স্তর নীচে নেমে যাওয়ার ফলে মাটির তলার আন্তঃচাপে পুকুরে পানি চুয়ে বেরিয়ে যায়।

পানি চুয়ানো বন্ধের উপায়

(১) পুকুরের পাড়ে ও তলায় এঁটেল মাটির স্তর দিয়ে পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করা সম্ভব।

(২) পানি চুয়ানো বন্ধ করার জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ মিহি করাতের গুঁড়া অথবা ছাই ব্যবহার করা যেতে পারে।

(৩) পুকুরে অধিক মাত্রায় গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা কম্পোস্ট ইত্যাদি দীর্ঘদিন ব্যবহার করলে পুকুরের মাটির আন্তঃ ছিদ্রপথ বন্ধ হয়ে স্থায়ীভাবে পানি চুয়ানো বন্ধ হয়ে যাবে।

(৪) পুকুরের পাড়ে ২ ফুট প্রস্থে তলদেশ বরাবর গর্ত করে তার মধ্যে দিয়ে পলিথিন দিয়ে পুনরায় মাটি চাপা এবং দুরমুজ দিয়ে মাটি শক্ত করে দিতে হবে। নতুন পুকুর খননকালে এ কাজটি করলে সহজ হয়।

পানি ঘোলাত্ব

পলিঘটিত ও ভারী ধাতব কণা, উদ্ভিদ বা প্রাণী প্ল্যাঙ্কটনের আধিক্য পানিতে ঘোলাত্ব সৃষ্টি করতে পারে। লাল মাটি কিংবা এঁটেল মাটির পুকুরের পানি অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঘোলা থাকে। ঘোলাত্ব পুকুরে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। ফলে আলো পানির অধিক গভীরে প্রবেশ করতে পারে না। এতে ক্ষুদ্র সবুজ উদ্ভিদ প্লাঙ্কটন আলোর অভাবে খাদ্য তৈরী করতে পারে না। এজন্য পুকুরে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কম হয়। পানির অতিরিক্ত ঘোলাত্ব মাছের চক্ষু ও ফুলকায় ক্ষতি সাধন করে। তাছাড়া ভাসমান পদার্থ নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ইত্যাদি উপাদান নিজেদের দেহে আটকিয়ে রেখে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে বাধার সৃষ্টি করে।

ঘোলাত্ব দূরীকরণের উপায়

(১) মাটি কণা ও ভাসমান পদার্থ দ্বারা সৃষ্ট ঘোলাত্ব দূর করার জন্য হেক্টর প্রতি ২০-৪০ কেজি হারে এলাম ব্যবহার করতে হয়।

(২) লালমাটি বা অম্লঘটিত ঘোলাত্বের ক্ষেত্রে পানির পিএইচ মান ৬.৫ না হওয়া পর্যন্ত ঘন ঘন পানি পরিবর্তন করতে হবে। এরপর স্বাভাবিক মাত্রায় চুন ও সার দিতে হবে। পুকুর প্রস্তুতির সময় শতাংশ প্রতি ২-৩ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে। চুন প্রয়োগের ৭-৮ দিন পর শতাংশ প্রতি ৫-৭ কেজি গোবর বা ৩-৪ কেজি মুরগির বিষ্ঠা, ১০০-১৫০ গ্রাম ইউরিয়া, ৫০-৭৫ গ্রাম টিএসপি এবং ২০-২৫ গ্রাম এসপি সার প্রয়োগ করতে হবে। পুকুরে পোনা মজুদের পর স্বাভাবিক মাত্রায় নিয়মিত উপরি সার ও সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ করতে হবে।

(৩) উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটনজনিত ঘোলাত্ব সৃষ্টি হলে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা করতে হবে। পানি পরিবর্তন করা সম্ভব না হলে খাদ্য প্রয়োগ মাত্রা কমিয়ে দিতে হবে। এরপর সন্ধ্যায় বা রাত্রে পুকুরে হেক্টর প্রতি ২০০-৩০০ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

পানির উপর সবুজ শ্যাওলার স্তর

পুকুরে উদ্ভিদ ও প্রাণী প্লাঙ্কটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন পানিতে থাকাতে সবুজ রং ধারণ করে। এ সবুজ কণা আবার নানা জাতের হয়ে থাকে। যেমন- চারা বা সুগন্ধী, শেওলা, কেশরী শেওলা, এককোষী শেওলা ইত্যাদী। এসব শেওলা নিজেরা সূর্যের আলোর উপস্থিতিতে খাদ্য তৈরী করে। পুকুরে এসব শেওলাই হল প্রাথমিক খাদ্য উৎপাদনকারী। পরবর্তীতে এ সব ক্ষুদ্র উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটনগুলিকে আবার ক্ষুদ্র প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন খেয়ে জীবন ধারণ ও বংশ বৃদ্ধি করে। এ উদ্ভিদ ও প্রাণী প্ল্যাঙ্কটন হল মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। পরিমিত মাত্রায় এ সব প্রাকৃতিক খাদ্য পুকুরে থাকলে মাছের উৎপাদন বেশী হয়। কিন্তু পুকুরে শেওলার মাত্রা বেশী হলে এ সব ভরে গিয়ে পানির উপর শ্যাওলার স্তর পড়ে। শ্যাওলা পচনের ফলে পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এতে মাছের ক্ষতি সাধিত হয়।

শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণের উপায়

(১) শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণের জন্য টাফাজিন ব্রান্ড নামে ডাইউরণ মিরাজিন নামক তরল রাসায়নিক পদার্থ লিটার প্রতি ৩-৫ মিলিগ্রাম পুকুরে প্রয়োগ করতে হয়।

(২) শ্যাওলা নিয়ন্ত্রণে শতাংশ প্রতি ১২-১৫ গ্রাম তুঁতে কয়েক ভাগ করে পানির উপরের স্তর থেকে ১০-১৫ সেন্টিমিটার নীচে কাপড়ের পোটলায় বেঁধে বাঁশের খুঁটিতে বেঁধে রাখতে হবে। এতে বাতাসের ঢেউয়ের ফলে শ্যাওলা তুঁতের সংস্পর্শে আসলে এবং পোটলার ভিতর থেকে গলে তুতে পানিতে মিশে শেওলা দমন হবে।

(৩) পুকুরের উপরের স্তরে ক্ষুদি পানা দিয়ে কয়েকদিন ঢেকে দিলে সূর্যের আলো পড়া বন্ধ হলে উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন কমে যাবে। পরে উপরের ক্ষুদি পানার আবরণ তুলে ফেলতে হবে।

(৪) পুকুরে হেক্টর প্রতি ২০০-৩০০ কেজি চুন প্রয়োগ করা যেতে পারে।

(৫) সম্ভব হলে পানি পরিবর্তন করতে হবে। মাছের খাদ্য কমিয়ে দিতে হবে।

পানির উপর লাল স্তর

পুকুরে পানির উপর লাল স্তর পড়লে তা তুলে ফেলতে হবে। ধানের খড়ের বিচালী বা কলা পাতার তৈরী দড়ি পানির উপর দিয়ে ভাসমান অবস্থায় টেনে এক জায়গায় তা জমা করতে হবে। তারপর কাপড় দিয়ে তা নিয়মিতভাবে তুলে ফেলতে হবে। বাতাস প্রবাহের ফলে

পুকুরের এক পাশে লাল স্তর জমলে উহার উপর কিছু ইউরিয়া পানিতে গুলে ছিটিয়ে দিলে তা দমন হবে।

দ্রবীভূত অক্সিজেন

মাছ পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন গ্রহণ করে। তাই পানিতে যথেষ্ট অক্সিজেন থাকা দরকার। পুকুরে বায়ুমন্ডল এবং পানির ভিতরে অবস্থিত উদ্ভিদ প্ল্যাঙ্কটনের তৈরী অক্সিজেন এ দু'ধরনের উৎস থেকে পানিতে অক্সিজেন দ্রবীভূত হয়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৫-৭ মিলিগ্রাম/ লিটার।

পানিতে অক্সিজেন অভাবের লক্ষণ ঃ মাছ পানির উপর ভেসে উঠে খাবি খায়। সাধারণতঃ মেঘলা দিনে হঠাৎ অতিরিক্ত বৃষ্টির পর ও অন্যান্য কারণে মাছ পানির উপর খাবি খেতে থাকে। পুকুরের শামুক ঝিনুক কিনারায় এসে জমা হয়। অক্সিজেনের অভাব খুব বেশী হলে মাছ মরতে শুরু করে। অক্সিজেন অভাবজনিত মৃত মাছ হা করে থাকে এবং ফুলকা ফেটে যায়।

অক্সিজেন অভাব দূর করার উপায়

(১) পানিতে সাঁতার কাটা, বাঁশ দ্বারা পানির উপরে পেটানো ও হররা টেনে তলার গ্যাস বের করে দিতে হবে।

(২) পুকুরে পাম্প বসিয়ে সেচের মাধ্যমে ঢেউয়ের সৃষ্টি করতে হবে। পুকুরে এজিটেটর থাকলে তা চালাতে হবে।

(৩) সম্ভব হলে বাহির থেকে নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে।

(৪) এ অবস্থায় সম্পূরক খাদ্য ও সার ব্যবহার কমিয়ে বা বন্ধ করে দিতে হবে।

(৫) পুকুরে শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি চুন প্রয়োগ করতে হবে।

কার্বনডাই অক্সাইডজনিত পানি দূষণ

কোন কারণে কার্বনডাই অক্সাইডের পরিমাণ অত্যধিক বেড়ে গেলে মাছের দেহে বিষক্রিয়া শুরু হয়। পানিতে অক্সিজেন কমে যায়। এতে মাছের শ্বাসকষ্ট হয়। পুকুরের পানিতে কার্বনডাই অক্সাইডের প্রয়োজনীয় মাত্রা ১-২ মিলিগ্রাম/ লিটার।

কার্বনডাই অক্সাইড নিয়ন্ত্রণ করার উপায়

(১) পানির উপর বাঁশ দিয়ে পিটিয়ে, হররা টেনে, সাঁতার কেটে, পুকুরে পাম্প বসিয়ে, এজিটেটর ব্যবহার করে পানিকে আন্দোলিত করতে হবে।

(২) পুকুরে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(৩) সার প্রয়োগ করে উদ্ভিদ কণার পরিমাণ বাড়াতে হবে।

(৪) সুযোগ থাকলে নতুন পানি পুকুর সরবরাহ দিতে হবে।

(৫) মাছ ছাড়ার পূর্বে পুকুর তৈরীর সময় অতিরিক্ত কাদা সরিয়ে ফেলতে হবে।

এ্যামোনিয়াজনিত সমস্যা

এ্যামোনিয়া বেড়ে গেলে পানির রং তামাটে অথবা কালচে রংয়ের হয়। মাছের ছুটাছুটি বেড়ে যায়। মাঝে মাঝে লাফিয়ে পানির উপর উঠে আসে। এ্যামোনিয়া বেশি হলে মাছ মারা যেতে থাকে। পুকুরের পানিতে এ্যামোনিয়ার মাত্রা ০.০২৫ মিলিগ্রাম/ লিটার এর উর্ধ্বে উঠলে মাছের এ সমস্যা হতে পারে।

অতিরিক্ত এ্যামোনিয়া নিয়ন্ত্রণ

(১) মাছের মজুদ ঘনত্ব কমাতে হবে।

(২) সার ও খাদ্য প্রয়োগ সাময়িক ভাবে বন্ধ রাখতে হবে।

(৩) পুকুরের পানি কমিয়ে নতুন করে পানি সরবরাহ করতে হবে।

অতিরিক্ত নাইট্রাইটজনিত সমস্যা

নাইট্রাইট মাছের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। এটি মাছের দেহে অক্সিজেন পরিবহনে বাধার সৃষ্টি করে। রক্তে নাইট্রাইট বেশী হলে বাদামী রং ধারণ করে। এ সময় মাছ খাদ্য গ্রহণ বন্ধ করে দেয়। এর ফলে মাছ মারা যায়। পুকুরের পানিতে নাইট্রাইটের সহনশীল মাত্রা ০.১ মিলিগ্রাম/ লিটার পর্যন্ত।

নাইট্রাইট নিয়ন্ত্রণের উপায়

(১) পুকুরে মাছের মজুদ ঘনত্ব কমিয়ে দিতে হবে।

(২) পুকুরে ২৫০ মিলিগ্রাম/ লিটার হারে লবণ দিতে হবে।

হাইড্রোজেন সালফাইডজনিত সমস্যা

হাইড্রোজেন সালফাইড মাছের জন্য অত্যন্ত বিষাক্ত। এ গ্যাস মাছের ফুলকা, যকৃত এবং পিত্ত নষ্ট করে দেয়। পুকুরের নিম্ন স্তরে বিরাজমান মাছ কীট পতঙ্গ খুঁজতে এসে নীচে জমে থাকা এ গ্যাসের সংস্পর্শে এসে আক্রান্ত হয়। পুকুরের পানিতে হাইড্রোজেন সালফাইডের মাত্রা ০.০০২ মিলিগ্রাম/ লিটার এর উর্ধ্বে গেলে মাছের এ সমস্যা হতে পারে।

হাইড্রোজেন সালফাইড নিয়ন্ত্রণ

(১) হাইড্রোজেন সালফাইড বেড়ে গেলে শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করতে হবে।

(২) পানির পরিমাণ কমিয়ে নতুন পানি সরবরাহ করতে হবে।

(৩) এক ফুট পানির গভীরতায় শতাংশ প্রতি ২৭-৫৪ গ্রাম হারে পটাশিয়াম পার ম্যাঙ্গানেট প্রয়োগ করতে হবে।

(৪) পুকুরের পানিতে সাঁতার কেটে, বাশ দ্বারা পিটিয়ে অথবা এজিটেটর বসিয়ে পনিকে আন্দোলিত করতে হবে।

পিএইচজনিত সমস্যা

পানিতে পিএইচ কম হলে শরীর থেকে প্রচুর বিজল বা শ্লেস্মা বের হয় এবং ফুলকা আক্রান্ত হয়। মাছ খাবার কম খায়। অম্ল এঁটেল মাটির পুকুরের পানি অতিরিক্ত ঘোলা থাকে। পিএইচ বেশি হলে পুকুরের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন কমে যায় এবং মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায়। এছাড়া মাছের শরীর খসখসে হয়ে যায়। ফলে মাছ ক্রমে দুর্বল হয়ে পড়ে ও সহজেই রোগে আক্রান্ত হয়। পুকুরের পানিতে পি এইচের গ্রহণযোগ্য মাত্রা ৬-৮ এবং তার বেশী বা কম হলে মাছের এ সমস্যা হতে পারে।

পিএইচ কম হলে নিয়ন্ত্রণের উপায় ঃ চুন, ডলোমাইড অথবা জিপসাম প্রয়োগ করে পানির পি এইচ মান বাড়ানো যায়। চুন প্রয়োগের মাত্রা পি এইচ মানের কম বা বেশী হতে পারে। সাধারণতঃ শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে চুন ব্যবহার করতে হয়।

পিএইচ বেশি হলে নিয়ন্ত্রণের উপায় ঃ পিএইচ এর মাত্রা বেড়ে গেলে পুকুরে তেঁতুল বা সাজনা গাছের ডাল ৩-৪ দিন ভিজিয়ে রেখে পরে তা তুলে ফেলতে হবে। সরাসরি তেতুল পানিতে গুলে প্রয়োগ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পানির ক্ষারত্ব

পানিতে দ্রবীভূত বাইকার্বনেট ও কার্বনেট-এর ঘনত্বই হল ক্ষারত্ব। এ বাইকার্বনেট ও কার্বনেট অন্য কতগুলো উপাদানের সাথে একত্রে মিলিত আকারে থাকে। উপাদানগুলোর মধ্যে ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম অন্যতম। এসব উপাদানের ঘনত্বকে খরতা বলে। এগুলোকে ক্যালসিয়াম কার্বনেট-এর পরিমাণ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। পুকুরে ক্ষারত্বের মাত্রার উপর সার ব্যবহারের পরিমাণ নির্ভর করে। কম ক্ষারত্বের পানিতে বেশী রাসায়নিক সার দরকার হয়। এতে মাছচাষের খরচ বেড়ে যায় অন্য দিকে কম ক্ষারত্বের জন্য প্রাকৃতিক খাদ্য কম তৈরী হওয়ার ফলে মাছের উৎপাদন কম হয়। কম ক্ষারত্বের পুকুরে বিশেষ করে কাতলা, সিলভার কার্প, বিগহেড মাছের বাড়ন অনেক কম হয়। কাজেই চাষের পুকুরে সব সময় উপযুক্ত মাত্রায় ক্ষারত্ব বজায় রাখতে হবে। মাছ চাষের পুকুরে পানির ক্ষারত্বের উপযুক্ত মাত্রা ৮০-২৫০ মিলিগ্রাম/ লিটার।

ক্ষারত্ব বৃদ্ধি করার উপায় ঃ পুকুরে ক্ষারত্বের উপযুক্ত মাত্রা বজায় রাখার জন্য পুকুর তৈরীর সময় প্রয়োজনমত চুন ব্যবহার করতে হয়। পুকুরে নানাবিধ কারণে চাষকালীন সময়েও ক্ষারত্ব উপযুক্ত মাত্রার চেয়ে কমে যেতে পারে। তাই এ ক্ষেত্রেও চুন ব্যবহার করতে হবে। ক্ষারত্ব বৃদ্ধির জন্য পুকুরে ছাই ব্যবহার করলেও ভালফল পাওয়া যায়। ছাই ব্যবহারে ক্ষারত্বের মাত্রা বেশীদিন স্থায়ী হয় না। তবে ছাই দেশের সকল স্থানে পর্যাপ্ত পাওয়া যায় এবং মূল্য খুবই কম। পানির ক্ষারত্ব কমে গেলে মজুদ পুকুরেও চুন শতাংশ প্রতি ১-২ কেজি হারে ব্যবহার করতে হবে। ছাই ব্যবহার করলে শতাংশ প্রতি ২০-৩০ কেজি হারে ব্যবহার করতে হবে।

অধিক ঘনত্বে ছোট পোনা মজুদ প্রবণতা

পূর্বেই বলা হয়েছে আমাদের দেশে গ্রামীণ পুকুরগুলোতে পানি নিষ্কাশন ও সরবরাহ ব্যবস্থা নেই। তাই এ সব পুকুর নিবিড় পদ্ধতিতে মাছ চাষ করার উপযোগী নয়। কিন্তু মৎস্য চাষীরা অধিক লাভের আশায় এবং প্রয়োজনীয় জ্ঞানের অভাবে অধিক ঘনত্বে ছোট পোনা মজুদ করেন। এতে পানির উপযুক্ত পরিবেশ ঠিক রাখা যায় না। তাই অধিক ঘনত্বে ছোট পোনা মজুদ না করে পরিমিত সংখ্যায় সুস্থ সবল ভাল জাতের বড় পোনা মজুদ করে কাংখিত উৎপাদন পাওয়া যাবে।

উন্নত মানের মৎস্য পোনা উৎপাদনে হ্যাচারী ব্যবস্থাপনা

ডঃ এম. জি হোসেন
বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট

মাছ চাষে উন্নত মানের পোনার ব্যবহার অধিক উৎপাদন ও মুনাফা লাভের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। হ্যাচারীতে উন্নত জাতের সুপরিপক্ব ব্রুড মাছের ব্যবহার গুণগত মানসম্পন্ন পোনা উৎপাদনের পূর্বশর্ত। অথচ দেশে বিদ্যমান প্রায় ৫০০ সরকারী ও বেসরকারী হ্যাচারীতে মাছের প্রজনন কার্যক্রমে এই শর্তটি সঠিকভাবে পালন করা হচ্ছে না বিধায় হ্যাচারীতে উৎপাদিত পোনার উৎপাদনশীলতা হ্রাস, অঙ্গসংস্থানগত বিকৃতি, রোগ বালাই এবং ব্যাপক মৃত্যুহার সম্পর্কে অভিযোগ নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। হ্যাচারীতে পোনার গুণগত মানের এই অবক্ষয় ভালভাবে খতিয়ে দেখার ফলে যে বিষয়গুলো আজ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে তা হলোঃ (ক) ব্রুড মাছ বাছাইয়ে হ্যাচারী অপারেটরদের অসচেতনতা (খ) বংশগতভাবে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ব্রুড মাছ ব্যাপকভাবে প্রজনন কাজে ব্যবহার, (গ) হ্যাচারীতে ব্রুড মাছ সংরক্ষণ ও প্রতিপালনে দারুণ অব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। এইসব সমস্যার সম্মিলিত ফলস্বরূপ যে বিষয়টি আজ প্রকট হয়ে দাঁড়িয়েছে তা হলো হ্যাচারীতে পোনা উৎপাদনে ব্রুড মাছের ঋণাত্মক প্রজনন প্রবণতার ক্ষয়িষ্ণু প্রভাবে মজুদের অবক্ষয় এবং অন্তঃপ্রজননের সমাবেশ জনিত সমস্যায় বংশাবনতি। এই অবস্থা উত্তরণের লক্ষ্যে ব্রুড মাছের সঠিক ব্যবস্থাপনা, উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন, প্রতিপালন, সংরক্ষণ এবং উন্নত হ্যাচারী অপারেটরদের জন্যে অত্যাবশ্যক।

হ্যাচারীতে ব্রডস্টক উন্নয়নে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা

(ক) ব্রডমাছের ঋণাত্মক নির্বাচন প্রবণতা হ্রাসের উপায়

ঋণাত্মক বা নির্দিষ্ট নির্বাচনে (Indirect selection) প্রবণতা হ্রাস করার জন্য ব্রুডষ্টক উন্নয়নের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারেঃ

- প্রাকৃতিক (নদী, প্লাবন ভূমি ইত্যাদি) অথবা জ্ঞাত উৎস থেকে বন্যজাতের মাছ সংগ্রহ করা উচিত। এ ক্ষেত্রে সংগ্রহের স্থান, তারিখ, প্রজাতি, আকার এবং ওজন ও সংখ্যা ইত্যাদি লিপিবদ্ধ করে রেণু, আঙ্গুলি বা কিশোর পোনা হ্যাচারীতে সংরক্ষণ করা যেতে পারে।
- মাছের পরিপক্বতা আসার ঠিক পূর্বে বা অব্যাবহিত পরে দ্রুত বর্ধনশীল ও সবচেয়ে সবল মাছ সকলকে নির্বাচন করতে হবে। যতদূর সম্ভব বেশী মাছ থেকে কম সংখ্যক ব্রুড নির্বাচন করাই উত্তম পদ্ধতি।
- নির্বাচিত মজুদকে অবশ্যই আদালাভাবে রাখতে হবে এবং একজন হ্যাচারী ব্যবস্থাপক বিভিন্ন বয়সের মাছকে চিহ্নিত (Alcian blue প্রয়োগ করে) অথবা ট্যাগিং (নাম্বারযুক্ত প্লাষ্টিক বা AVID tag) করার বিষয় বিবেচনায় আনতে পারে।
- প্রজনন কাজের জন্য ভাল স্বাস্থ্য ও পরিপক্ব মাছ পুনঃনির্বাচন করা যেতে পারে।
- বিভিন্ন নির্বাচিত মৎস্য মজুদ থেকে উৎপাদিত রেণুপোনা আলাদাভাবে বা একত্রে (প্রত্যেক গোত্র থেকে স্বল্প এবং সমান সংখ্যক) মজুদ করতে হবে। এ ক্ষেত্রে ট্যাগ নম্বরসহ প্রজননকৃত মাছের সংখ্যা ও তারিখ, হ্যচিং তারিখ এবং প্রত্যেক নার্সারী বা রিয়ারিং পুকুরে মজুদের সংখ্যা লিপিবদ্ধ করতে হবে।

(খ) অন্তঃপ্রজননের সমাবেশ জনিত সমস্যায় বংশাবনতি এড়িয়ে চলার উপায়

অন্তঃপ্রজননের সমাবেশ জনিত সমস্যায় বংশাবনতি (Inbreeding depression) সমস্যা থেকে উত্তরণের জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যেতে পারে ঃ

- মাছের আকার, পরিপক্বতা এবং প্রজনন ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে সর্বোৎকৃষ্ঠ মাছ নির্বাচন করার জন্য হ্যাচারীতে যথাসম্ভব বেশী সংখ্যক মাছ সংগ্রহ এবং উৎপাদন করতে হবে। (সাধারণতঃ মধ্যম পর্যায়ে প্রতি প্রজাতিতে ৩০০০-৫০০০ প্রজনন সক্ষম মাছ) যার ফলে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উন্নত পোনা উৎপাদন ও সরবরাহ করা সম্ভব হবে।

- নিকট আত্মীয় জনতার মধ্যে প্রজনন প্রবণতা পরিহার বা হ্রাসকল্পে হ্যাচারীতে অবশ্যই পিডিগ্রি (Pedigree) বা কুলনামা লিপিবদ্ধ করতে হবে। হ্যাচারী ব্যবস্থাপককে এ বিষয়ে অবশ্যই সতর্ক থাকতে হবে। অন্যথায় একটি মজুদে বংশ পরম্পরায় অনাকাংক্ষিত জিন/ অ্যালিল-এর সমাবেশ ঘটে অন্তঃপ্রজনন চাপজনিত সমস্যায় পতিত হবে।
- অন্তঃপ্রজনন রোধ বা হ্রাস করার সহজতম উপায় হলো বিভিন্ন হ্যাচারীর মধ্যে ব্রুডস্টক বিনিময় করা। এক্ষেত্রে সতর্ক থাকতে হবে যেন নদী উৎসজাত ব্যতীত বিনিময়যোগ্য যে কোন ব্রুড মাছ একই উৎসের না হয়।
- উৎকৃষ্ট মানের প্রজনন কাজের জন্য অবশ্যই একটি কার্যকরী সংখ্যক (Effcetive population size) জনতার ব্যবস্থাপনা রাখতে হবে। অর্থাৎ প্রতিটি একক উপজনতা থেকে সমান সংখ্যক মাছ নিয়ে একটি কার্যকরী সংখ্যক জনতা গঠিত হবে। এই প্রক্রিয়া পারিবারিক সংখ্যায় বৈষম্যজনতি প্রবণতা হ্রাস করবে এবং সেক্ষেত্রে প্রতি প্রজন্মে কৌলিতাত্বিকভাবে যোজিত ফলের সমতালাভ ঘটবে।
- অধিকাংশ হ্যাচারীতে একটি সুপরিকল্পিত নির্বাচিত প্রজনন প্রক্রিয়ার প্রচলন করা উচিত। এক্ষেত্রে বন্যজাত সংগ্রহ এবং নকশা অনুযায়ী প্রজনন ঘটিয়ে উৎকৃষ্ট বা অনুকূল অ্যালিলমাত্রা বৃদ্ধি করতঃ একটি পথিকৃত জনতার মধ্যে কাংক্ষিত বৈশিষ্ট্যের সমাবেশ ঘটানো সম্ভব যাতে বংশ পরম্পরায় কুলউত্তোরণ (Heritability) ও কৌলিতাত্ত্বিক বৈষম্যের (Genetic Variability) মাত্রা সর্বোচ্চ এবং অন্তঃপ্রজনন মাত্রা সর্বনিম্ন পর্যায়ে থাকে (টেবিল ১ এবং রেখা চিত্র ১ এ প্রদত্ত কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে)।

হ্যাচারী সার্বিক ব্যবস্থাপনার উন্নয়ন করা

উল্লেখিত বিষয়সমূহের প্রতি যত্নবান হওয়ার পাশাপাশি হ্যাচারী অপারেটরগণ তাদের হ্যাচারী ব্যবস্থাপনার দ্বারাই হ্যাচারীর সার্বিক অবস্থার উন্নয়ন ঘটানো সম্ভব। তাই নিম্নবর্ণিত বিষয়গুলো সকল হ্যাচারী অপারেটরদের মেনে চলা অত্যাবশ্যক।

পরিমিত সংখ্যক ব্রুড মাছ মজুদকরণঃ প্রজনন মৌসুমে হ্যাচারীতে সুষম পরিপক্ব ব্রুড মাছের যোগান দিতে হলে পুকুরে মজুদ সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। প্রতি হেক্টরে ১৬০০ কেজি ব্রুড মাছ মজুদ করলে ভাল ফল পাওয়া যায়।

পানি সরবরাহ ঃ পুকুরে নিয়মিতভাবে পরিষ্কার ভূগর্ভস্থ পানির সরবরাহ মাছের দৈহিক সুস্থতা এবং প্রজনন পরিপক্বতার জন্য অত্যন্ত অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

ব্রুড মাছের সুষম খাদ্য ঃ ২৪-৩৫% আমিষ এবং ৩.৪-৩.৮ কিলো ক্যালরী/ গ্রামশক্তি বিশিষ্ট খাদ্য ব্রুড মাছের খাদ্য হিসেবে ব্যবহার করা উচিত। ব্রুড মাছের জন্য ফিশ মিল (১৫%), সরিষার খৈল (১০%) তিলের খৈল (২০%) , চালের কুঁড়া (১৫%), গমের ভূষি (৩০%), আটা (৫%) ও লালী গুঁড় (৫%)-এর সমন্বয়ে খাদ্য প্রস্তুত করে দৈনিক দৈহিক ওজনের ২% হারে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ব্রুড মাছের রোগবালাই ঃ ব্রুড মাছের চাষে তিনটি সমস্যা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। প্রথমতঃ পুকুরে অক্সিজেনে ঘাটতি, দ্বিতীয়তঃ মাছের দেহে উকুনের (আরগুলাস) আক্রমণ এবং তৃতীয়তঃ দেহে আঘাতজনিত ক্ষত। অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে পুকুরে বাইরে থেকে পানি সরবরাহ করা সহ অন্যান্য উপায়ে তা বৃদ্ধি করা যায়। আরগুলাস নিধনের জন্য প্রথমবারে ০.৫ মিলিগ্রাম/ লিটার হারে এবং ১৫ দিন পর ১ মিলিগ্রাম/ লিটার হারে ডিপটেরেক্স প্রয়োগ করা যেতে পারে। আর ক্ষত রোগের হাত থেকে মাছকে রক্ষা করার জন্য ১৫ মিগ্রাঃ/ কেজি হারে মাছের দেহে টেরামাইসিন ইনজেকশন দিতে হবে।

ডিম ও রেণু ব্যবস্থাপনা ঃ ইনকিউবেশন ইউনিট যেমন ফানেল, সার্কুলার ট্যাংক ইত্যাদিতে পরিমিত পরিমাণ ডিম ও রেণু লালন করা বাঞ্ছনীয়। অন্যথায় এখান থেকে তৈরী পোনা দৈহিকভাবে দুর্বল ও বিকলাঙ্গ হয়। ডিম দেওয়ার পূর্বে ইনকিউবেশন ইউনিট অত্যন্ত স্বাস্থ্যকর উপায়ে পটাসিয়াম পারম্যাঙ্গানেট বা মিথাইল ব্লু-এর ১-২% দ্রবণের দ্বারা (জীবাণুমুক্তকরণের কাজে) পরিষ্কার করা আবশ্যক। এই জাতীয় দ্রবণ ব্যবহারের পরই সেই সকল স্থান পরিষ্কার জলে ভালভাবে ধুয়ে ফেলতে হবে।

নার্সারী ঃ রেণু পোনা মজুদের পূর্বে অত্যন্ত ভালভাবে নার্সারী পুকুর প্রস্তুত করে তাতে পরিমিত পরিমাণ (সাধারণ ৫০-১০০ গ্রাম/শতাংশ) রেণু পোনা মজুদ করতে হবে এবং খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে।

টেবিল-১ ঃ ৩ X ৩ দ্বিপাক্ষিক প্রজনন পদ্ধতিতে কার্পের বন্যজাতের মধ্যে প্রজনন কৌশল ঘটানো

তিনটি নদী থেকে সংগৃহীত স্ত্রী ব্রুড ষ্টক	তিনটি নদী থেকে সংগৃহীত পুরুষ ব্রুড ষ্টক		
	১	২	৩
১	–	×	×
২	×	–	×
৩	×	×	–

X ঃ ১০-১২ জোড়া আন্তঃনদী ব্রুড ষ্টকের মধ্যে প্রজনন

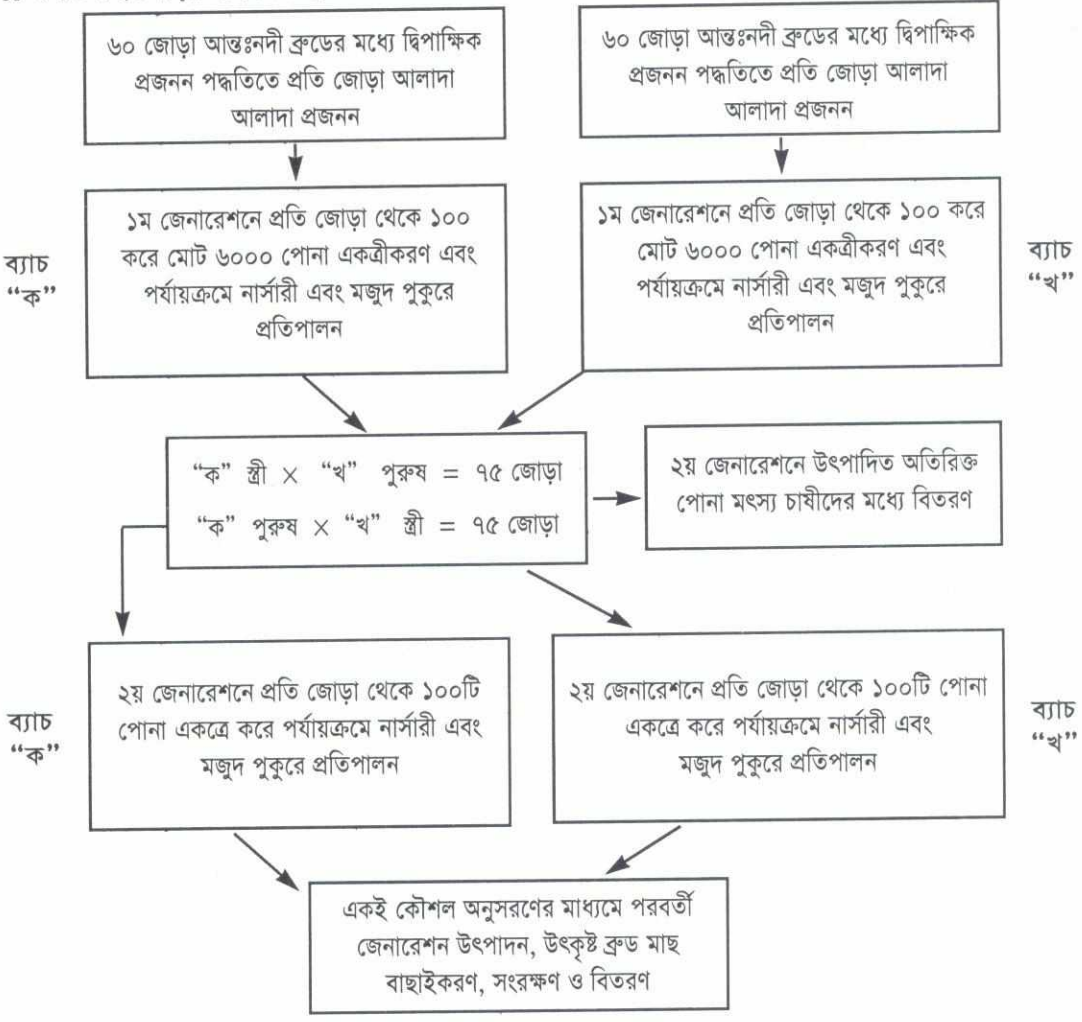

রেখা চিত্র-১ ঃ সম্পূর্ণ নির্বাচিত প্রজননের মাধ্যমে উন্নত ব্রুড মাছ উৎপাদন ও বিতরণ কৌশল।

পুকুর ব্যবস্থাপনায় মাটি ও পানির গুণাগুণের প্রভাব

মোঃ আমিনুল ইসলাম
মৎস্য অধিদপ্তর

জীব জগতের সকল প্রাণীর জীবন যাপনের জন্য স্ব স্ব পরিবেশের বিভিন্ন উপকরণ অপরিহার্য। মাছের জীবন ধারণের আবাসস্থল জলাশয়। মাছের ক্ষেত্রে তাই সুষ্ঠু জলজ পরিবেশ প্রয়োজন। মাছ তার জীবন ধারণের সব কাজ পুকুর-জলাশয়ের পানির মধ্যেই সম্পন্ন করে থাকে। এসব কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য পুকুরের বা জলজ পরিবেশের বিভিন্ন গুণাবলী যথাযথ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনা প্রয়োজন।

পুকুরের মাটি ও পানির গুণাগুণ যথাযথ মাত্রার না হলে পুকুরে নিম্নরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিবে ঃ

- মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য যথেষ্ট পরিমাণে উৎপাদিত হবে না
- বাইর থেকে দেওয়া সম্পূরক খাদ্যের অপচয় হবে
- মাছের বৃদ্ধি আশানুরূপ হবে না
- মাছ রোগ বালাই-এ আক্রান্ত হবে ও মারা যেতে পারে
- মাছের উৎপাদন কম হবে।

কোন জলাশয়ের পানি ধারণের আধার হলো মাটি। মাটিতে বিদ্যমান বিভিন্ন উপাদান পানির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ নিয়ন্ত্রণ করে। অর্থাৎ কোন জলাশয়ের উৎপাদন ক্ষমতা প্রাথমিকভাবে ঐ জলাশয়ের মাটির ধরনের ওপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে লাভজনকভাবে মাছ চাষের জন্য প্রয়োজন স্বাস্থ্যকর জলজ পরিবেশ এবং পানিতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমিত প্রাচুর্যতা। পানির প্রাথমিক উৎপাদন ক্ষমতা প্রধানত মাটির ভৌত রাসায়নিক গুণাগুণ তথা মাটির উর্বরতার ওপর নির্ভর করে।

মাটির ভৌত-রাসায়নিক গুণাগুণ

যে অঞ্চলের মাটি উর্বর সে স্থানে খনন করা পুকুরও সাধারণভাবে উর্বর হয়ে থাকে এবং সে অঞ্চলের পুকুরে মাছের উৎপাদনও ভাল হয়। উর্বর মাটি পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্যের যোগান দেয় এবং পানি দূষণ রোধে ভূমিকা রাখে। সাধারণভাবে মাটি ৪ প্রকারের হয়ে থাকে- ক) এঁটেল মাটি, খ) বেলে মাটি, গ) লাল মাটি এবং ঘ) দোআঁশ মাটি। দোআঁশ মাটির পুকুর মাছ চাষের জন্য সর্বাধিক উপযোগী। বেলে মাটির পানি ধারণক্ষমতা খুবই কম এবং লাল মাটির পুকুরে পানি প্রায় সবসময় ঘোলা থাকে। এজন্য বেলে মাটি ও লাল মাটিতে খনন করা পুকুর মাছ চাষের জন্য ততটা উপযোগী হয় না। বিভিন্ন ধরনের পুষ্টি ধরে রাখা ও আদান প্রদানে দোআঁশ মাটি উত্তম।

- দোআঁশ মাটি মাছ চাষের জন্য উত্তম।
- এঁটেল মাটি মাছ চাষের জন্য কম উপযোগী
- বেলে মাটি চাষ চাষের উপযোগী নয়
- লাল মাটিতে মাছচাষ ব্যয়বহুল।

মাছ চাষের জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পানির উপযোগিতা মাটির কয়েকটি উপাদানের মানের ওপর নির্ভর করে। যথা- পি.এইচ, ফসফরাস, নাইট্রোজন, কার্বন-ডাই অক্সাইড, জৈব পদার্থ ইত্যাদি। নিচে এসব সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করা হলো ঃ

পি. এইচ ঃ মাটির পি এইচ (PH) ৬.৫-৯.০-এর মধ্যে হলে তা মাছ চাষের জন্য উত্তম। অনুকূল পি.এইচ মাত্রায় ফসফরাসের যোগান বৃদ্ধি পায় এবং অ্যামোনিয়া ও নাইট্রোজেনঘটিত অণুজীব অধিক কর্মক্ষম হয়। পি. এইচ ৬.০-এর নিচে হলে মাটি অধিক অম্লীয় হয় এবং পানিতে ক্ষতিকর মৌলিক পদার্থের উপস্থিতি দেখা দেয়। আবার পি.এইচ-এর মাত্রা ৯.০ এর বেশি হলে অণুজীবগোষ্ঠী নিষ্ক্রিয় হয় ও ফসফরাসের সরবরাহ হ্রাস পায়। এতে উদ্ভিদ প্ল্যাংটনের উৎপাদন খুব কমে যায়।

ফসফরাস ঃ ফসফরাস মাটিতে ক্যালসিয়াম, আয়রণ ও এ্যালুমিনিয়ামের ফসফেট হিসেবে অবস্থান করে। মাটিতে পরিমিত জৈব পদার্থের উপস্থিতিই সহজপ্রাপ্য ফসফরাসের সরবরাহ অব্যাহত রাখে। ফসফরাসের প্রাচুর্যতা পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা সরাসরি নিয়ন্ত্রণ করে। ফসফরাস সবুজ শেওলার বংশ বৃদ্ধিতে

সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। ফলে অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ-প্ল্যাংটন উৎপন্ন হয়। মাছ চাষের জন্য প্রতি ১০০ গ্রাম মাটিতে ১০-১৫ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য ফসফেট থাকা উচিত।

নাইট্রোজেন ঃ বায়ুমন্ডলের নাইট্রোজেনই মাটির নাইট্রোজেনের প্রধান উৎস। প্রতি১০০ গ্রাম মাটিতে ৮-১০ মিলিগ্রাম হারে সহজপ্রাপ্য নাইট্রোজেন থাকা দরকার। নাইট্রোজেন উদ্ভিদকে ঘন সবুজ রাখে। পরিমিত নাইট্রোজেনের উপস্থিতিতে উদ্ভিদ-প্ল্যাংটনের খাদ্য তৈরির প্রক্রিয়া সুষ্ঠুভাবে সম্পাদিত হয় এবং বৃদ্ধি ত্বরান্বিত হয়। ফলে অধিক পরিমাণে উদ্ভিদ-প্ল্যাংটন উৎপন্ন হয় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি হয়।

জৈব পদার্থ ঃ মাটিতে বিদ্যমান জৈব পদার্থ যে কোন উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একটি অপরিহার্য উপাদান। জৈব পদার্থ পুকুরের তলায় মাটিকে সজীব ও সক্রিয় রাখে এবং পানি চুয়ানো বন্ধ করে মাটির পানি ধারণক্ষমতা বৃদ্ধি করে। জৈব পদার্থ ফরফরাস ও নাইট্রোজেনের প্রদান উৎস। জলজ পরিবেশে জৈব পদার্থ আবহাওয়া থেকে সরাসরি নাইট্রোজেন ধারণ করে।

অতিরিক্ত মাত্রায় জৈব পদার্থ পানির পি.এইচ কমিয়ে দিয়ে পানি দূষিত করে। আবার কখনও দূষণ দূর করতে জৈব পদার্থ প্রয়োগ করা হয়। ডুবন্ত কণার কারণে পানি ঘোলা হলে জৈব পদার্থ প্রয়োগে তা দূর করা যায়। পুকুর বা জলাশয়ের মাটিতে সাধারণভাবে শতকরা ১.০-২.০ ভাগ জৈব কার্বন থাকলে পানির উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

নিচের ছকে পুকুরের মাটির বিভিন্ন গুণাগুণের অনুকূল মাত্রা দেওয়া হলো-

মাটির গুণাগুণের নাম	অনুকূল মাত্রা
পি.এইচ	৬.৫-৯.০
জৈব কার্বন	১.৫-২০%
জৈব পদার্থ	২.৫-৪.৩ (মি. গ্রা./১০০ গ্রা.)
নাইট্রোজেন	৮-১০ মি.গ্রা./১০০ গ্রা.
ফসফরাস	১০-১৫ মি. গ্রা./ ১০০ গ্রা

পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণ

মাছের জীবন ধারণের একমাত্র মাধ্যম পানি। এজন্য পানির ভৌত-রাসায়নিক ও জৈবিক গুণাগুণ মাছের জীবন যাত্রাকে প্রভাবিত করে মাছের উৎপাদনকে নিয়ন্ত্রণ করে। মাছের খাদ্য গ্রহণ, বেঁচে থাকা, দৈহিক বৃদ্ধি, প্রজনন এবং অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য এসব ভৌত রাসায়নিক গুণাবলীর একটি অনুকূল মাত্রা রয়েছে।

পানির ভৌত গুণাগুণ

পানির ভৌত অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা সম্পর্কে ধারণা করা যায়। পানির ভৌত গুণাগুণগুলো নিম্নরূপ ঃ

বর্ণ ঃ পানির বর্ণ হালকা সবুজ হলে তা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে। পানির বর্ণ হলুদাভ হলে ঐ পানিতে নাইট্রেটের পরিমাণ কম হয়। ফসফরাসের পরিমাণ কমে গেলে পানি কালচে বর্ণ ধারণ করে। ধূসর বর্ণের পানিতে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ কম থাকে। কোন কোন উদ্ভিদ প্ল্যাংটনের আধিক্যের জন্য পানির বর্ণ মরচে লাল হয়, কিন্তু এগুলো মাছের খাদ্য নয়।

পানি বর্ণ	প্রাকৃতিক খাদ্যের পরিমাণ ও প্রকৃতি	মাছ চাষে উপযোগিতা
স্বচ্ছ	উদ্ভিদ-প্ল্যাংটন নাই	ভাল নয়
সবুজাভ	পরিমাণমত উদ্ভিদ প্ল্যাংটন আছে	ভাল
ঘন সবুজ	অতিরিক্ত উদ্ভিদ প্ল্যাংটন আছে	ক্ষতিকর
বাদামী সবুজ	পরিমাণমত উদ্ভিদ ও প্রাণী-প্ল্যাংটন আছে	উত্তম
ধূসর সবুজ	অল্প উদ্ভিদ-প্ল্যাংটন ও ভাসমান পলিকণা বিদ্যমান	কম উপযোগী
মরচে	মাছের খাদ্য নয় এমন উদ্ভিদ-প্ল্যাংটন বিদ্যমান	উপযোগী নয়

গভীরতা ঃ মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য প্ল্যাংটনের উৎপাদন ও সালোকসংশ্লেষণের জন্য সূর্যালোক অপরিহার্য। পুকুর বেশি গভীর হলে সূর্যালোক অপরিহার্য। পুকুর বেশি গভীর হলে সূর্যালোক নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত পৌঁছতে পারেনা, এতে প্রাকৃতিক খাদ্যের পর্যাপ্ত উৎপাদন হয় না, ফলে মাছের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। পুকুরের গভীরতা কম হলে পানি গরম হতে পারে এবং তলদেশে ক্ষতিকর উদ্ভিদ জন্মাতে পারে। পানির গভীরতা বেশি হলে পুকুরের তলদেশে তাপমাত্রা কম থাকে, অক্সিজেনের অভাব ঘটে এবং তলদেশে ক্ষতিকর গ্যাস সৃষ্টি হয়। এ অবস্থায় দূষণ

এড়াতে তলদেশের মাছ ও অন্যান্য প্রাণী পানির উপরিভাগে চলে আসে।

> পুকুরে পানির গভীরতা কমপক্ষে ১.৫ মিটার থেকে ৩ মিটার পর্যন্ত হতে পারে। দুই মিটার গভীরতা মাছ চাষের জন্য উত্তম।

পানির স্বচ্ছতা ও ঘোলাত্ব ঃ পুকুরের পানি ঘোলা হলে কার্যকর সূর্যালোক পানির নির্দিষ্ট গভীরতা পর্যন্ত প্রবেশ করতে পারে না। ফলে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য অর্থাৎ উদ্ভিদ প্ল্যাংটনের উৎপাদন কমে যায়। আবার পানির উপরের স্তরে অতিরিক্ত উদ্ভিদ-প্লাংটন উৎপাদনের ফলে পানির স্বচ্ছতা কমে যেতে পারে। এতে অক্সিজেনের অভাবে মাছের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হয়। পানির স্বচ্ছতা ২৫ সেন্টিমিটার হলে পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা বেশি হয়। ঘোলা পানি মাছের খাদ্য চাহিদাকে প্রভাবিত করে। ঘোলা পানিতে দ্রবীভূত বিভিন্ন ধরনের কণা মাছের ফুলকায় আটকে থেকে ফুলকা বন্ধ করে দেয়। এতে মাছের শ্বাস নিতে কষ্ট হয়। ফলে মাছের খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়।

> প্রতি শতকে ১.০-১.৫ কেজি হারে জিপসাম প্রয়োগ করে পানির ঘোলাত্ব দূর করা যায়। পুকুরের কোণায় খড়ের ছোট ছোট আটি রেখে দিলেও এক্ষেত্রে ভাল ফল পাওয়া যায়।

তাপমাত্রা ঃ মাছ শীতল রক্ত বিশিষ্ট প্রাণী। মাছের শরীরের তাপমাত্রা পানির তাপমাত্রার সাথে উঠানামা করে। তাই মাছের বৃদ্ধির হার তাপমাত্রার সাথে সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। তাপমাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতাও বেড়ে যায়। যথাযথ তাপমাত্রায় অধিক খাদ্য গ্রহণের সাথে সাথে হজম ক্রিয়া ও নিঃসরণে কম সময় লাগে। ফলে অধিক পরিমাণে শক্তি উৎপন্ন হয়, কিন্তু ব্যয় হয় কম পরিমাণ। ফলে মাছের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়। তাপমাত্রা কমে গেলে মাছের খাদ্য গ্রহণের হার কমে যায়। এজন্য শীতকালে পুকুরে সার ও খাদ্যের পরিমাণ কিছুটা কমিয়ে দিতে হয়। রুইজাতীয় মাছ চাষের জন্য ২৫°-৩০° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা উত্তম। নিচে বিভিন্ন তাপমাত্রায় চাষোপযোগী কয়েকটি মাছের খাদ্য চাহিদা ও বৃদ্ধির হার দেওয়া হলো ঃ

মাছের প্রজাতি	তাপমাত্রা (°সে.)	খাদ্য চাহিদা	মাছের বৃদ্ধি	মন্তব্য
কাতলা, রুই, মৃগেল	৩০-৩৫ ২০ <১০	সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম শূন্য	সর্বোচ্চ মোটামুটি বন্ধ	অনুকূল তাপমাত্রা - খাওয়া বন্ধ করে দেয়
সিলভার কার্প	৩০ ২০ ১৫	সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম ন্যূনতম	সর্বোচ্চ কিছু কম খুব কম	অনুকূল তাপমাত্রা - -
বিগহেড কার্প	৩০ ২০-২৫ ১৫	সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম ন্যূনতম	সর্বোচ্চ কম খুবই কম	অনুকূল তাপমাত্রা - -
গ্রাস কার্প	>৩৮ ৩৫ ২০-৩০ <১০	কম সবচেয়ে বেশি অপেক্ষাকৃত কম শূন্য	কম সর্বোচ্চ অপেক্ষাকৃত কম বন্ধ	অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে অনুকূল তাপমাত্রা - খাওয়া বন্ধ করে দেয়া
তেলাপিয়া	>৪০ ৩০-৩৫ ১৫-১৬	শূন্য সবচেয়ে বেশি শূন্য	বন্ধ সর্বোচ্চ বন্ধ	মারা যায় অনুকূল তাপমাত্রা খাওয়া প্রায় বন্ধ করে দেয়।

সারণি ঃ তাপমাত্রার সাথে মাছের বৃদ্ধির সম্পর্ক

সূর্যালোক ঃ সূর্যালোকের ওপর পুকুরের প্রাথমিক উৎপাদনশীলতা তথা উদ্ভিদ প্লাংটনের উৎপাদন নির্ভর করে। পুকুরের পানিতে আলোর প্রবেশ বিভিন্নভাবে বাধাগ্রস্ত হতে পারে। যথা- পুকুর পাড়ে বড় গাছপালা, পানির ঘোলাত্ব, জলজ আগাছা ইত্যাদি। পুকুর পাড়ে বড় গাছ থাকলে ডালপালা কেটে দিয়ে পানিতে সূর্যালোক প্রবেশের ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরের পানি ঘোলা হলে আলো প্রবেশে মারাত্মকভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়, ফলে প্ল্যাংটনের উৎপাদন উপরিভাগের সামান্য স্তরব্যাপী সীমাবদ্ধ থাকে। বিভিন্ন ধরনের ভাসমান আগাছা পানিতে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। এগুলো সরিয়ে ফেলতে হবে। পুকুরের পানিতে আলো প্রবেশ বাধাগ্রস্ত হলে উদ্ভিদ প্ল্যাংটনের উৎপাদন কম হয়। ফলে মাছের উৎপাদনও কমে যায়।

পানির রাসায়নিক গুণাগুণ

দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ অক্সিজেন জীবনের জন্য অপরিহার্য। উদ্ভিদ-প্ল্যাংটন ও জলজ উদ্ভিদ সালোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় যে অক্সিজেন প্রস্তুত করে তা পানিতে দ্রবীভূত হয়। বাতাস থেকে কিছু পরিমাণ অক্সিজেন সরাসরি পানিতে মিশে। পুকুরের মাছ, জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী এ অক্সিজেন দ্বারা শ্বাসকার্য চালায়। রাতে সূর্যালোকের অভাবে পানিতে কোন অক্সিজেন প্রস্তুত হয় না। পুকুরের তলায় জৈব পদার্থ পচনেও অক্সিজেন ব্যবহৃত হয়। এজন্য সকালে পুকুরের পানিতে অক্সিজেনের পরিমাণ খুব কমে যায়, বিকালে থাকে খুব বেশি। পানিতে ২.০ নিযুতাংশের কম অক্সিজেন থাকলে রুই জাতীয় মাছ স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারে না। পুকুরের পানিতে ৫-৮ নিযুতাংশ হারে দ্রবীভূত অক্সিজেন থাকলে মাছের বৃদ্ধির হার বেশি হয়।

অক্সিজেন খাদ্যদ্রব্য হজমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। পানিতে পরিমিত মাত্রায় অক্সিজেন থাকলে খাদ্যের পরিবর্তন হার বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ অপেক্ষাকৃত কম পরিমাণ খাদ্যে অধিক পরিমাণ মাছ উৎপাদন হয়। পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেনের মাত্রা বাড়লে মাছের খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায় এবং অক্সিজেনের মাত্রা কমলে খাদ্য চাহিদা হ্রাস পায়।

পানিতে অক্সিজেন হ্রাসের কারণ

- জৈব পদার্থের পচন
- ক্ষতিকর ব্লুম সৃষ্টি
- মাটিতে লৌহের পরিমাণ বেশি থাকা
- পানিতে গাছের পাতা ও ডালপালা পচা
- কাঁচা গোবর বেশি পরিমাণে ব্যবহার
- আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকা
- পানি খুব ঘোলা হওয়া

অক্সিজেন ঘাটতি মোকাবেলার উপায়

- পানির উপরিভাগে ঢেউ সৃষ্টি করে
- বাঁশ পিটিয়ে বা হাত দিয়ে পানি ছিটিয়ে
- পাম্প দিয়ে নতুন পানি সরবরাহ করে

দ্রবীভূত কার্বন ডাই-অক্সাইড ঃ মাছের বেঁচে থাকার জন্য অক্সিজেন যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি পানিতে মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরির জন্য কার্বন ডাই-অক্সাইড অপরিহার্য। পুকুরের তলায় অত্যধিক জৈব পদার্থ ও কাদা থাকলে অধিক তাপমাত্রায় পুকুরে এ গ্যাসের আধিক্য ঘটে। পানিতে ২ নিযুতাংশ কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকলে মাছের উৎপাদন ভাল হয়।

কার্বন ডাই-অক্সাইড মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনে প্রধান ভূমিকা পালন করে। পানিতে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ হ্রাস পেলে প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদন হ্রাস পায়। এতে মাছের খাদ্য চাহিদা পূরণ হয় না। আবার কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ অত্যাধিক বৃদ্ধি পেলে পানির অম্লত্বের মাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে প্রচুর প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হলেও মাছের খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা ও চাহিদা হ্রাস পায়।

নিয়মিত হরা টেনে কার্বন ডাই-অক্সাইডের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা যায়। পানিতে ১.০ নিযুতাংশ হারে চুন প্রয়োগ করলে প্রায় ১.৫ নিযুতাংশ হারে কার্বন ডাই-অক্সাইড কমে যায়।

পি.এইচ

পানি অম্লধর্মী বা ক্ষারধর্মী পি. এইচ দ্বারা তা পরিমাপ করা যায়। পি.এইচ ৭.০ এর কম হলে সে পানি অম্লীয় এবং ৭.০ এর বেশি হলে পানি ক্ষারীয় হয়। পি.এইচ ৭.০

হলে সে পানি নিরপেক্ষ। অপেক্ষাকৃত ক্ষারধর্মী পানি (পি. এইচ ৭.০-৮.৫) মাছ চাষের জন্য ভাল। পি.এইচ মাত্রা ৯.৫-এর বেশি হলে পানিতে মুক্ত কার্বন ডাই-অক্সাইড থাকতে পারে না। ফলে পানিতে উদ্ভিদ প্লাংটনের উৎপাদন প্রায় বন্ধ হয়ে যায়। এ অবস্থায় মাছের উৎপাদন দারুণভাবে ব্যাহত হয়। পানির পি.এইচ যদি ১১.০তে উন্নীত হয় বা ৪.০-এর নিচে নামে, তাহলে মাছ মারা যেতে পারে। পক্ষান্তরে অম্ল পানিও মাছ চাষের জন্য ভাল নয়। কারণ, এতে মাছের ক্ষুধা হ্রাস পায়, বৃদ্ধি কমে যায়। পি.এইচ ৭.০-৭.৫ এর মধ্যে থাকলে ফসফরাস সারের কার্যকারিতা বৃদ্ধি পায়। অম্ল পানিতে উদ্ভিদ প্ল্যাংটনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টির অভাব দেখা দেয়। ফলে মাছের উৎপাদন কমে যায়। পানি অম্ল হলে পুকুরে চুন দিতে হয়। পানির পি. এইচ মাছের খাদ্য চাহিদার উপর গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে। অম্লত্ব বাড়লে খাদ্য চাহিদা কমে যায়। কোন জলাশয়ে পি. এইচ ৯.০-এর বেশি হলে এবং তা দীর্ঘদিন স্থায়ী হলে মাছের খাদ্য চাহিদা কমে যায় ও বৃদ্ধি শূন্যের কোঠায় এসে দাঁড়ায়। পি. এইচ মাত্রা ৭.০-৮.৫-এর মধ্যে মাছের খাদ্য চাহিদা বেশি থাকে ও উৎপাদন বেশি হয়।

পানির পি.এইচ অনুমান

- পানি মুখে দিয়ে টক বা লবণাক্ত স্বাদ লাগলে বুঝা যাবে পিএইচ ৭.০-এর কম। অম্ল পানিতে লিটমাস কাগজ ভিজালে লাল হবে। পুকুরের শতাংশ প্রতি ১ কেজি হারে চুন প্রয়োগ করে পি.এইচ বাড়ানো যায়।
- পানি মুখে দিয়ে কষযুক্ত মনে হলে পি.এইচ ৭.০-এর বেশি হবে। ক্ষারীয় পানিতে লিটমাস কাগজ ভিজালে নীল হবে। বর্ষাকালে পানির পি.এইচ যথাযথ মাত্রায় থাকে।

মোট ক্ষারত্ব

পানির মোট ক্ষারত্ব ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়ামের কার্বনেট বা বাই-কার্বোনেট হিসেবে পরিমাপ করা হয়। পুকুরের উৎপাদন ক্ষমতা মোট ক্ষারত্বের ওপর বহুলাংশে নির্ভর করে। পুকুরের পানির মোট ক্ষারত্ব ন্যূনতম ৪০.০০ নিযুতাংশ থাকা বাঞ্ছনীয়। ক্ষারত্ব কম হলে পানিতে দ্রবীভূত পুষ্টির অভাব দেখা দেয় এবং বৃদ্ধি পেলে পুষ্টি উপাদান বৃদ্ধি পায় ও মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। মাছ চাষের জন্য পানির মোট ক্ষারত্বের কঙ্ক্ষিত মাত্রা ৭০-২০০ নিযুতাংশ।

ফসফরাস

প্রাকৃতিক পানিতে অতি অল্প পরিমাণ ফসফরাস থাকে। এই ফসফরাস ফসফেটে রূপান্তরিত হয়। পরিমিত ফসফেটের উপস্থিতিতে প্রচুর পরিমাণ উদ্ভিদ-প্লাঙ্কটন জন্মায়। জলজ উৎপাদনে ফসফরাস এককভাবে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। জৈব পদার্থের আধিক্যই ফসফরাসের সরবরাহ বাড়ায়। পুকুরের পানিতে ০.২ নিযুতাংশ ফসফরাস থাকা প্রয়োজন।

নাইট্রোজেন

নাইট্রোজেন জলজ উদ্ভিদের মৌল পুষ্টি উপাদান। আমিষ সংশ্লেষণের উপকরণ হিসেবে নাইট্রোজেন জলজ উৎপাদনের ক্ষেত্রে এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে। প্রকৃতি প্রদত্ত নাইট্রোজেন কোন জলাশয়ের নাইট্রোজেনের চাহিদা মেটাতে সক্ষম নয়। পানিতে ০.২ নিযুতাংশ নাইট্রোজেন মাত্রা মাছ চাষের জন্য খুবই উপযোগী।

- জিপসাম প্রয়োগ করে মোট পানির ক্ষারত্ব বাড়ানো যায়। এমপি সার প্রয়োগ করে পানিতে ফস-ফরাসের পরিমাণ কিছুটা বাড়ানো যায়।
- ইউরিয়া সার প্রয়োগ করে পানিতে নাইট্রোজেনের অভাব দূর করা যায়।

পানির জৈবিক গুণাগুণ

পুকুরের স্বাভাবিকভাবে জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জন্মায়। কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী অতি ক্ষুদ্র। এগুলো দেখতে অণুবীক্ষণ যন্ত্র দরকার হয়। ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। আবার কিছু কিছু জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরের পানি থেকে পুষ্টি গ্রহণ করে স্বাভাবিক উৎপাদনশীলতা কমিয়ে দেয়। ফলে মাছ চাষে বিঘ্ন ঘটে। নিম্নবর্ণিত জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী পুকুরে জন্মে থাকে-

ভাসমান উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদের পাতা পানির উপরে ভাসতে থাকে, কিন্তু মূল পানির মধ্যে ঝুলে থাকে। যেমন- কচুরিপানা, টোপা পানা, ক্ষুদে পানা ইত্যাদি। এগুলো পুকুরে সূর্যালোক প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে এবং পুকুরে ব্যবহৃত সার হতে পুষ্টি গ্রহণ করে পুকুরের উৎপাদন

ক্ষমতা কমিয়ে দেয়। পুকুরে এ ধরনের উদ্ভিদ থাকলে সেগুলো উঠিয়ে ফেলতে হবে।

ডুবন্ত উদ্ভিদ

এ ধরনের জলজ উদ্ভিদ পানির তলদেশে থাকে। এরা পুকুরের গভীরে সূর্যের আলো প্রবেশে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। মাছের স্বাভাবিক চলাচলে বিঘ্ন ঘটে। যেমন- পাতা ঝাঁঝি, কাটাঝাঁঝি, নাজাস ইত্যাদি।

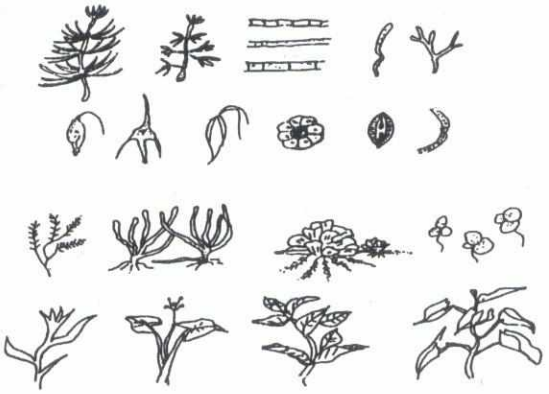

নির্গমনশীল উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের মূল পুকুরের কিনারায় থাকে এবং উদ্ভিদগুলো পানির উপরে বাড়তে থাকে, এগুলো নির্গমনশীল উদ্ভিদ। যেমন-আড়ালি, দল, কলমিলতা ইত্যাদি।

লতানো উদ্ভিদ

কিছু জলজ উদ্ভিদের মূল পুকুরের পানিতে ভাসমান থাকে এবং উদ্ভিদের শাখা প্রশাখাগুলো পানির উপরে ছড়াতে থাকে, এগুলো লতানো উদ্ভিদ। যথা- হেলেঞ্চা, মালঞ্চ, কেশরদাম ইত্যাদি।

প্ল্যাংটন

পানিতে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জীবকণা থাকে তাকেই প্ল্যাংটন বলা হয়। প্ল্যাংটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। প্ল্যাংটন বেশী থাকা পুকুরের অধিক উৎপাদনশীলতা নির্দেশ করে।

প্ল্যাংটন দু'ধরনের ক) উদ্ভিদ-প্ল্যাংটন খ) প্রাণী প্ল্যাংটন।

উদ্ভিদ প্ল্যাংটন বা ফাইটো প্ল্যাংটন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ উদ্ভিদই উদ্ভিদ প্ল্যাংটন বা ফাইটো প্ল্যাংটন। এগুলোর বর্ণ সবুজ। ফাইটো-প্ল্যাংটন মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য। যেমন-ডায়াটম, ভলভক্স, স্পাইরোগাইরা ইত্যাদি। এগুলোকে সবুজ শেওলাও বলা হয়। পুকুরে ফাইটো প্ল্যাংটন অত্যাধিক জন্মালে পানির উপর ঘন সবুজ স্তর পড়ে। একে ব্লুম বলে। এরূপ অবস্থা মাছের জন্য ক্ষতিকর। ঘন সবুজ স্তরও পুকুরের পানিতে সূর্যের আলো প্রবেশে বাধার সৃষ্টি করে। পরিমিত ফাইটো-প্ল্যাংটনের প্রাচুর্যতা সফলভাবে মাছ চাষের জন্য অত্যাবশ্যক।

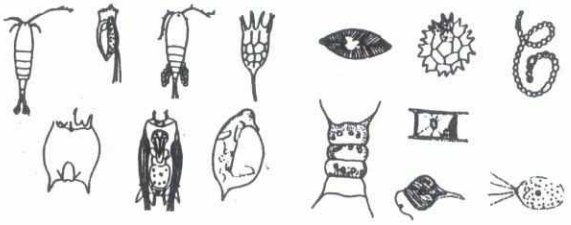

প্রাণী প্ল্যাংটন

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জলজ প্রাণীকে প্রাণী প্ল্যাংটন বলা হয়। জু প্লাংটন সাধারণত বাদামী বর্ণের হয়ে থাকে। যেমন-ডেফনিয়া, রটিফেরা, ময়না ইত্যাদি। জু-প্ল্যাংটন মাছের প্রাকৃতিক খাবার

কীট-পতংগ

পুকুরের পানিতে তলদেশে বিভিন্ন ধরনের কীট-পতংগ বাস করে। এগুলো মাছের খাদ্য চক্রের অন্তর্ভুক্ত। যথা-বিভিন্ন লার্ভি, ওয়াটার বিটল।

মাটি ও পানির উল্লিখিত গুণাবলীসমূহ যথাযথ মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ করা গেলে মাছ চাষ ব্যবস্থাপনা সহজ হয়। ফলে অল্প ব্যয়ে কাঙ্ক্ষিত উৎপাদন পাওয়া যায়।

এ্যাকুরিয়ামে দেশীয় বাহারী পুঁটি মাছ

প্রফেসর, মোহাম্মদ শফি
এ্যাকুয়াকালচার ও ফিশারীজ বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

আজকাল শহরের প্রায় বাসা-বাড়িতে এ্যাকুরিয়ামে বাহারী মাছ পালন করতে দেখা যায়। দিন যতই যাচ্ছে এর বিস্তৃতি ঘটছে। এ্যাকুয়ারিয়াম শুধু ঘরের শোভা বর্ধন করে না। এ্যাকুয়ারিয়ামে প্রতিপালিত রঙিন ছোট ছোট মাছগুলি আমাদের আনন্দ দানের সঙ্গে সঙ্গে নানাভাবে উপকারও করে। জাপানে এ্যাকুয়ারিয়ামের মাছগুলির আকস্মিক ছুটাছুটি দেখে যেমন সেখানকার মানুষ আগাম ভূমিকম্প সম্পর্কে জানতে পারে, তেমনি দুঃশ্চিন্তা থেকে মুক্তি পেতে যদি একটি লোক এ্যাকুয়ারিয়ামের সামনে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে নিবিষ্টমনে মাছগুলির কর্মকান্ড লক্ষ্য করে তবে লোকটির উচ্চরক্তচাপ অনেকাংশে স্বাভাবিক হয়ে আসে। বাংলাদেশে, বিশেষ করে প্রধান শহরগুলিতে গত দশকে এ্যাকুয়ারিয়ামে বাহারী মাছের লালন-পালনের অনেক প্রসার ঘটেছে। বর্তমানে দেশে এ্যাকুয়ারিয়াম তৈরীতে বৈচিত্র্যের সঙ্গে সঙ্গে মাছের লালন পালনে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট উপকরণ, যেমন নানারকম এ্যারেটর ফিল্টার, পাম্প, প্লাষ্টিকের ডেকোরেশন, মাছের জীবিত ও শুকনো খাবার সহজলভ্য হয়েছে। কাঁটাবনসহ ঢাকার বিভিন্ন জায়গায় জমজমাট এ্যাকুয়ারিয়াম ব্যবসা গড়ে উঠেছে।

এ্যাকুয়ারিয়াম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার বিভিন্ন দ্রব্যাদি ও এদের সঠিক ব্যবহার সম্পর্কে দেশে মানুষের জ্ঞান উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এমনকি বাংলা ভাষায় এ্যাকুয়ারিয়ামে বাহারী মাছ লালন-পালনের বিভিন্ন দিকের নির্দেশসহ ছোট ছোট পুস্তিকাও বেরিয়েছে। কিন্তু বর্তমানে এ্যাকুয়ারিয়ামে ব্যবহৃত বাহারী মাছের প্রায় সবটাই বিদেশ থেকে আমদানীকৃত। সাধারণতঃ সিংগাপুর, থাইল্যান্ড, ভারত থেকে এসব মাছ আসছে। বাংলাদেশের লক্ষ লক্ষ পুকুর, খাল, বিল, হাওর, বাঁওড়, পাহাড়ী ঝরণায় যে সব ছোট মাছ পাওয়া যায়, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি প্রজাতি আকার ও রংছটায় এ্যাকুয়ারিয়ামে লালন-পালনের উপযুক্ত। এগুলির মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পুঁটি ও খলিশা ছাড়াও বেতি, বৌমাছ ও বেতাঙ্গী, চান্দা, বালিচাটা গুতুম , পটকা মাছ, বনি কোক্‌সা ডোরা ডানকিনা, বাঁশপাতা ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। অবশ্য বদ্ধ বা উন্মুক্ত প্রাকৃতিক জলাশয়ের এই মাছগুলির এ্যাকুয়ারিয়ামে লালন-পালন উপযুক্ততা সম্পর্কে দেশে এ পর্যন্ত কোন গবেষণা হয়নি কিংবা প্রযুক্তিলব্ধ তত্ত্ব নেই। তবে পুকুর বা অন্য জলাশয় থেকে ট্র্যাপিঙ্ দ্বারা এই মাছগুলি সংগ্রহ করে ২/৩ সপ্তাহ কোন ছোট কংক্রিটের ট্যাঙ্কে বা মাটির চাড়িতে রেখে অভ্যস্থ করে এ্যাকুয়ারিয়াম উপযোগী করা সম্ভব। বাজারে বর্তমানে নানারকম জীবিত ও শুষ্ক খাবার পাওয় যায়। সুতরাং কোন রকম খাদ্য সমস্যা হওয়ার কথা নয়। বর্ষা মওশুমে এ্যাকুয়ারিয়ামের পানিতের এ্যারেটরের সাহায্যে বা অন্য কোন প্রকারে পানিতে মৃদু আলোড়ন এবং উপর থেকে পানি ঝর্ণার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রজননের সময়ে যে সব মাছ উদ্ভিদ পছন্দ করে সে সব এ্যাকুয়ারিয়ামে জলজ উদ্ভিদ যেমন ঘাস লেটুস, টোপাপানা ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। ডিম ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেগুলিকে অন্য মাছ থেকে পৃথক করা উচিত। ডিম থেকে রেণু পোনা বেরুলে ওদের জন্য রটিফার, ব্রাইনস্রিম্প খাদ্য হিসাবে সরবরাহ করা যায়। ঢাকার কাঁটাবনে ইতিমধ্যেই দু'তিনটি উদ্যোগী এ্যাকুয়ারিয়ামের দোকানে দেশী বাহারী মাছ, যেমন ডোরা ডানকিনা, খলিশা, পুঁটি, চেলা, গজার মাছের বাচ্চা, থাই পাঙাসের বাচ্চা পোনা কিনতে পাওয়া যায়।

পুঁটি মাছের ১০টি প্রজাতি, সেগুলির দেশী বাহারী মাছ হিসেবে পরিচিতি লাভের সম্ভাবনা আছে, সেগুলির বিবরণ নিম্নরূপ ঃ

জাতি পুঁটি চিত্র ১ ক

সাধারণতঃ ৭/৮ সেঃমিঃ দীর্ঘ, সর্বোচ্চ ১২.৫ সেঃমিঃ; দেহ রূপালী, পৃষ্ঠ ধূসর রংয়ের; পৃষ্ঠ পাখনার মাঝখানে ও গুচ্ছ পাখনার গোড়ায় গোলাকার কালো ফোঁটা আছে; কানকো ঈষৎ লাল রংয়ের; বর্ষাকালে প্রজননের সময়ে পুরুষ মাছের উভয় পার্শ্বে লাল রংয়ের লম্বা ডোরা দেখা যায়। স্ত্রী মাছের ডোরা পরিষ্কার নয়। এরা চটপটে ও দ্রুতগামী। শ্যাওলা, কীটপতঙ্গ, ক্রাস্‌টেসিয়া, ডায়াটম, রটিফার ইত্যাদি এদের প্রিয় খাদ্য।

চোলা পুঁটি চিত্র ১ খ

সাধারণতঃ ৭-৮ সেঃমিঃ দীর্ঘ, সর্বোচ্চ ১২.৫ সেঃমিঃ দেহ রূপালী, কানকো বেগুনী ও সোনালী রঙে রঞ্জিত; পুচ্ছ পাখনার গোড়ার কাছে একটি গোলাকার কালো ফোটা থাকে। পৃষ্ঠ পাখনায় নীচের দিকে একটি কালো ফোঁটা ও উপরের দিকে একসারি কালো দাগ থাকে। বর্ষাকালে প্রজননের সময় পুরুষ মাছে দু'পার্শ্বে কানকো থেকে পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত লম্বা লাল ডোরা দেখা

যায়। কাঁটা ঝাঝি ও শ্যাওলার মধ্যে এরা থাকতে ভালবাসে। খাদ্যাভ্যাস জাতি পুঁটির মতই।

কোসা পুঁটি চিত্র ১ গ

ছোট আকৃতির পুঁটি, সাধারণতঃ ৪-৫ সেঃমিঃ দীর্ঘ; দেহ লালচে বাদামী, পৃষ্ঠ পাখনা ও পায়ু পাখনায় দুটি করে কালো ডোরা থাকে; বর্ষাকালে প্রজননের সময় বক্ষপাখনা হলুদ ও শ্রোণী পাখনা লালচে রং ধারণ করে। খাদ্যাভ্যাস জাতি পুঁটির মতই।

টেরী পুঁটি চিত্র ১ ঘ

ছোট আকৃতির পুঁটি, সাধারণত; ৫-৬ সেঃমিঃ দীর্ঘ; পায়ু পাখনার উপরের দিকে শরীরের মাঝামাঝি একটি গোলাকার কালো ফোঁটা থাকে, সেখান থেকে পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত লম্বা কালোদাগ দেখা যায়। পৃষ্ঠ পাখনায় একটি কালো ডোরা থাকে। প্রজনন ও খাদ্যাভ্যাস অন্যান্য পুঁটির মতই।

কাঞ্চন পুঁটি চিত্র ১ ঙ

সাধারণতঃ ৬-৭ সেঃমিঃ দীর্ঘ, সর্বোচ্চ ১২.৫ সেঃমিঃ; দেহ লালচে রংয়ের, পায়ু পাখনার পশ্চাদভাগের উপরে একটি গোলাকার কালো ফোটা থাকে। বর্ষাকালে প্রজননের সময় দেহের লালচে রং গভীর হয়, কানকোও লালচে হয়, পৃষ্ঠ পাখনায় কাল ডোরা দেখা যায়, অন্যান্য পাখনায় কালো দাগ দেখা যায়। এরা উদ্ভিদময় তলদেশ পছন্দ করে। প্রজনন অভ্যাস ও খাদ্যাভ্যাস অন্যান্য পুঁটির মতই।

তিত পুঁটি চিত্র ১ চ

সাধারণতঃ ৬-৭ সেঃমিঃ দীর্ঘ, সর্বোচ্চ ১০ সেঃমিঃ; দেহ রূপালী, পার্শ্বরেখা অঙ্গে দুটি গোলাকার কালো ফোঁটা থাকে। জলজ উদ্ভিদ বিশিষ্ট বালিময় তলদেশ এদের খুব পছন্দ; বর্ষাকালে প্রজননের সময় শরীরের উভয় পার্শ্ব লাল রং ধারণ করে; পৃষ্ঠ পাখনায় কালোকালো ফোঁটা দেখা দেয়। সে সময় এদের স্থানান্তর করলে ডিম ছাড়ায় বিঘ্ন ঘটে। খাদ্যাভ্যাস একই।

ফুটুনি পুঁটি চিত্র ১ ছ

ছোট পুঁটি, সাধারণতঃ ৪-৫ সেঃমিঃ দীর্ঘ, সর্বোচ্চ ৭.৫ সেঃমিঃ; দেহ রূপালী/সবুজ, দেহের পার্শ্ব দু'টি খাড়া ডোরা থাকে; এরা চঞ্চল, দ্রুতগামী, বালিময় তলদেশ এদের পছন্দ। বর্ষাকালে প্রজননের সময় পৃষ্ঠ পাখনা ও বক্ষ পাখনা হালকা হলদে রং এবং শ্রোণী পাখনা ও পায়ু পাখনা কমলা রং ধারণ করে; বক্ষ লালচে হয়। খাদ্যাভ্যাস একই।

পুন্টি পুঁটি চিত্র ১ জ

সাধারণত ঃ ৫-৬ সেঃমিঃ দীর্ঘ, সর্বোচ্চ ৭.৫ সেঃমিঃ; রূপালী দেহ, পুচ্ছ পাখনা ও পায়ু পাখনার মাঝামাঝি কালো খাড়া ডোরা থাকে, কমলা রংয়ের পৃষ্ঠ পাখনার শীর্ষ কালো থাকে। এরা উদ্ভিদবিশিষ্ট তলদেশ পছন্দ করে। খাদ্যাভ্যাস একই।

জেলী পুঁটি চিত্র ১ ঝ

ছোট আকৃতির পুঁটি, সাধারণত ঃ ৪-৫ সেঃমিঃ দীর্ঘ; দেহ লালচে বাদামী, পুচ্ছ পাখনা থেকে একটু দূরে লেজে একটি কাল খাড়া ডোরা থাকে; পৃষ্ঠ পাখনার গোড়ায় একটি কালো ফোঁটা, শ্রোণী পাখনা ও পায়ু পাখনার গোড়ায় কালো ছোট ফোটা দেখা যায়। বর্ষাকালে প্রজননের সময় পুচ্ছ পাখনাসহ দেহের পিছনের অংশ ও পৃষ্ঠ পাখনা লাল ও কমলা রং ধারণ করে। খাদ্যাভ্যাস একই।

দেঁতে পুঁটি চিত্র ১ ঞ

সাধারণত ঃ ৭-৮ সেঃমিঃ দীর্ঘ, সর্বোচ্চ ১২.৫ সেঃমিঃ; দেহ রূপালী, পৃষ্ঠ পাখনার মাঝখানে ও পুচ্ছ পাখনার গোড়ায় গোলাকার কালো ফোঁটা থাকে। বর্ষাকালে প্রজননের সময় কানকো থেকে পুচ্ছ পাখনা পর্যন্ত দেহের উভয় পার্শ্বে লম্বা, চওড়া, লালচে ডোরা দেখা যায়। সাইক্লপস্, ডাফ্নিয়া, ক্রাস্টেসিয়ান লার্ভা, জলজ উদ্ভিদ, শ্যাওলা, কীটপতঙ্গ এদের প্রিয় খাদ্য।

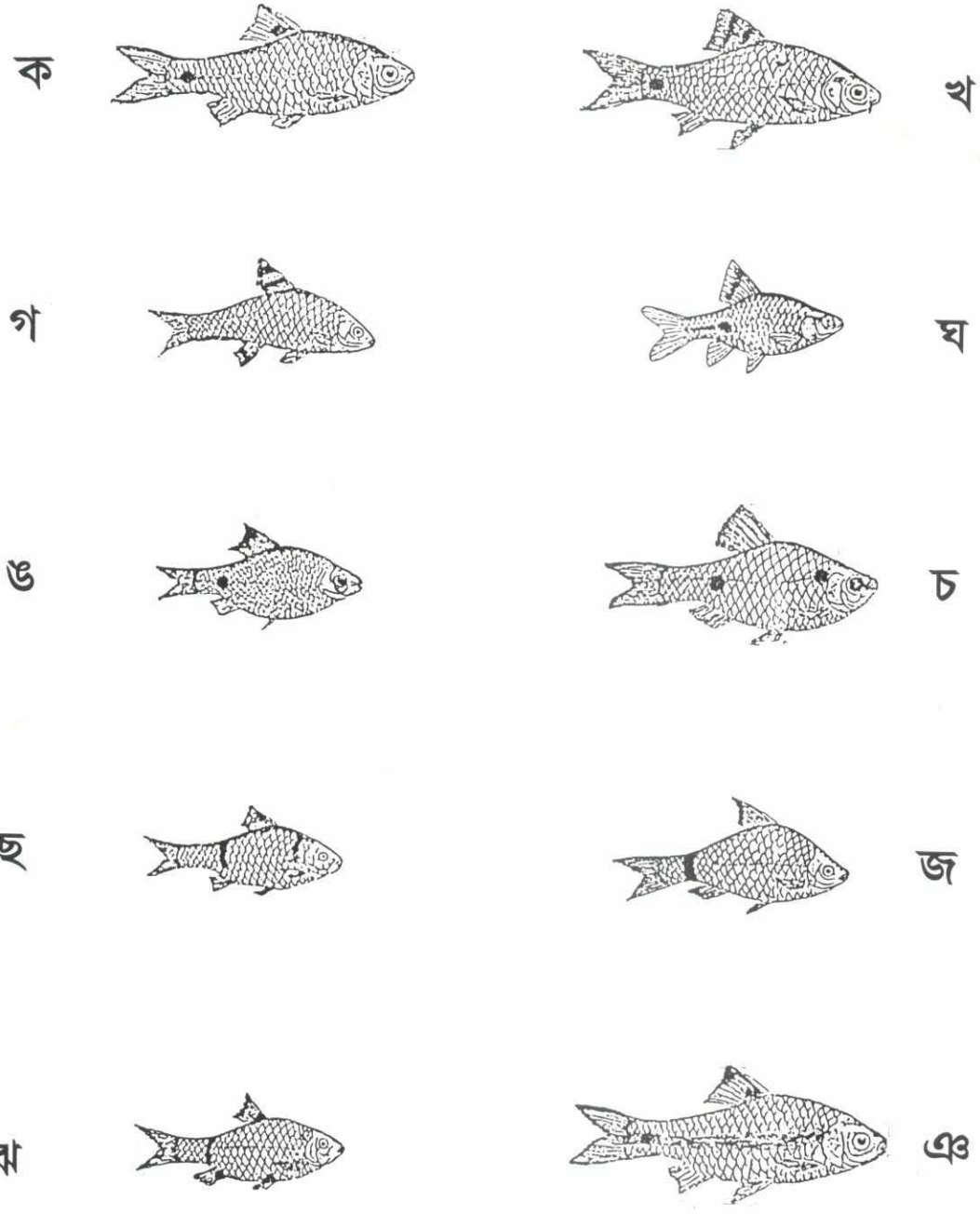

রেখাচিত্র ১ ঃ বিভিন্ন প্রজাতির পুঁটি

মুক্তা চাষ সম্ভাবনা ও করণীয়

ভূইয়া এস, এইচ, এম কাশেম
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

মুক্তা একটি মূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রাচীনকাল থেকে মানুষ পারস্য উপসাগর, জাপান এবং বঙ্গোপসাগরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রাকৃতিক মুক্তা সংগ্রহ করত। চীন দেশে সর্বপ্রথম শিল্পভিত্তিক কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষ শুরু হয়। পরবর্তীতে জাপান, অস্ট্রেলিয়া, ফ্রান্স, ভারত, ফিলিপিন্সসহ বিভিন্ন দেশে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদন ও চাষ শুরু হয়। তবে বাংলাদেশী গোলাপী মুক্তা পৃথিবীখ্যাত। এখনও অষ্ট্রেলিয়াসহ বিভিন্ন দেশের নাগরিকগণ এদেশ থেকে গোলাপী উজ্জল মুক্তা কিনে নিয়ে যায়। এতেই বুঝা যায় এদেশীয় মুক্তার গুরুত্ব কতখানি। তথাপি এখন পর্যন্ত মুক্তা চাষে সরকারী এবং বেসরকারী উদ্যোগ সেভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছে না।

১৯৭৪-৭৯ সালে মৎস্য অধিদপ্তর কর্তৃক "মুক্তা বহনকারী ঝিনুক চাষের পরীক্ষামূলক প্রকল্প" নামে একটি প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছিল এবং পরবর্তীতে 'ময়মনসিংহ মাৎস্য গবেষণা কেন্দ্রে ও মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিটিউট FAO/UNDP-এর সহযোগিতায় পরীক্ষামূলকভাবে কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষের প্রচেষ্টা চালিয়েছিল। সুষ্ঠু পরিচর্যা, ব্যবস্থাপনা, দক্ষ লোকবল ও উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সঠিক লাগসই প্রযুক্তি উদ্ভাবন সম্ভব হয়নি। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানের গবেষকগণ এ ব্যাপারে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ব্যক্তিগত পর্যায়েও এদেশে অনেকেই মুক্তা চাষে এগিয়ে আসছেন।

মুক্তা উৎপাদনকারী ঝিনুকসমূহ

বাংলাদেশে পাঁচ প্রকার ঝিনুকে মুক্ত পাওয়া যায়। তবে গোলাপী মুক্তা পাওয়া যায় Lamellidens এবং Perreysia জাতের ঝিনুকে শতকরা ১-৩ ভাগ এবং Lamellidens Marginalis প্রজাতিতে শতকরা ৭-১০ ভাগ মুক্তা পাওয়া যায়। এছাড়া প্লাকুনা প্লাসিন্টা নামক এদশেীয় সামুদ্রিক ঝিনুকেও মুক্তা পাওয়া যায়।

মুক্তা বহনকারী ঝিনুক চাষ ও মুক্তা উৎপাদনের অর্থনৈতিক গুরুত্ব

(ক) মুক্তা পৃথিবীব্যাপী মেয়েদের অলংকার ও গৃহ সজ্জায় ব্যবহৃত হয়।

(খ) মিঠা পানির ঝিনুক থেকে উৎপাদিত বাংলাদেশী গোলাপী মুক্তা সারা পৃথিবীতেই সমাদৃত।

(গ) ঝিনুকের মাংস পৃথিবীর বহুদেশেই (যুক্তরাজ্য, চীন, জাপান, থাইল্যান্ড ইত্যাদি) অত্যন্ত সুপ্রিয় খাবার হিসেবে বিবেচিত।

(ঘ) বাংলাদেশে ঝিনুকের মাংস হাঁস-মুরগীর প্রধান প্রাণিজ আমিষ জাতীয় খাবার হিসেবে বিবেচিত।

(ঙ) ঝিনুকের খোলস খেলনা ও ঘর সাজানোর কাজ ছাড়াও বোতাম তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(চ) ঝিনুকের খোল পারিবারিক ও ব্যাবসায়িক পর্যায়ে চুন, সিরামিক কারখানা, পেপার মিল ও ব্লিচিং পাউডার তৈরিতে ব্যবহৃত হয়।

(ছ) হাঁস-মুরগীর প্রয়োজনীয় ক্যালসিয়াম জাতীয় খাদ্য হিসেবে ঝিনুকের গুঁড়া ব্যবহার বহুল সমাদৃত এবং এর অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম।

(জ) মুক্তার গুঁড়া পাকিস্তানসহ বিভিন্ন দেশে বসন্ত, দাঁত, হাড়, চোখের রোগ, হৃদরোগ এবং যৌবন ধরে রাখার ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে।

মুক্তা বহনকারী ঝিনুক প্রাপ্তিস্থান

নদী নালা, খাল-বিল ও পুকুরে পরিপূর্ণ বাংলাদেশ মুক্ত বহনকারী ঝিনুকের প্রাচুর্যে ভরপুর। এদেশের ঝিনুকে মুক্তা হওয়ার মতো পানি ও মাটির রাসায়নিক গুণ এবং সুন্দর আবহাওয়া বিদ্যমান। মুক্তা বহনকারী ঝিনুক বাংলাদেশের প্রায় প্রতিটি জেলাতেই পাওয়া যায, তবে উন্নতমানের গোলাপী মুক্তা শুধু বৃহত্তর ঢাকা, সিলেট, ময়মনসিংহ, রাজশাহী, বগুড়া, পাবনা, ফরিদপুর, কুমিল্লা, টাঙ্গাইল ও চট্টগ্রাম জেলায় বেশী পাওয়া যায়।

মুক্তার প্রকারভেদ

মুক্তা বিভিন্ন আকারের, রঙের ও নামের হয়ে থাকে। আকারের দিক দিয়ে লম্বা, ত্রিকোণা, গোলমুক্তা মেথী, গারা, চুমকী, রাইটকী, ফুসকী ডিম্বাকৃতি গোল ও চুর/ ঝুর নামে পরিচিত। অপরিপক্ব মুক্তাকে চুর/ঝুর বা গুঁড়া মুক্তা বলা হয়ে থাকে। মুক্তা সাধারণতঃ সাদা, গোলাপী, উজ্জল গোলাপী, কালো সোনালী, সোনালী হলুদ, ধূসর ও মরা মুক্তা (রংহীন) রঙের হয়ে থাকে।

মুক্তা উৎপাদনের প্রযুক্তিগত দিক

(ক) ঝিনুকের খাদ্যাভ্যাস ঃ ঝিনুক স্বাদু লোনা উভয় প্রকার জলাশয়ের তলদেশে বিচরণ ও নীচের স্তরের পচাগলা জৈবিক পদার্থ (Organic detritus) খেয়ে থাকে বলে পচাগলা ভোজী (Detrilus Feeder) প্রাণী হিসেবে পরিচিত। খাদ্য গ্রহণের প্রতিযোগিতা হেতু ঝিনুকের সাথে পুকুরের তলদেশের খাদ্যভোজী অন্যান্য মাছ যেমন মৃগেল, চিংড়ি, মিরর কার্প, ব্লাক কার্প প্রভৃতির চাষ করা যায়না। অন্যদিকে ঝিনুক বিভিন্ন পরজীবীর মাধ্যমিক পোষক (Intermediate host) হিসেবে কাজ করে সুতরাং এর স্পর্শে পুকুরের নীচের স্তরের মাছ বা চিংড়ি রোগাক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

(খ) ঝিনুক সংগ্রহ, মজুদ, পুকুর প্রস্তুত ও ছাড়ার সময় ঃ প্রাকৃতিকভাবে ঝিনুকে মুক্তার চাষ করতে হলে ভালো প্রজাতির লেমিলিডেন্স অরজিনালিস প্রজাতির লম্বাটে ফোলা বা একটু মোটা ধরনের (Obesa গ্রুপের) ঝিনুক সবচেয়ে ভালো। জুন-জুলাই মাসে ঝিনুক নদী-নালা, খাল বিলে ডিম ছাড়ে। ডিমগুলো আঁঠালো বিধায় জলাশয়ে নিমজ্জিত বাঁশ, বাঁশের কঞ্চি বা আগাছার সাথে আটকে থাকে। দুই মাসের মধ্যে খোলসসহ ২-৩ সেন্টিমিটার ছোট ঝিনুকে পরিণত হয়, তখন ঝিনুক সংগ্রহ করে পুকুর বিলে মজুদ করা প্রয়োজন। নাইলনের জালের বা বাঁশের গড়া দিয়ে তৈরি বেষ্টনীর মধ্যে ছাড়লে মুক্তা চাষের জন্য অপারেশনের সময় সংগ্রহ করা সহজ হবে। পুকুরে/ বিলে তখন রাসায়নিক সার, জৈব সার ও চুন প্রয়োগ করতে হবে। এক বিঘা পুকুরে মাছের সাথে সর্বোচ্চ ২০০০ ঝিনুক ছাড়া যেতে পারে এবং ৩ বৎসর পর বা ঝিনুকের আকার সাধারণতঃ ১০ সেঃ মিঃ এর উর্ধ্বে হলে জলাশয় থেকে উঠিয়ে মুক্তা সংগ্রহ করতে হবে।

মাছ ও ঝিনুক চাষের জন্য পুকুরের গভীরতা ২ মিটার হলে ভালো। মাটি দো-আঁশ বা এঁটেল দো-আঁশ। পুকুর শুকিয়ে বিঘা প্রতি ৬০ কেজি চুন এবং পরবর্তীতে ৫০০-৬০০ কেজি পচা গোবর প্রয়োগ করে পুকুরের তলদেশের মাটির সাথে মিশিয়ে দিতে হবে। বর্ষার পানিতে পুকুর ভরে গেলে ঝিনুক ও মাছ ছাড়তে হবে এবং মাছ চাষের নিয়মানুযায়ী রাসায়নিক সার বিঘা প্রতি ১৫ কেজি ইউরিয়া ও ১৫ কেজি টিএসপি প্রয়োগ করা যেতে পারে। পরবর্তীতে প্রতি মাসে ৫ কেজি প্রয়োগ করতে হবে।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা চাষের জন্য ঝিনুক নির্বাচন

(ক) ঝিনুকটি সুস্থ সবল ও রোগমুক্ত হতে হবে এবং কমপক্ষে ৫ সেঃ মিঃ লম্বা হতে হবে।

(খ) সাধারণতঃ এক থেকে দেড় বছর বয়সের ঝিনুক নির্বাচন করতে হবে।

(গ) Lamellidens জাতের ঝিনুক বাছাই করতে হবে।

প্রাকৃতিক মুক্তা উৎপাদনের কারিগরি দিক ও কলা কৌশল ঃ- সাধারণত মুক্তা ঝিনুকের শরীরের ছয়টি অংশে পাওয়া যায়। মুক্তার রাসায়নিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে এতে শতকরা ৯২ ভাগ ক্যালসিয়াম, ৬ ভাগ অজৈব খনিজ পদার্থ ও ২ ভাগ পানি। মুক্তার আকার ও রং ইত্যাদি নির্ভর করে ঝিনুকের ভিতরে, ক্যালসিয়াম জাতীয় কি ধরনের কণিকা প্রবেশ করেছে তার উপর।

প্রাকৃতিকভাবে খাদ্য আহরণ কালে বা চলন্ত অবস্থায় ঝিনুকের খোল থেকে কোন কনা বা বাইরে থেকে যদি কোন দ্রব্য যেমন, বালির কণা, ময়লা বা কোন পোকাও যদি ঝিনুকের গায়ে পড়ে তাহলে ঝিনুকের শরীর থেকে এক ধরনের লালা (spittle) নিঃস্বরণ হয়ে তা ঐ পদার্থের চারপাশ ঢেকে দেয় এবং প্রতিনিয়ত তার উপর লালা দ্বারা আবরণের পর আবরণ জমা হতে হতে এক সময় মুক্তায় পরিণত হয়। মাটি, পানি ইত্যাদির রাসায়নিক গুণের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন রঙের মুক্তা তৈরি হয়ে থাকে।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদনের কৌশল

ঝিনুকের বাইরের শক্ত আবরণ বা খোলটি ক্যালসিয়াম কার্বনেট দ্বারা তৈরি। শক্ত আবরণের নীচেই ম্যানটেল নামক পাতলা একটি পর্দা আছে এবং পর্দার উপরের অংশটি (Epithelial layer) ভীষণ সংবেদনশীল। পর্দার এই অংশ (অর্থাৎ পায়ের উর্ধ্বাংশ যেখানে ডিম্বাশয় শুরু)

ছিদ্র করে কেটে ক্ষুদ্র কণা/পুতি/ ছোট মরা মুক্তা ঢুকানো হয়। ফলে উপরের অংশের বিভিন্ন কোষে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। এই অবস্থায় কোষসমূহ বহিরাগত কণিকা (Foreign particle) সংস্পর্শ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লালা নিঃসৃত করে এবং বস্তুটিকে ঢেকে দেয় ফলে ঝিনুকের দেহের উত্তেজনা বৃদ্ধি পায় এবং বেশী পরিমাণে লালা বেরিয়ে কণিকাটিকে শক্ত আকারে রূপান্তরিত করে ও মুক্তায় পরিণত করে। Foreign particle ঢুকানোর পর ঝিনুকের মৃত্যুহার শতকরা ২০-২৫ ভাগ এবং কমপক্ষে ১০ ভাগ ঝিনুক শরীর থেকে বহিরাগত কণিকাটিকে বের করে দেয়। জাপান, অষ্ট্রেলিয়া, চীন, ভারত, ফিলিপাইন, বার্মা বর্তমানে ৭০-৮০ ভাগ ঝিনুক এ পদ্ধতিতে মুক্তা উৎপাদন ও আহরণ করে থাকে।

ঝিনুক অপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

(ক) ঝিনুকের বহিরাবরণ/ খোসা খোলার যন্ত্র (Shell opener) স্টীলের তৈরী হলে সর্বোত্তম, অন্যথায় কাঠের দ্বারা তৈরী হলেও চলবে। এটি ঝিনুকের খোলসের মুখ প্রসারিত করার জন্য ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটির প্রশস্থ দিক পাতলা হওয়া প্রয়োজন যাতে অতি সহজেই ঝিনুকের খোলের মুখে প্রবেশ করানো যায়।

(খ) সংযোজন কলা কাটা ছুড়ি (Graft cutter) ম্যানটাল টিস্যু গ্রাফটিং বা নির্দিষ্ট আকারে কাটার জন্য ব্যবহৃত হয়।

(গ) ক্ষত করার যন্ত্র (Incision knife): এ যন্ত্রটির মাথা সরু, চিকন ও ধারালো। এর সাহায্যে মুক্তা উৎপাদনের জন্য আনিত বহিরাগত কণিকা (Nucteus) Foreig particle প্রবেশের জন্য ক্ষত করা হয়।

(ঘ) নিউক্লিয়াস প্রবেশ করানোর যন্ত্র (Nucleus Carrier) ক্ষত স্থানে ভিতর দিয়ে Nucleus অতি সহজেই প্রতি স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(ঙ) সংযোজক কলা প্রতিস্থাপন যন্ত্র (Graft Carrier) সংযোজক কলা (mantle tissue) স্থাপনের কাজে ব্যবহৃত হয়।

(চ) বড়শীসহ স্যাটিউলা Spatula with hook এ যন্ত্রটির সাহায্যে ঝিনুকের অভ্যন্তরীণ অংগ প্রত্যঙ্গ বিন্যাস করা হয়।

(ছ) চিমটা (Pincher) বিভিন্ন যন্ত্রপাতি ও উপকরণ ধরার কাজে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

(জ) ঝিনুক ধারক (Mussel holder) এটি একটি আয়তাকার কাঠের টুকরা (লম্বা ১৫ সেঃ মিঃ প্রস্থ ১০ সেঃ মিঃ এবং সামনের দিকের উচ্চতা ১০ সেঃ মিঃ)। এর উপরিভাগ পিছনের দিক অপেক্ষা কিছুটা ঢালু এবং উপরিভাগে ঝিনুক অপারেশনের সময় ঝিনুককে ধরে রাখার জন্য একটি ক্লিপ লাগানো থাকে এবং সাইজ জানার জন্য স্কেল লাগানো থাকবে।

(ঝ) বহিরাগত কণিকা (Foreign panticle/nucleus) ছোট গোলাকৃতি বস্তু যেমন কাঁচ, মরামুক্তা, পাথর, ঝিনুকের খোল ইত্যাদি।

কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা উৎপাদনের জন্য অপারেশন কার্যক্রমকে আরামদায়ক ও সুন্দরভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজনীয় চেয়ার, টেবিল, ট্রে, গামলা, বালতি, শুকনা কাপড়, স্পঞ্জ এন্টিবায়োটিক ওষুধ ইত্যাদি উপকরণের প্রয়োজন।

ঝিনুক অপারেশনের জন্য স্থান নির্বাচন

ঘরের ভিতরে বা বাইরে পুকুর পাড়ে ছায়াযুক্ত স্থান অপারেশনের জন্য উত্তম। অপারেশনের ০৫-১০ দিন আগে সিমেন্টের তৈরী ট্যাঙ্কে (উ-১ মিঃ ×প্রঃ ১.৫ মি, দৈ. ৩-৪ মিঃ) ঝিনুক সংগ্রহ করে রাখা ভালো। যাতে সঠিক ব্যবস্থাপনায় অপারেশনকৃত ঝিনুক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত প্রতিপালন করা যেতে পারে।

অপারেশন পদ্ধতি

কৃত্রিমভাবে সাধারণতঃ ঝিনুকের দুই স্থানে যথা Gonad ও দেহস্থিত মোটা আবরণীর (Mantle) মধ্যে Nucleus প্রতিস্থাপন করা হয়ে থাকে। Gonad এলাকা থেকে চক্রাকারের ও Mantle থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বীজ, মুক্তা (Seed pearl) উৎপাদিত হয়ে থাকে।

(ক) চক্রাকার পদ্ধতি

অপারেশনের প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি উপকরণসমূহ গরম পানিতে ধুয়ে বা ফুটিয়ে জীবাণুমুক্ত করতে হবে। জীবিত সুস্থ ঝিনুক কেটে ছোট ছোট টুকরার ম্যান্টাল টিস্যু

সংগ্রহ করতে হবে এবং ভালোভাবে ধুয়ে নিতে হবে ও স্পঞ্জের সাহায্যে পিচ্ছিল পদার্থ শুকিয়ে ফেলতে হবে।

ম্যান্টলের পুরু অংশ বা বহিঃকিনারা হতে লম্বালম্বিভাবে ১.৫ হতে ৩ মিঃ মিঃ বাদ দিয়ে ২ মিঃ মিঃ প্রশস্ত করে লম্বা ফিতার আকারে কেটে নিতে হবে, অতঃপর ২ মিঃ মিঃ বর্গাকারে কেটে নিতে হবে। অবশ্য নিউক্লিয়াসের আকারের উপর নির্ভর করে টিস্যু সাইজ করাই উত্তম।

এরপর ট্রেতে রাখা অপারেশনের জন্য সংগৃহিত ঝিনুকগুলো থেকে একটিকে খোলস খোলার যন্ত্র দিয়ে/ কাঠের টুকরা দিয়ে ৫ সেঃ মিঃ প্রশস্ত ফাঁক করে কাঠের নির্মিত কীলক দিয়ে পৃথক রাখতে হবে ও ঝিনুকটি অপারেশনের সুবিধার্থে কাঠের ধারকের সাথে আটকাতে হবে। স্প্যাটউলার সাহায্যে দক্ষিণ ফুলকা উপরের দিকে উত্তোলন করে নিতে হবে যাতে দেহমধ্যস্থিত সকল অংশ দৃষ্টিগোচর হয়। এপর ছিদ্র করার যন্ত্রের সাহায্যে পায়ের উর্ধ্বাংশে অর্থাৎ ডিম্বাশয় শুরুর জায়গায় লম্বালম্বিভাবে এক তিনটি ছিদ্র করতে হবে ও ছিদ্রপথে সংযোগ কলা বাহকের সাহায্যে পূর্বে প্রস্তুতকৃত সংযোজক কলার টুকরা (Mantle tissue) প্রতিস্থাপন করতে হবে এবং নিউক্লিয়াস বাহক দ্বারা নিউক্লিয়াস প্রবেশ করাতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে Mantle যেন ছিদ্র হয়ে বা কেটে না যায়। খোলের মুখ থেকে এরপর কালক সরিয়ে দিয়ে চিহ্নিত করে এবং খাতায় রেকর্ড করে বাঁশের বা নাইলন খাঁচায় ভরে পুকুর/ বিলে ছেড়ে দিতে হবে।

অপারেশনের পূর্বে অবশ্যই দেখতে হবে (১) ঝিনুকটি দুর্বল কিনা, দুর্বল ঝিনুক অপারেশনে মৃত্যু হার বেশী থাকে। (২) ঝিনুকের খোল ক্ষত-বিক্ষত এবং চুন বেরুতে থাকলে ঝিনকুটি নির্বাচন করা বিধেয় নয়। (৩) Gonad ডিম/ শুক্র পূর্ণ থাকলে অপারেশন করা যাবেনা, কারণ প্রচন্ড চাপে ঝিনুক Nuclens বের করে দেয়ার চেষ্টা করে ও ডিম ছাড়ার সময় Nuclens টিও বেড়িয়ে যায়। এছাড়া ঝিনুক পায়ের সাহায্যে চলাফেরা করার সময় সংকোচন প্রসারণের জন্যও Nucleus বেরিয়ে যেতে পারে।

(খ) Seed Pearl বা ধানী মুক্তা উৎপাদন পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে mantle এর ভিতরে বাহির থেকে কেবলমাত্র সংযোজক কলা প্রবেশ করিয়ে মুক্তা উৎপাদন করা হয়ে থাকে। চীন, জাপান ও ভারতের মাদ্রাজে এ পদ্ধতিতে মুক্তা উৎপাদন বহুল প্রচলিত। এই প্রক্রিয়ায় Nucleus ব্যবহৃত হয়না বলে সংযোজক কলা অতি সহজেই Mantle এর সাথে সংযুক্ত হয়ে যায়। সংযোজক কলার আকার বড় হলে বীজ মুক্তা ও বেশ বড় হয়ে থাকে।

ঝিনুক অপারেশন পরবর্তী কাজসমূহ

(ক) অপারেশনকৃত ঝিনুকটির গায়ে ধাতব পদার্থ দিয়ে চিহ্ন এবং নম্বর একে দিতে হবে।

(খ) অপারেশন কৃত ঝিনুকগুলোকে বাঁশের তৈরী চৌকানা বাক্সে ১২-১৮ সেঃ মিঃ পুরু মাটিসহ পুকুরে রাখতে হবে। নাইলনের নেটে একই পদ্ধতিতে রাখলেও চলবে। এতে বাছাই ও মৃত্যুর হার নির্ণয় সহজ হবে।

(গ) দুই একদিন পর পর পরীক্ষা করে দেখতে হবে অপারেশনকৃত ঝিনুকগুলো মারা গেল কিনা। মৃত মুখ খোলা ঝিনুকগুলোকে খাঁচা থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

(ঘ) দুই মাস পর জীবিত সুস্থ ঝিনুকগুলোকে বাক্স/ খাঁচা থেকে বের করে পুকুরে ছেড়ে দিতে হবে এবং মুক্তা আহরণের জন্য অন্ততঃ ৩০ মাস অপেক্ষা করতে হবে।

(ঙ) ঝিনুক পুকুরে ছাড়ার পর মাছরাঙ্গা, কাঁকড়া, হাঁস, শিয়াল ও জলজ উদ্ভিদ থেকে রক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে।

অপারেশনকৃত ঝিনুক মৃত্যুর কারণসমূহ

(ক) দেহাভ্যন্তরের কোন অংশ যেমন- খাদ্যনালী, পাকস্থলী, কিডনী, লিভার ইত্যাদি কেটে যাওয়া।

(খ) খোলস ফাঁক করার সময় Abducter Muscle (অন্তমুখী মাংসপেশী) ছিড়ে যাওয়া।

(গ) বড় মুক্তা পাওয়ার লোভে বড় Nucleus প্রবিষ্ট করা।

(ঘ) অপারেশনকৃত স্থানে ব্যাকটেরিয়ার আক্রমণজনিত কারণ।

(ঙ) দীর্ঘক্ষণ ধরে অপারেশন করা এবং অপারেশন পরবর্তীতে তাড়াতাড়ি জলের মধ্যে না রাখা।

মুক্তা ও ঝিনুক আহরণ

ঝিনুকের অভ্যন্তরে মুক্তার বৃদ্ধি দুই থেকে আড়াই বৎসর দ্রুত বৃদ্ধি পায় এরপর বৃদ্ধির হার কমে আসে। ৩০ থেকে ৩৬ মাস পর যখন ঝিনুকগুলো ১০ সেঃ মিঃ বা তদুর্ধ্ব হবে তখন সেগুলো জল থেকে উঠাতে হবে। সংগৃহিত ঝিনুকগুলো কেটে খোলসমুক্ত করে মাংস আলাদা করার পূর্বে হাতের আঙ্গুল দিয়ে টিপে দেখতে হবে। কোন শক্ত পদার্থ অনুভব করলে তা মাংস থেকে বিচ্ছিন্ন করে পরিষ্কার পানির পাত্রে রাখতে হবে, এভাবে মুক্তা সংগ্রহ করা যায়।

আবার শতকরা ৫ ভাগ পটাশিয়াম হাইড্রোক্সাইড এর পানির দ্রবণে ১০ মিনিট আহরিত ঝিনুকগুলো রেখেও মুক্তা আলাদা করা যেতে পারে। এ পদ্ধতিতে মুক্তা থাকলে পাত্রের নীচে জমা হবে।

স্তূপিকৃত ঝিনুকের খোল চুন প্রস্তুতকারীদের নিকট বিক্রি করা যায়।

মুক্তার মূল্য

মুক্তার মূল্য আকার, রঙ ও সাইজের উপর নির্ভর করে। সাদা মুক্তার চেয়ে ঝিকমিক করা গোলাপী প্রভাবিশিষ্ট বড় মুক্তা ৬০ থেকে ৭০ হাজার টাকা পর্যন্ত বিক্রি হয়ে থাকে। ছোট মুক্তার এবং অনুজ্জল মুক্তার মূল্য কম, এমনকি টাকা হিসেবেও প্রতিটি কিনতে পাওয়া যায়।

পাঁচ সেঃমিঃ গভীর এবং ৭.৫ সেঃমিঃ লম্বা মুক্তাটি এশিয়ার মুক্তা নামে খ্যাত। ১৬২৮ সালে বাহরাইনের নিকটে, পারস্য উপসাগরে এক ডুবুরী মুক্তাটি পেয়েছিল যেটি এখন যুক্তরাজ্যের ভান্ডারে রক্ষিত আছে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে যার মূল্য ছিল ৩০,০০০ পাউন্ড ষ্টার্লিং। এ ধরনের বড় মুক্তা আজও এক অপার রহস্যময়তায় ঘিরে আছে যা আমাদেরকে বিষয়টি নিয়ে গবেষণা কাজ করতে প্রলুব্ধ করে।

নক্ষত্র দেখে ভবিষ্যৎদান বিদ্যায় (Astrology) মুক্তার ব্যবহার অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে দেখে থাকেন Astronomist গণ। যেমন ধন সম্পদ প্রাপ্তির জন্য সোনালী মুক্তা, আদর্শের জন্য সাদা মুক্তা, দর্শন গভীরতার জন্য কালো মুক্তা, সৌন্দর্যের জন্য গোলাপী মুক্তা, লাল মুক্তা ব্যবহৃত হয় স্বাস্থ্য ও শক্তির জন্য। এবং ধূসর মুক্তা চিন্তাশক্তি উন্নয়নের জন্য ব্যবহারের পরামর্শ দিয়ে থাকেন জ্যোতির্বিজ্ঞানীগণ।

উপসংহার/ করণীয়

মুক্তার মূল্য অনেক। অলংকার হিসেবে হীরার পরই এর স্থান। শুধু মিঠা পানির ঝিনুকই নয়, সামুদ্রিক ঝিনুক বা ওয়িস্টারেও মুক্তা চাষ করে দেশীয় প্রয়োজন মিটানোসহ প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন সম্ভব। জাপানের মিকিমটো নামে এক বৈজ্ঞানিক সর্বপ্রথম কৃত্রিম উপায়ে মুক্তা তৈরী করেছিলেন এবং তার নামে জাপানে একটি দ্বীপের নাম মুক্তা দ্বীপ রাখা হয়েছে। বাংলাদেশের কক্সবাজারের মহেশখালী, সোনাদিয়া, সেন্টমার্টিন ইত্যাদি এলাকায় প্রচুর পরিমাণে সামুদ্রিক বড় সাদা মুক্তা বহনকারী পাকুনা প্লাসিন্টা নামক ঝিনুক ও মুক্তা চাষের কর্মসূচী গ্রহণ করা যেতে পারে। ঝিনুক ও মুক্তার এ অবহেলিত সম্পদকে কাজে লাগিয়ে দেশকে সমৃদ্ধশালী করার সুযোগ আছে। সম্মিলিতভাবে যদি মাছের পাশাপাশি মুক্তার চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ করা যায় তাহলে আমাদের দেশও অন্যান্য দেশের মতো মুক্তা রপ্তানী কারক দেশ হিসেবে নিজের স্থান করে নিতে পারে।

ক্ষুদ্রাকার ঘেরে গলদা চিংড়ি-কার্প মিশ্র চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল

মোঃ রেজাউল করিম
মৎস্য অধিদপ্তর

স্বাদু পানির চিংড়ির মধ্যে গলদা সর্ববৃহৎ। এরা মিঠা পানিতে বড় হয়। তবে জীবনচক্রের শুরুতে মিঠা-লবণ মিশ্র পানির প্রয়োজন। প্রাকৃতিক উপায়ে নদীর মোহনায় আধা লোনা পানিতে এদের ডিম ফুটে। অতঃপর জোয়ারের প্রভাবে লার্ভা এবং পোষ্ট লার্ভা ধানক্ষেতে বা বিভিন্ন জলাশয়ে আশ্রয় নেয় এবং প্রকৃতির খেয়ালে প্রতিপালিত হয়। খাদ্যের সন্ধানে এরা নিম্ন অঞ্চলে পরিভ্রমণ করে। খাল-বিল, জলাভূমি, ধানক্ষেত, নদী এবং খাড়িতে গলদা চিংড়ি পাওয়া যায়।

৮০'র দশকের পূর্বে আমাদের দেশে গলদা চিংড়ি চাষ ব্যবস্থা ছিল না। ফলে প্রকৃতির খেয়ালে প্রতিপালিত উৎপাদনের কোন সঠিক হিসাব রাখা হত না। পরবর্তীতে বিদেশে রপ্তানির সুযোগে বাজারে গলদা চিংড়ির মূল্য আকর্ষণীয় হওয়ায় চাষীদের মধ্যে চিংড়ি চাষের আগ্রহ বেড়ে যায় এবং চিংড়ি চাষ লাভজনক হওয়ায় চাষ এলাকার দ্রুত সম্প্রসারিত হয়। বর্তমানে প্রায় ৩০,০০০ হেক্টর ঘেরে গলদা চিংড়ি চাষ হয়। বাৎসরিক গড় উৎপাদন প্রায় ৭৫০০ মেঃ টন। গলদা চিংড়ি রপ্তানী করে আয় হয় প্রায় ২০০ কোটি টাকা। প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ১ লক্ষেরও বেশী লোক চিংড়ি চাষে নিয়োজিত।

ক্ষুদ্রাকারের ঘেরে গলদা চিংড়ির মিশ্র চাষ

একখন্ড জমিতে চারদিকে বেষ্টনীবাঁধ স্থাপনের মাধ্যমে বর্ষা মৌসুমে চিংড়ি ও কার্প এক সাথে চাষ করা হয়। তাকে মিশ্র চাষ বলা যায়। চাষীরা নিজ নিজ জমিতে এ ব্যবস্থাপনায় ছোট পরিসরে চিংড়ি চাষ করেন। এ পদ্ধতিতে খরচ কম এবং নিজ পরিবারের কিংবা পার্শ্ববর্তী পরিবারের সদস্যদের অংশগ্রহণের সুযোগ থাকে। ক্ষুদ্রাকারের গলদা চিংড়ি মিশ্র চাষকে প্রান্তিক চাষীর পারিবারিক ঘের বলা যেতে পারে। গ্রামাঞ্চলে এ চাষ পদ্ধতি সকলের নিকট পরিচিত।

ছোট আকারে ঘেরের সুবিধা

* চাষীরা নিজ নিজ জমিতে বেষ্টনী বাঁধ দিয়ে চিংড়ি চাষ করতে পারেন।
* ঘেরের আয়তন কমবেশী ১ একর হলেই চলে।
* বিনিয়োগ কম।
* বহিরাগত লোকের প্রাধান্য থাকে না।
* ব্যবস্থাপনা সহজতর।
* বাহিরের শ্রমিক নিয়োগের প্রয়োজন হয় না।
* পারিবারিক অন্যান্য কাজের পাশাপাশি ঘের ব্যবস্থাপনায় অংশ গ্রহণে অসুবিধা হয় না।
* ধানক্ষেতে খাল কেটে এক মৌসুমে মাছ ও চিংড়ি এবং অন্য মৌসুমে ধান চাষ করা যায়।

গলদা-কার্প মিশ্র চাষের আদর্শ পুকুর ও পরিবেশ

মিশ্র চাষের জন্য ঘের/পুকুরের আয়তন কমবেশী ১ (এক) একর হলে ভাল। বর্ষাকালে খালের পানির গভীরতা ১.৫-২.০০ মিটার এবং ধানক্ষেতের পানির গভীরতা ০.৫০-১.০ মিটার থাকলেই চলে। ঘেরের তলদেশ সমতল রাখতে হবে। ঘেরের মাটি বেলে দোয়াশ হলে ভাল। তবে তলদেশের মাটিতে অতিরিক্ত পচা জৈব পদার্থ বা কাল জৈব মাটি (Pit Soil) সরিয়ে ফেলতে হবে এবং এসিড সালফেটযুক্ত মাটি পরিহার করতে হবে। অর্থাৎ প্রাকৃতিক খাদ্য উৎপাদনের সহায়ক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে।

সার্বিকভাবে চিংড়ি চাষ এবং মাছ চাষের নিয়মে কোন পার্থক্য নেই। গলদা চিংড়ির সাথে মাছ চাষের তেমন অসুবিধা হয় না। চিংড়ি পুকুরের তলদেশে বিচরণ করে, খোলস পরিবর্তন প্রক্রিয়ায় বড় হয়, দূষিত পরিবেশে আহার বন্ধ করে দেয়, তাপমাত্রার তারতম্যে কাতর হয়ে পড়ে এবং অক্সিজেনের চাহিদা বেশী। তাই চিংড়ি চাষের জন্য এ কয়েকটি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়। চিংড়ি প্রতিপালনের জন্য পরিবেশদূষণমুক্ত এবং উন্নত থাকা দরকার। চিংড়ি চাষের জন্য সহায়ক পানির গুণগতমান নিম্নরূপ থাকা উচিত ঃ

পানির তাপমাত্রা	ঃ ২৮-৩০° সেঃ
অক্সিজেন	ঃ ৫.০০ পিপিএম এর উর্দ্ধে।
পি,এইচ	ঃ ৬.৫-৯.০
এ্যালকালিনিটি	ঃ ১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।
মোট হার্ডনেস	ঃ ৪০-১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।
ক্যালসিয়াম	ঃ ১০০ পিপিএম এর কম ক্যালসিয়াম কার্বোনেট।
স্বচ্ছতা	ঃ ২৫-৩৫ সেঃমিঃ।

গলদা চিংড়ি-কার্প মিশ্র চাষের ব্যবস্থাপনা কৌশল

মিঠা পানির পরিবেশে সর্বত্রই গলদা চিংড়ির চাষ করা যায়। তবে ব্যবস্থাপনা কৌশলই উৎপাদন বৃদ্ধির মূল চাবিকাঠি। ব্যবস্থাপনা কৌশলের প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলোঃ-

* উপযুক্ত স্থান নির্বাচন।
* ঘেরের সাইজ কম বেশী ১.০ (এক একর)।
* ঘের প্রস্তুতির পর্যায়ক্রমিক পদক্ষেপ।
* পরিমিত চুন ও সার প্রয়োগ।
* পরিমিত পানি সরবরাহ।
* সঠিক সময়ে পরিমিত পোনা মজুদ।
* পরিমিত খাদ্য সরবরাহ করা।
* নমুনা পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
* পানির অবস্থা পরীক্ষা করা।
* নমুনা পরীক্ষা ও স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।
* মাটির অবস্থা পরীক্ষা করা।
* চিংড়ি আহরণ ও বাজারজাত করা।

কৌশলগত ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব

* চিংড়ির চাষযোগ্য পরিবেশ বজায় রাখা যায়।
* পানির গুণগতমান ও প্রাকৃতিক খাদ্য সঠিক রাখা যায়।
* চিংড়ির মৃত্যুর হার কমানো যায়।
* রোগ-জীবানু দমন করা যায়।
* ক্ষতিকর প্রাণী ও রাক্ষুসে মাছের অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখা যায়।
* নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে প্রতিপালিত মাছ ও চিংড়ি বড় করা যায়।
* উৎপাদন খরচ কম হয়।
* উৎপাদনও প্রায় নিশ্চিত করা যায়।

ঘের প্রস্তুত পদ্ধতি

ঘের শুকানো

ক্ষতিকর প্রাণী নিয়ন্ত্রণের জন্য ঘের শুকানোই শ্রেয়। পানি নিস্কাশনের পর ৫-৭ দিন রোদে শুকিয়ে তলা ফাটল ধরাতে হবে।

পুরাতন জমাকৃত পচা জৈব পদার্থ বা কালো মাটি অপসারণ

ঘেরের তলায় জমাকৃত অতিরিক্ত পচা জৈব পদার্থ বা কালো মাটি হাইড্রোজেন সালফাইড, এ্যামোনিয়া ও মিথেন গ্যাস সৃষ্টি করে। এ ধরনের গ্যাস চিংড়ি চাষের জন্য ক্ষতিকর। তাই পুরাতন জমাকৃত অতিরিক্ত পচা জৈব পদার্থ বা কালো মাটি অন্যত্র সরিয়ে ফেলতে হবে।

পাড় মেরামত

পুকুর শুকানোর পর ভাংগা পাড় এবং অসমতল তলা মেরামত করতে হবে। পাড়ের জঙ্গল ও আগাছা কেটে ফেলতে হবে। পুকুরের তলা হালকা চাষ দিয়ে উপরের শক্ত মাটি ভেংগে দিতে হবে।

খাল কাটা

দিনের বেলায় চিংড়ির আশ্রয়ের জন্য ঘেরে খাল থাকা আবশ্যক। তাছাড়া মিশ্র চাষের জন্য পানির গভীরতা বেশী রাখতে হয়। তাই ঘেরের চতুর্দিকে অথবা যেকোন স্থানে ১.৫-২ মিটার গভীর খাল কাটতে হবে।

চুন প্রয়োগ

পচা কাদাযুক্ত পুকুরে ডালোমাইট বেশী কার্যকর। আমাদের দেশে ডালোমাইট এখনও সহজপ্রাপ্য নহে। তাই ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং ক্যালসিয়াম হাইড্রো অক্সাইড ব্যবহার করা যেতে পারে। চুন প্রয়োগ করা হলে অনেক উপকার পাওয়া যায়। যেমন ঃ

* মাটির পি,এইচ বৃদ্ধিতে সহয়তা করে।
* মাটির পরিবেশ দুষণমুক্ত হয়।
* মাটির স্বাভাবিক উর্বরতা বৃদ্ধি করে।
* খনিজায়নে সহায়তা করে।
* রোগ বালাই দমন করে।
* ক্যালসিয়াম যোগান দেয়।

**মাটির পি.এইচ পরীক্ষান্তে চুন প্রয়োগ করতে হবে। সাধারণতঃ প্রতি একরে ৭৫-১০০ কেজি চুন ব্যবহার করা হলে ভাল উপকার পাওয়া যায়।

সার প্রয়োগ

চুন প্রয়োগের ৩-৪ দিন পর প্রতি একরে ২০০ কেজি কম্পোস্ট ব্যবহার করা হলে ভাল হয়। মাটিতে প্রতি একরে ৭৫ কেজি সরিষার খৈল প্রয়োগ করা যেতে পারে।

পানি প্রবেশ

চুন ও সার প্রয়োগের পর পানি ঢুকাতে হবে। প্রথমতঃ ১০-২৫ সেঃমিঃ পানি ঢুকিয়ে ৭-১০ দিন অপেক্ষা করতে হয়। এ সময় সূর্যের আলো ও তাপের সাহায্যে পানির তলায় প্রচুর শ্যাওলা এবং প্রাণী কনা জন্ম নেবে। এগুলো চিংড়ি পোনার প্রাথমিক খাদ্য। এই খাদ্য জন্মানোর পর ঘেরে ৯০-১১০ সেঃমিঃ পানি বৃদ্ধি করতে হবে। অতঃপর পোনা ছাড়তে হবে। পানি প্রবেশের সময় ক্ষতিকর প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখতে হবে।

ঘাস লাগানো

চিংড়ি ঘেরের তলদেশে বিচরণ করে। তলদেশে চিংড়ির জন্য আশ্রয়স্থল প্রয়োজন হয়। তাই ঘের শুকানোর পর তলদেশে ঘাস লাগানো যেতে পারে। তাছাড়া চিংড়ি আশ্রয়ের জন্য তাল, নারকেল, খেজুর ইত্যাদি গাছের ডাল/পাতা পুতে দেয়া যায়।

প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ

পোনা মজুদের পূর্বেই ঘেরের প্রাকৃতিক খাদ্য পর্যবেক্ষণ করতে হয়। পানি সবুজ কিংবা বাদামী সবুজ রং ধারণ করলে পোনা ছাড়তে হবে। ঘোলা, ঘন সবুজ, হলুদ কিংবা স্বচ্ছ পানি মিশ্র চাষের জন্য মোটেই সহায়ক নহে।

পোনা মজুদ

পুকুরের চুন ও সার প্রয়োগের ২ সপ্তাহের পর পোনা মজুদ করতে হবে। মিশ্রচাষের জন্য কিশোর চিংড়ি (জুভেনাইল) মজুদ করা হলে মৃত্যু হার কম হবে। পানির গুণাগণ, খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা, খাদ্য প্রয়োগের সুবিধা এবং সহযোগী মাছের সংখ্যা বিশ্লেষণ করে চিংড়ির পোনা মজুদের হার নির্ণয় করতে হবে। ভাল উৎপাদন পেতে হলে পরিমিত পোনা মজুদ করতে হবে।

মিশ্র চাষের জন্য প্রতি একরে পোনা মজুদের হার নিম্নরূপ

গলদা	ঃ ৪০০০-৪৫০০টি	(৩-৫ সেঃমিঃ)
কাতলা	ঃ ৩০০-৪০০টি	(৭-১০ সেঃমিঃ)
সিঃ কার্প	ঃ ৫০০-৭০০টি	(৭-১০ সেঃমিঃ)
রুই	ঃ ২০০-৩০০টি	(৭-১০ সেঃমিঃ)

খাদ্য প্রয়োগ

গলদা চিংড়ি সর্বভুক প্রাণী। এরা উদ্ভিদ ও প্রাণীজাত উভয় প্রকারের খাদ্য খায়। প্রাকৃতিক পরিবেশে এরা ছোট আকারের চিংড়ি শামুক, ঝিনুক, পোকা-মাকড়, কীট-পতঙ্গ,

পচা জৈব পদার্থ এবং শ্যাওলা জাতীয় খাবার খেয়ে থাকে। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে কুড়া, খৈল, ভাত, ফিসমিল ইত্যাদি উত্তম খাদ্য। লাগসই প্রযুক্তির মাধ্যমে পরিকল্পিতভাবে ঘের প্রস্তুত করা হলে প্রথম মাসে খাবার ও সার প্রয়োগের প্রয়োজন হয় না। ঘেরে পরিমিত প্রাকৃতিক খাদ্য না থাকলে মাছ ও চিংড়ির ভাল ফলন পাওয়া যায় না। ভাল উৎপাদন পেতে হলে ঘেরে নিয়মিত সার দিতে হবে। প্রাকৃতিক খাদ্যের সঠিক পরিমাণ যাচাইয়ের জন্য প্রতি সপ্তাহে সেকিডিস্কের সাহায্যে পানির স্বচ্ছতা দেখতে হবে। সেকিডিস্কের দৃশ্যমান ২৫-৩০ সেঃমি মধ্যে রাখতে হবে। দৃশ্যমান এর বেশী হলে সার দিতে হবে। প্রতি মাসে নিম্ন পরিমাণে সার দেওয়া হলে প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি হয় না।

ইউরিয়া ঃ ১০ কেজি প্রতি একরে।

টিএসপি ঃ ৬ কেজি প্রতি একরে।

প্রাকৃতিক খাদ্যের ঘাটতি পূরণ এবং যথাসময়ে অতিরিক্ত ফলনের জন্য সম্পূরক খাদ্য দেওয়া ভাল। খাদ্যের উপাদান হিসেবে স্থানীয় সহজলভ্য সামগ্রী ব্যবহার করা যায়। সম্পূরক খাদ্য হিসেবে চাউলের কুড়া, গমের ভূষি, শামুকের মাংস, ফিসমিল, সরিষার খৈল, গবাদি পশুর রক্ত দেয়া যায়। সাধারণতঃ মাছ ও চিংড়ির গড় ওজনের ৩-৫ % হারে দৈনিক খাদ্য দিতে হয়। নিম্নে বর্ণিত উপাদানের মিশ্রণে খাদ্য তৈরী করা যায়।

ফিসমিল	ঃ ৪০%		শামুকের মাংস ঃ ৪০%
সরিষার খৈল	ঃ ২০%	অথবা	চাউলের কুড়া ঃ ৩০%
চাউলের কুড়া	ঃ ২৫%		ভাত ঃ ২০%
ভাত	ঃ ১৫%		

উপরোক্ত উপাদান সমৃদ্ধ খাদ্য তৈরী করে ট্রে অথবা পাত্রে প্রয়োগ করতে হবে। চিংড়ি রাতেই বেশি খায় এবং পাড়ের কিনারায় বা ঢালে বিচরণ করে। তাই ঘেরের কিনারায় নির্দিষ্ট স্থানে খাবার দিতে হবে।

মজুদ উত্তর ব্যবস্থাপনা

*ঘেরের স্বাস্থ্যকর অবস্থা সংরক্ষণ করা।
*পানির তাপমাত্রা সঠিক মাত্রায় রাখা।
* অক্সিজেনের ঘাটতি পূরণ করা।
* পানির গভীরতা সঠিক রাখা।
* পানির গুণগত মান পরীক্ষা করা।
* পানির পরিবেশ দূষণমুক্ত রাখা।
* মাটি ও পানি পরীক্ষান্তে প্রয়োজনীয় চুন ও সার প্রয়োগ করা।
* চিংড়ির ও মাছের নমুনা পরীক্ষা করে স্বাস্থ্য ও দেহ বৃদ্ধি যাচাই করা।
* সার খাদ্য প্রয়োগ করা।
* বড় আকারের চিংড়ি ও মাছ ধরে ফেলা।
* সঠিক সময়ে বাজারজাত করা।

চিংড়ি/মাছ আহরণ

প্রাকৃতিক পরিবেশে সকল মাছ ও চিংড়ি সমান বড় হয় না। খাদ্যে প্রতিযোগিতা ও অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কারণে চিংড়ি ও মাছের আকার বড়/ছোট হতে পারে। তাই একত্রে পালিত চিংড়ি ও মাছ না ধরে বড় আকারেরগুলো আংশিক ধরা লাভজনক। এ প্রক্রিয়ায় অপেক্ষাকৃত ছোট আকারেরগুলো পরবর্তীতে দ্রুত বেড়ে যাওয়ার সুযোগ পায়। এতে উৎপাদন ও লাভ দুই-ই বেশী হয়। গলদা চিংড়ি ৭০-৮০ গ্রাম এবং মাছ প্রতিটি ৫০০ গ্রাম ওজনের হলেই ধরা শুরু করতে হবে। মাছ ধরার জন্য ঝাকি জাল ব্যবহার করা ভাল।

এক একর গলদা-কার্প মিশ্র চাষ ঘেরের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান

ব্যবস্থাপনা কৌশল আয়ের মূল উৎস। সঠিকভাবে এবং সঠিক সময়ে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়া হলে মিশ্র চাষ অবশ্যই লাভ জনক হবে। মিশ্র চাষের আয়-ব্যয়ের খতিয়ান নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ-

(ক) ব্যয়

জমি ইজারা মূল্য	ঃ	৫০০০.০০ টাকা।
বেড়ি বাঁধ নির্মাণ	ঃ	৭০০০.০০ টাকা।
সেচ ও মেরামত	ঃ	১০০০.০০ টাকা।
চুন (৭৫) কেজি	ঃ	৬০০.০০ টাকা।
গোবর (২০০) কেজি	ঃ	২০০.০০ টাকা।
সার (ইউরিয়া, টিএসপি)	ঃ	১০০০.০০ টাকা।
চিংড়ি পোনা (৫০০০ টি)	ঃ	২৫০০০.০০ টাকা।
মাছের পোনা (১৫০০ টি)	ঃ	৩০০০.০০ টাকা।
খাবার	ঃ	৫০০০.০০ টাকা।
অন্যান্য খরচ	ঃ	৩০০০.০০ টাকা।
মোট ব্যয়	ঃ	**৫০,৮০০.০০ টাকা।**

(খ) আয়

চিংড়ি ৩০০ কেজি × ২৫০.০০	ঃ	৭৫,০০০.০০ টাকা
মাছ ১০০০ কেজি × ৩০.০০	ঃ	৩০,০০০.০০ টাকা
ধান ১০ মণ × ২০০.০০	ঃ	২০০০.০০ টাকা
মোট আয়	ঃ	**১,০৭,০০০.০০ টাকা**

(গ) নীট মুনাফা

(খ-ক) = (১,০৭,০০০.০০ - ৫০,৮০০.০০ টাকা)
= **৫৬,২০০.০০ টাকা।**

(ছাপ্পান্ন হাজার দুইশত টাকা মাত্র।)

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি

মেজবাহ্ উদ্দিন আহম্মদ
মৎস্য অধিদপ্তর
শিবব্রত নন্দী
এফ এম এস / ডি এফ আই ডি

সম্প্রসারণ হচ্ছে একটি দ্বিমুখী যোগাযোগ ব্যবস্থা, যা একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্যদিয়ে অগ্রসর হয়। মৎস্য সম্প্রসারণের অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে মৎস্য খামারীদের মাঝে প্রয়োজনীয় দক্ষতার স্থানান্তর এবং সময়োপযোগী তথ্য সরবরাহ। সম্প্রসারণ কার্যক্রমের সফলতা নির্ভর করে অভীষ্ট জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণের ওপর। সক্রিয় অংশগ্রহণ আবার নির্ভরশীল খামারীদের জন্যে বোধগম্য আবেদন, তাদের শিক্ষা, সচেতনতা এবং দৃষ্টিভঙ্গির অবস্থার ওপর।

কার্যকর সম্প্রসারণ ব্যবস্থা প্রণয়নের পূর্বে কয়েকটি মৌলিক প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়, যেমন- (১) অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক অবস্থা; (২) তাদের সম্পাদের প্রাপ্যতা; (৩) মাছ চাষের কৌশল এবং সমস্যা; (৪) সমস্যা সমাধানের সম্ভাব্য পথ।

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবস্থা, তাদের সুখ-দুঃখ সম্পর্কে ব্যক্তিগত যোগাযোগ ও জানাশোনা একজন খামারীকে সম্প্রসারণ কর্মীর প্রতি আগ্রহী করে তুলতে পারে।

মাছ চাষ সম্প্রসারণে একজন সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা

(ক) কারিগরি

(১) **তথ্য সংগ্রহ ঃ** অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর প্রকৃত অবস্থা জানার মাধ্যমে একজন সম্প্রসারণ কর্মী মৎস্য চাষ বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় তার নিজের ভূমিকা এবং জনগণের অংশগ্রহণকে সুনিশ্চিত করতে সক্ষম হয়। এর জন্যে মৎস্য খামারীদের সমস্যা, চাহিদা এবং সম্ভাবনার জরিপ এবং মূল্যায়ন করতে হয়।

(২) **সমন্বয় ঃ** সম্প্রসারণ কার্যক্রমে একটি অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর জন্যে এক অথবা একাধিক পদ্ধতির ব্যবহার হতে পারে। তাই কোন একটি পদ্ধতির মাঝে গন্ডিবদ্ধ না থেকে একাধিক পদ্ধতির সমন্বিত ব্যবহার কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে।

(৩) **উদ্বুদ্ধকরণ ঃ** মৎস্য খামারীদের একটি দল হিসেবে কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করতে পারলে সমস্যার সমাধান সহজ হয়। এ জন্যে খামারীদের পরিকল্পনা এবং সমস্যা নিয়ে দলীয় আলোচনা হতে পারে। দলীয় আলোচনায় খামারীদের সৃজনশীলতার বিকাশকে সহায়তা করে, নিজেদের কাজের আস্থা বাড়ায় এবং সমস্যা সমাধানে সাহায্য করে। এ ক্ষেত্রে প্রাথমিকভাবে সম্প্রসারণকর্মী নিজেই অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারে।

(৪) **স্থানান্তর ঃ** মাছ চাষের কৌশল ও সাম্প্রতিক গবেষণার ফলাফলসমূহ মৎস্য খামারীদের মাঝে এবং মৎস্য খামারীদের সমস্যাগুলো গবেষণা ও অন্যান্য সংশ্লিষ্টদের মাঝে পৌঁছে দেয়ার মাধ্যমে একটি কার্যকর দ্বিমুখী প্রক্রিয়া বাস্তবায়নে সম্প্রসারণ কর্মী ভূমিকা রাখেন। যেমন ঃ-

কলাকৌশলের উন্নয়ন (বিজ্ঞানী)	কলাকৌশলের যোগাযোগ প্রক্রিয়া (সম্প্রসারণ কর্মী)	কলাকৌশল গ্রহণ প্রক্রিয়া (মৎস্য খামারী)

(৫) **পরিবর্তন ঃ** মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে মৎস্য খামারীদের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন, তাদের অর্থনৈতিক এবং মানসিক স্থিতাবস্থা অর্জনে সহায়তা প্রদান।

(খ) সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক

(১) ঋণাত্মক ধারণাসমূহ পরিবর্তন এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়নে সম্প্রসারণ কর্মীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্যে সে একজন ভাল উদ্বুদ্ধকারক হিসেবে কাজ করতে পারে।

(২) মৎস্য খামারীদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক (বুদ্ধিবৃত্তিক) অবস্থা পরিবর্তনে সহায়তা করা।

(৩) অন্যান্য উন্নত দেশের খামারীদের অবস্থার তথ্যসমূহ অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর কাছে পৌছে দেয়া।

(৪) মাছ চাষে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করতে খামারীদের জীবন ব্যবস্থার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা।

(৫) খামারীদের মনোজগতের উপর নিজের কর্মকান্ড দিয়ে প্রভাবান্বিত করা।

মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মীর গুণাবলী

মৎস্য চাষ সম্প্রসারণের উদ্দেশ্যাবলীকে ফলপ্রসূভাবে পৌছানোর জন্যে তার কিছু গুণাবলী অর্জন করা প্রয়োজন। যেমন ঃ-

(১) গ্রামের মানুষের জীবন ব্যবস্থার সাথে নিজেকে সম্পৃক্ত করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা গেছে, গ্রামে কাজ করার অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কর্মীরা সম্প্রসারণ কাজে অধিকতর সফলতা লাভ করেন।

(৩) নিজের দায়িত্ব এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা অর্জন। অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক মান, সামাজিক অবস্থা এবং সমস্যা সম্পর্কে তাকে হতে হবে সচেতন। এ সমস্ত বিষয় বিবেচনায় না রেখে কাজ করলে মৎস্য খামারীরা তাকে গুরুত্ব না-ও দিতে পারেন।

(৩) কারিগরি বিষয়বস্তু সম্পর্কে তার পরিপূর্ণ ধারণা থাকতে হবে। যেমন ঃ- মাছ চাষের সাম্প্রতিক গবেষণালব্ধ ফলাফলসমূহ, অন্যান্য অঞ্চলের সফল খামারীদের অভিজ্ঞতা, নিজের প্রকল্পের বাইরে অন্যান্য প্রকল্পের অভিজ্ঞতা ইত্যাদি।

(৪) লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে বিভিন্ন সম্প্রসারণ উপকরণ সংগ্রহ এবং তৈরীতে দক্ষতা অর্জন।

(৫) তার নিজের চাকুরীর প্রতি সততা, একাগ্রতা এবং কঠোর পরিশ্রমী। খামারীদের প্রতি আচরণ হবে বিনয়ী এবং নৈতিকতা সমৃদ্ধ। নিজের প্রতি প্রগাঢ় আস্থা, প্রকল্পের উদ্দেশ্যের প্রতি নিষ্ঠা এবং বাস্তব অবস্থার উপর যৌক্তিক বিচার বুদ্ধি গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) খামারীদের উদ্বুদ্ধকরণ ক্ষমতা তার সফলতার অন্যতম চাবিকাঠি। খামারী যাতে তার পুকুরের জন্যে একটি বাস্তব পরিকল্পনা প্রণয়ন করতে পারে-এর জন্য সহায়তা করা উচিত।

(৭) খামারীদের কথা মনোযোগ দিয়ে শুনতে হবে, তাদের সমস্যাগুলো জানতে হবে এবং সমস্যা সমাধানে তাদের মতামতকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

(৮) তার নিজের প্রতিবেদনসমূহ তৈরীতে অবশ্যই সঠিক তথ্যের সমাহার ঘটাতে হবে।

মৎস্য সম্প্রসারণ পদ্ধতিসূমহ

অভীষ্ঠ জনগোষ্ঠীর মাঝে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন একজন সম্প্রসারণ কর্মীর সফলতার চাবিকাঠি। এটি করতে গিয়ে তাকে বিভিন্ন মাধ্যম এবং পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হয়। গ্রামীণ অবকাঠামোর প্রেক্ষাপটে কোনএ কটি পদ্ধতি কিভাবে ব্যবহৃত হতে, তা কাজ শুরুর পূর্বেই আপাতভাবে জেনে নেয়া এবং সে অনুযায়ী একটি কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করা উচিত। সম্প্রসারণ কার্যক্রমে যে

ব্যক্তিগত যোগাযোগ

১. খামার ও বাড়ি পরিদর্শন
২. অফিস পরিদর্শন
৩. টেলিফোনে আলাপ
৪. ব্যক্তিগত পর্যায়ে আলাপ
৫. ফলাফল প্রদর্শন

দলীয় যোগাযোগ

১. পদ্ধতি পরিদর্শন
২. প্রশিক্ষণ কার্যক্রম
৩. দলীয় সভা
৪. আলোচনা সভা
৫. ফলাফল প্রদর্শনকালীন সভা
৬. দলীয় শিক্ষা সফর
৭. অন্যান্য ইস্যুভিত্তিক সভা

ব্যাপক সংযোগ

১. পোস্টার
২. লিফলেট
৩. বুলেটিন
৪. সার্কুলার
৫. বেতার
৬. টেলিভিশন
৭. প্রদর্শনী
৮. গল্পের আকারে খবর

পদ্ধতিসমূহের অবস্থানুযায়ী (Form) সম্প্রসারণ কার্যক্রমকে আবার কয়েক ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

লিখিত	বক্তব্য প্রধান	দৃশ্যমান
১. বুলেটিন	১. সাধারণ সভা	১. ফলাফল প্রদর্শন
২. লিফলেট	২. খামার ও বাড়ী পরিদর্শন	২. পদ্ধতি প্রদর্শন
৩. সংবাদ	৩. অফিসে ডেকে আলোচনা	৩. প্রদর্শনী
৪. ব্যক্তিগত পত্র	৪. টেলিফোন আলোচনা	৪. পোস্টার
৫. সার্কুলার	৫. বেতার সম্প্রচার	৫. চলচ্চিত্র
		৬. চার্ট
		৭. স্লাইড

পদ্ধতিসমূহ ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মাধ্যমের সহায়তা নেয়া যায়। এর মধ্যে অডিও-ভিস্যুয়াল এইড অন্যতম। অডিও-ভিস্যুয়াল এইডকে কয়েকভাবে ভাগ করা যায় ঃ

অডিও	ভিস্যুয়াল	অডিও-ভিস্যুয়াল
১. টেপ রেকর্ডার	১. ফ্লাস কার্ড	১. টেলিভিশন
২. বেতার	২. ব্ল্যাক বোর্ড	২. চলচ্চিত্র
	৩. ছবি	৩. নাটক মঞ্চায়ন

উল্লেখিত পদ্ধতিসমূহের সম্প্রসারণ কার্যকারিতা নিম্নরূপ ঃ

পদ্ধতি	মানুষের মধ্যে গ্রহণ হার (%)
১. ব্যক্তিগত যোগাযোগ	২৪-২৯.৪৭
২. দলীয় যোগাযোগ	২৬.৭৩-৩২.৮
৩. ব্যাপক সংযোগ	২৩.৩-৩২.৯৬
৪. অপ্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত করা	১০.৮৫-১৯.১

সমস্ত পদ্ধতিসমূহ সাধারণভাবে ব্যবহৃত হয়, তা হলো ঃ

যে কোন সম্প্রসারণ কর্মকান্ডে 'কাজ করে শেখা'ই হচ্ছে সবচেয়ে ফলপ্রসূ মাধ্যম। উপাত্ত থেকে দেখা যায় ঃ-

মানুষ শ্রবণ করে মনে রাখতে পারে	১০%
মানুষ শ্রবণ করে এবং দেখে মনে রাখতে পারে	২০%
মানুষ শ্রবণ করে, দেখে ও কাজ করে মনে রাখতে পারে	৭০%

উল্লেখিত বিষয়ের আলোকে একজন সম্প্রসারণ কর্মী তার অভীষ্ঠ লক্ষ্যে পৌছানোর জন্যে সম্প্রসারণ কৌশল নির্ধারণ করবেন।

প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণ হচ্ছে একটি শিক্ষণ ব্যবস্থা, যা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট বিষয়ে অভীষ্ঠ দলের বর্তমান মনোভাব পরিবর্তনের মাধ্যমে উক্ত জ্ঞান ও দক্ষতার উন্নয়ন করা যায়। অন্য কথায়, প্রশিক্ষণ হচ্ছে শিক্ষণের এমন একটি মাধ্যম, যার দ্বারা জীবন ও জগতের দ্বন্দ্বসমূহ সৃষ্টিশীলভাবে জানা যায়। জ্ঞান, দক্ষতা এবং মনোভাবের ধনাত্মক পরিবর্তনই হচ্ছে প্রশিক্ষণের মূল কথা। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে মূলতঃ ৩টি বিষয় গুরুত্ব সহকারে দেখা যায়- তথ্যের প্রবাহ (information); যোগসূত্র (linkage) এবং

আলোকপাত (exposure)।

প্রশিক্ষণ হচ্ছে সম্প্রসারণ কার্যক্রমেরই একটি হাতিয়ার। প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে যে সমস্ত পথ ও পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়, তাদের প্রতিটিকে প্রশিক্ষণ কৌশল বলে। প্রশিক্ষণ কৌশল হচ্ছে প্রশিক্ষণের হাতিয়ার। স্থান, কাল, পরিস্থিতি ও পরিবেশের প্রেক্ষিতে কৌশল বদল হয়। কোন্ কৌশলটি কোন্ ক্ষেত্রে প্রযোজ্য তা একজন বুদ্ধিমান প্রশিক্ষক সহজেই বুঝতে পারেন। প্রশিক্ষণ কৌশলের সংখ্যা অনেক। অতি পরিচিত কয়েকটি কৌশল হচ্ছে ঃ বক্তৃতা (Lecture); দলীয় আলোচনা (Group discussion); চরিত্র চিত্রণ (Role playing); ঘটনা বিশ্লেষণ (Case study); উচ্চ ও ব্যাপক পর্যায়ে আলোচনা (Seminar); কর্মশালা (Workshop); পর্যায়ক্রমে পাঠ (Study circle); বক্তৃতা-আলোচনা (Lecture discussion); মুক্ত চিন্তার ঝড় (Brain storming)।

সম্প্রতি FAO-NACA (1997) এক জরিপে মৎস্য চাষ উন্নয়নে ইস্যু ও বাধাগুলোকে চিহ্নিত করা হয়েছে। এতে অকার্যকরীভাবে প্রযুক্তি হস্তান্তর, দুর্বল প্রাতিষ্ঠানিক যোগাযোগ ও সমন্বয়, দক্ষ কারিগরি কর্মীর অভাব, তথ্য প্রদানের পদ্ধতি ও পন্থার অভাব, দূষণ ও পরিবেশগত বিষয়সমূহকে এ অঞ্চলের অধিকাংশ দেশই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছে। অপরদিকে প্রাতিষ্ঠানিক ও প্রশাসনিক এবং আর্থ-সামাজিক বিষয়ের ওপর গবেষণাকে তেমন একটা অগ্রাধিকার খাত হিসেবে চিহ্নিত করা হয়নি (যতটুকু গুরুত্ব দেয়া হয়েছে কারিগরি ও পরিবেশগত খাতকে)। বলাবাহুল্য, সমাজের অংশগ্রহণ ছাড়া কোন সম্প্রসারণ কার্যক্রমই চূড়ান্ত সফলতা অর্জন করতে পারে না। তাই সম্প্রসারণ কর্মী এবং প্রকল্পসমূহকে এ বিষয়ে আরো বস্তুনিষ্ঠভাবে চিন্তা করতে হবে। কারণ যে কোন প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যই মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করা।

চিংড়ি রোগ নিরাময় এবং স্বাস্থ্য সুবিধা ব্যবস্থাপনা কৌশল

মোঃ রেজাউল করিম
হাবিবুর রহমান খন্দকার
মৎস্য অধিদপ্তর

রোগ জীবাণুর অনুকূল পরিবেশ থাকলেই রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা দেয়। এ রোগ জীবাণু ঘেরে জন্ম নিতে পারে অথবা অন্য স্থান থেকেও সংক্রমিত হতে পারে। ঘেরের মাটি ও পানির পরিবেশ দূষিত হলেই রোগ-জীবাণু বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। তাছাড়া রোগাক্রান্ত ও আঘাত প্রাপ্ত দুর্বল পোনার সাথে অন্য স্থান থেকে রোগ জীবাণুর অনুপ্রবেশ ঘটতে পারে। আজকাল সকলেরই ধারণা শুধুমাত্র ভাইরাস রোগে আক্রান্ত হওয়ার ফলে ব্যাপক হারে চিংড়ি মড়ক হয়। কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে ভাইরাসের চাইতে ভ্যাকটেরিয়া জাতীয় রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী। তবে ভাইরাস রোগ হয় না এ কথা বলা যাবে না।

হ্যাচারীতে অস্বাস্থ্যকর অবস্থা, পরিবহন জনিত পীড়নতা, পরিবেশগত কারণে পীড়নতা, ঘেরে মাটি ও পানির দূষণতা, অক্সিজেনের স্বল্পতা এবং পানিতে বিভিন্ন দূষিত গ্যাসের প্রবণতা চিংড়ি রোগের অন্যতম কারণ। অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, চিংড়ি যে কোন কারণে একবার রোগে আক্রান্ত হলে উহা নিরাময়ের ব্যবস্থা নেওয়া কঠিন। তাই চিংড়ির রোগ প্রতিকারের চেয়ে প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ করাই শ্রেয়। রোগ প্রতিরোধের প্রাথমিক পদক্ষেপ হলো চিংড়ির আবাসস্থলের মাটি ও পানির স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা, সঠিক সময়ে সুস্থ ও সবল পোনা মজুত করা, নার্সারীতে পোনা মজুত করা, রাক্ষুসে প্রাণী ও ক্ষতিকর প্রাণী দমন করা এবং উপযুক্ত খাদ্যের যোগান দেয়া। চিংড়ির আবাসস্থলের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য আবশ্যকীয় পদক্ষেপসমূহ নিম্নে বর্ণনা করা হলো।

১। ঘের প্রস্তুতির ব্যবস্থা নেয়া

কিভাবে ঘের প্রস্তুত করবেন ?

* পানি নিষ্কাশন করে ঘেরের তলা ভাল করে শুকিয়ে নিন।
* রাক্ষুসে ও ক্ষতিকর প্রাণী মেরে ফেলুন।
* বর্জ্য অপসারণ করুন।
* প্রয়োজনে হালকা চাষ দিন। চাষ দেয়ার পর দীর্ঘদিন রোদে শুকাবেন না।
* প্রথমত ১০-১৫ সেঃমিঃ পানি তুলে ৪-৫ দিন অপেক্ষা করুন।
* অতঃপর বর্জ্য ও ময়লাযুক্ত পানি বের করে দিন।
* ২-৩ বার পানি ভর্তি ও খালি করে ঘেরের তলদেশ ধৌত করুন।
* মাটির পিএইচ নির্ণয় করে ঘেরের তলায় সর্বত্র চুন ছিটিয়ে দিন।

পিএইচ এর পরিমাপ অনুযায়ী চুনের প্রয়োগের পরিমাণ নিম্নরূপ

মাটির পিএইচ	চুন প্রয়োগের মাত্রা (টন/হেক্টর)	
	কৃষি চুন/ডলোমাইট	কলিচুন
৬.০	১-২	৫-১.০
৫.০-৬.০	২-৩	১.০-১.৫
৫.০	৩-৫	১.৫-২.৫

* গেটে নেট স্থাপনের মাধ্যমে ছেকে পানি তুলুন।
* রাক্ষুসে মাছ ও প্রতিযোগী প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।
* ২০-২৫ সেঃমিঃ পর্যন্ত পানি তুলে সার প্রয়োগ করুন।

সার প্রয়োগের নিয়মাবলী

* প্রতি হেক্টরে ১ কেজি ইউরিয়া এবং ১ কেজি টিএসপি প্রয়োগ করুন।
* ৫-৭ দিন পর পুনরায় সম পরিমাণে সার দিন।
* সার প্রয়োগের পর পানি পরিবর্তন করবেন না।
* পানির গভীরতা ৬০ সেঃমিঃ পর্যন্ত বৃদ্ধি করুন।
* পানির রং সবুজ/বাদামী হলে পোনা মজুদ করুন।
* প্রতি অমাবশ্যা/পুর্ণিমায় পানি পরিবর্তনের পর প্রতি হেক্টরে ২-৩ কেজি হারে সার দিন।
* ১/২ সপ্তাহ পর্যন্ত প্রতি ২-৩ দিন অন্তর প্রতি হেক্টরে ৬-১০ কেজি হাঁসমুরগীর বিষ্টা অথবা গোবর পানিতে গুলে প্রয়োগ করুন।

২। পোনা মজুত

কখন পোনা মজুত করবেন

পরিবেশ সহনীয় অবস্থায় ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে পোনা মজুত করুন। রাক্ষুসে প্রাণী থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য নার্সারীতে পোনা মজুত করাই শ্রেয়। তবে নার্সারীতে বিদ্যমান ক্ষতিকর প্রাণী অবশ্যই মেরে ফেলতে হবে এবং উহার অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখতে হবে। নার্সারীতে রাক্ষুসে মাছ মারার জন্য প্রতি হেক্টরে ১০০-১৫০ কেজি চা-বীজের খৈল প্রয়োগ করুন। চা-বীজের খৈল প্রয়োগের ৩ দিনের মধ্যে পোনা ছাড়া যাবে না এবং বিকেলে খৈল ব্যবহার করা যাবে না। রোদের তাপমাত্রা বেশী থাকলে চা-বীজের খৈলের প্রয়োগের কার্যকারিতা ভাল হয়। নার্সারীর আয়তন কমবেশী এক একরের বেশী হওয়া উচিত নয়।

প্রতি একরে ৫০ হাজারের বেশী পোনা মজুত করা যাবে না। নার্সারীতে খাদ্য প্রয়োগ করে পোনা বাঁচার হার বৃদ্ধি করতে হবে। একমাস প্রতিপালনের পর চিংড়ি পোনা বড় ঘেরে স্থানান্তর করুন। নার্সারীতে নিম্নে বর্ণিত উপাদানের সমন্বয়ে খাদ্য তৈরী করে প্রয়োগ করুন।

ফিস মিল	= ৫০%	ফিসমিল	= ৩০%
চাউলের কুড়া	= ৩০% অথবা	সরিষার খৈল	= ২০%
খুদের ভাত	= ২০%	চাউলের কুড়া	= ৩০%
		খুদের ভাত	= ২০%

চিংড়ির মোট ওজনের ৫-৭% পরিমাণে খাদ্য প্রয়োগ করতে হবে। মোয়া বা বল তৈরী করে খাদ্য প্রয়োগ করা হলে খাদ্যের অপচয় কম হবে।

৩। রাক্ষুসে প্রাণী ও প্রতিযোগী প্রাণী দমন

কিভাবে রাক্ষুসে প্রাণী ও প্রতিযোগী প্রাণী দমন করবেন?

* পানি সম্পূর্ণ নিষ্কাশন করে ক্ষতিকর প্রাণী মেরে ফেলুন।
* পানি প্রবেশ গেটে নেট স্থাপন করুন।
* প্রতি হেক্টরে ১০০-১৫০ কেজি চা-বীজের খৈল ব্যবহার করুন।
* ক্ষতিকর প্রাণীর অনুপ্রবেশ নিয়ন্ত্রণে রাখুন।

৪। রোগ বালাই নিরাময়

কিভাবে রোগ বালাই হ্রাস করবেন ?

* নিয়মিত পানি পরিবর্তন করুন।
* ৬০ সেঃমিঃ এর উর্ধ্বে পানি ধরে রাখুন।
* ঘোলাটে ও ময়লাযুক্ত পানি ঢুকাবেন না।
* পানি পরিবর্তনের পর প্রতি হেক্টরে ৮-১০ কেজি ক্যালসিয়াম কার্বোনেট অথবা ডলোমাইট প্রয়োগ করুন।
* চাষ পদ্ধতির আলোকে পরিমিত পোনা ছাড়ুন।
* পার্শ্ববর্তী রোগে আক্রান্ত ঘেরের চিংড়ি, কাঁকড়া এবং অন্যান্য প্রাণীর অনুপ্রবেশ বন্ধ রাখুন।
* দুর্বল ও রোগাক্রান্ত পোনা মজুত করবেন না।
* কোন ঘেরে ভাইরাস রোগ দেখা দিলে উক্ত ঘেরের পানির পরিবর্তন বন্ধ রাখুন।
* কোন অবস্থাতেই রাসায়নিক দ্রব্যাদি ও এন্টিবায়োটিক ব্যবহার করবেন না।

৫। কিভাবে ঘেরের পরিবেশ উন্নত রাখবেন ?

* ঘেরের যে কোন অংশে খাল খননের মাধ্যমে গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে।
* পানির গভীরতা ৬০ সেঃমিঃ এর উর্ধ্বে রাখতে হবে।
* পানির রং সর্বদাই সবুজ ভাব বজায় রাখতে হবে।
* কৃষি চুন/ডলোমাইট ব্যবহারের মাধ্যমে পানির দূষণীয়তা দমনে রাখুন।
* চাষকালীন অবস্থায় কলিচুন ব্যবহার থেকে বিরত থাকুন।
* পানি পরিবর্তনের পর সার দিন।

৬। ঘেরের সমস্যা চিহ্নিত করণের সূচক

* অক্সিজেন কম হলে বেলে জাতীয় মাছ পাড় ঘেসে থাকবে অথবা সাতরাবে।
* শামুক বা কাঁকড়া জাতীয় প্রাণী ঘেরের পাড়ে উঠে আসবে।
* পানির গভীরতা কম হলে ল্যাবল্যাব পচে পানিতে ভাসতে থাকবে।
* পানি ও মাটিতে দুর্গন্ধ হবে এবং মাটিতে এ্যামোনিয়া জাতীয় গন্ধ সৃষ্টি হবে।
* পানিতে গ্যাস বা বুদ বুদ সৃষ্টি হবে।
* চিংড়ি পানির উপরিভাগ দিক-নির্দেশনাহীন এলোপাতাড়িভাবে সাঁতার কাটবে।
* দিনের আলোতে চিংড়ি ঘুরে বেড়াবে।

৭। ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম

* পানির গভীরতা ঠিক রাখা।
* মাটি ও পানি পরীক্ষা করা।
* নিয়মিত চুন ও সার প্রয়োগ করা।
* খাদ্য প্রয়োগ করা এবং চিংড়ির স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা।

৮। একটি সুস্থ, সবল ও স্বাভাবিক চিংড়ি চিহ্নিত করার উপায়

* শরীরের রং সবুজ এবং পরিষ্কার চকচকে থাকবে।
* পাশুলি পরিষ্কার এবং সম্পূর্ণ থাকবে।
* খোলস নরম হবে না এবং খোলসে দাগ থাকবে না।
* খোলস সহজে ভেঙ্গে যাবে না।
* হ্যাপাটোপেনক্রিয়া স্বাভাবিক আকৃতির এবং হলুদ বর্ণের থাকবে।
* ফুলকা/কানকোর পরিষ্কার এবং রং স্বাভাবিক থাকবে।
* পায়ে কোন কালো দাগ বা ভাঙ্গা থাকবে না।
* বুকের রং কখনও লাল হবে না।
* আচরণ স্বাভাবিক থাকবে এবং দিনের বেলায় ঘুরাফেরা করবে না।
* লেজ মোটা হবে না এবং স্বাভাবিকভাবে স্বচ্ছ থাকবে।
* খাদ্যনালি পূর্ণ থাকবে।
* মাংসপেশী এবং খোলসের মধ্যে কোন ফাঁক থাকবে না।
* খোলসে ময়লা বা শ্যাওলা জমে থাকবে না।

উপসংহার

চিংড়ি চাষের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখা গেলে রোগের সম্ভাবনা কম থাকে। পরিকল্পিতভাবে দক্ষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে চিংড়ি চাষ করতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য এককভাবে একটি খামারের চাষী কোন ব্যবস্থা নিতে পারেন না। সম্মিলিতভাবে চাষীদের স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখার জন্য ব্যবস্থাদি নিতে হবে। রোগ প্রতিরোধের জন্য সরকারের পক্ষ থেকে বিধি প্রণয়ন এবং চিংড়ি চাষীদের মাঝে প্রশিক্ষণের জন্য ব্যাপক কার্যকর ব্যবস্থা ও রোগের বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধি করা গেলে চিংড়ি শিল্পকে রোগের হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

চিংড়ি চাষে পরিবেশ ও সামাজিক সমস্যা এবং তার প্রতিকার

অর্জুন চন্দ্র চন্দ
মোঃ আবুবক্কার সিকদার
মৎস্য অধিদপ্তর

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে বিশেষ করে খুলনা ও সাতক্ষীরা জেলায় নিম্ন ও মধ্যবিত্ত সমাজে যে কথাটি বেশ প্রচলিত আছে তা হলো "ছেলে কোথায়? দুবাই গেছে, কাল আসবে।" বলা প্রয়োজন, এই দুবাই মধ্যপ্রাচ্যের দুবাই নয় বরং বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চল। প্রশ্ন হলো এই অঞ্চলকে দুবাই বলা হচ্ছে কেন? এর কারণ, বিদেশী মুদ্রার সমমানের বা তার চেয়ে বেশী মানের অর্থকরী একটি জিনিষ সংগৃহীত হয় এই অঞ্চলে। বলা বাহুল্য, এই জিনিষটি হচ্ছে চিংড়ির পোনা যা বাংলাদেশের মানুষের কাছে "ডলারের" অর্থবাহী। ডলারের নেশায় বাংলাদেশের মানুষ পাগল হয়ে মধ্যপ্রাচ্যের দেশে রওনা হয়, আর খুলনা, সাতক্ষীরা অঞ্চলের মানুষ ডলারের সন্ধানে যায় সুন্দরবন অঞ্চলের ভিতর-বাহির দিয়ে প্রবাহমান নদী মোহনায় চিংড়ি পোনা ধরার অঞ্চলে। এই চিংড়ি পোনা কিন্তু এ অঞ্চলে অনেক আগে থেকেই ছিল, কিন্তু ছিল না তার ডলার রূপী মূল্যমান। আর এর কারণ জিনিষের অর্থকরী ব্যবহার বা সে সমন্ধে জ্ঞান না থাকা।

বাংলাদেশের আর্থ সামাজিক প্রেক্ষিতে মূল্যবান এবং সম্ভবনাময় চিংড়ি সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার কি আমরা নিশ্চিত করতে পেরেছি? এর উত্তর নঙ অর্থক। "চিংড়ি চাষের ফলে পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি, সামাজিক পরিবেশ বিঘ্নিত, খুন রাহাজানির স্বর্গ" এই সব শিরোনামের সাথে আমরা সবাই কম বেশী পরিচিত। পত্র পত্রিকায় এই সব সংবাদ জনসাধারণের মনে চিংড়ি চাষ সমন্ধে একটা বিরূপ মনোভাবের সৃষ্টি করেছে। বর্তমান প্রবন্ধে আমরা আলোচনা করবো চিংড়ি চাষ সমন্ধে এই সব প্রচারণা কতটা সত্য এবং এ বিষয়ে যদি কোন সমস্যা হয়েও থাকে, তাহলে কোন পথে তার সমাধান সম্ভব।

চিংড়ি চাষে অগ্রযাত্রা–পরিবেশ ও সামাজিক পরিবর্তন

সবুজ বিপ্লবের দশকে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় বিশেষ করে দক্ষিণাঞ্চলের গোল্ডারিং প্রোগ্রাম-এর অধীন নির্মিত বাঁধ-এর ফলে সুন্দরবনের সন্নিহিত বিরাট এলাকা পানির হাত থেকে রক্ষা পায়। বাঁধ নির্মাণের আগে লবণাক্ত পানির প্রভাবে এখানে সুন্দরবনের অনুরূপ গাছ ও লতাপাতা জন্মাছিল। এই বাঁধ এ অঞ্চলের পরিবেশে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধন করে। বাঁধ নির্মাণের পর এ এলাকায় ধান চাষ শুরু হয় এবং এখানে ওখানে জনবসতি গড়ে ওঠে। জনবসতির চার পাশে আম, কাঁঠাল, জাম, পেঁপে, লাউ ইত্যাদি গাছ জন্মানো হয় এবং সেই সংগে নোনা ঝাউ, গড়ান ইত্যাদি গাছ বিলীন হতে থাকে।

আশির দশকে এ এলাকায় চিংড়ি চাষের জন্য বাঁধ-এর মধ্য দিয়ে খাল কেটে লবণাক্ত পানি ভিতরে আনা হয়। ফলে আম, কাঁঠাল, পেঁপে ইত্যাদি গাছ মরে যেতে থাকে এবং ঝাউ, গড়ান, প্রভৃতি গাছ জন্মাতে থাকে। উপরের দুটি ক্ষেত্রেই পরিবেশ লবণাক্ত পানি ও লবণাক্ত পানিহীন অবস্থায় নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়েছে যা প্রকৃতির পক্ষে একান্ত স্বাভাবিক। অথচ কিছুসংখ্যক সাংবাদিক প্রকৃতির এই সহজাত প্রবৃত্তি সম্বন্ধে অজ্ঞানতাবশতঃ মিষ্টি পানির গাছ মরে যাওয়াকে মারাত্মক প্রাকৃতিক বিপর্যরূপে আখ্যায়িত করে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করে।

চিংড়ি চাষের প্রথম দিকে কোন কোন ঘের মালিক অজ্ঞানতাবশতঃ বা খরচ কমানোর উদ্দেশ্যে এমনভাবে ঘের তৈরি করতেন যার ফলে বর্ষাকালে ঘের-এ ব্যবহৃত রাসায়নিক সার ও লবণ ধুয়ে যাবার কোন ব্যবস্থা থাকতো না এবং এর ফলে জমি ধান চাষের অনুপযুক্ত হয়ে পড়তো। কিন্তু বর্তমানে চিংড়ির উন্নত চাষ পদ্ধতির সম্প্রসারণের ফলে জমি দূষিত হবার ঘটনা ঘটে না। একটি সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার অভাবে এখন পর্যন্ত ঘের এলাকায় সকল জমি চিংড়ি চাষের অধীনে আনা সম্ভব হয় নাই। এর ফলে ঘের এলাকায় চিংড়ি ঘের-এর পাশেই দেখা যায় জনবসতি, ধানের ক্ষেত বা ফলের বাগান। ইহাতে একদিকে যেমন বাগান বা ফসলের ক্ষতি হয় অন্যদিকে ঘের-এ অবস্থানকারী কর্মচারী ও নিরাপত্তা রক্ষীদের কারণে বসতবাড়ীর শান্তিও বিঘ্নিত হয়। দক্ষিণাঞ্চলের যে এলাকায় ঘেরগুলির অবস্থান সে অঞ্চলটি দীর্ঘকাল যাবতই সমাজবিরোধী অপরাধীদের লুকিয়ে থাকার আদর্শ স্থান হিসাবে ব্যবহৃত হয়েছে। তদুপরি চিংড়ি চাষের কারণে ও এলাকা হতে কোটি কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রা আয় হলেও সরকারের পক্ষ হতে এ এলাকার শান্তি ও শৃংখলা রক্ষার্থে পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ অপ্রতুল। এমতাবস্থায় এ অঞ্চলে খুন খারাপি এ সমাজ বিরোধী কাজের এক আড্ডাখানায় পরিণত হয়েছে। বর্ষাকালে আমাদের দেশে উপরে বর্ণিত 'ঘের' পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষ করা সম্ভব হয় না। তাই এই সময়ে ধানের জমিতে যেখানে দেখা যায় সবুজ ধানের সমারোহ সেখানে চিংড়ি চাষের জমি থাকে বিরাণ বা পতিত। এই অস্বাভাবিক দৃশ্যটি অধিকাংশ মানুষের মনকেই বিচলিত করে।

চিংড়ি চাষের যৌক্তিকতা

উপরে আমাদের দেশের দক্ষিণাঞ্চলে চিংড়ি চাষের কিছু সমস্যার কথা বর্ণনা করা হয়েছে। এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই পরিস্থিতিতে আমরা কি দেশে চিংড়ি চাষ বর্জন করার কথা চিন্তা করতে পারি? এই বিষয়টি বিবেচনা করতে হলে আমাদেরকে বাংলাদেশের মোট জাতীয় জাতীয় রপ্তানী আয় এবং তাতে চিংড়ির অংশ বিবেচনা করতে হবে। নিচে গত ১৯৯১-৯২ থেকে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত পাঁচ বছরের মোট জাতীয় রপ্তানী আয় এবং জাতীয় রপ্তানী আয়ের মধ্যে চিংড়ি হতে আয়-এর পরিমাণ দেওয়া হল।

অর্থ বছর	মোট জাতীয় রপ্তানীর আয় (হাজার টাকায়)	চিংড়ি রপ্তানী হতে আয় (হাজার টাকায়)	জাতীয় আয়ের মধ্যে চিংড়ির অবদান (শতকরা হারে)
১৯৯১-৯২	৭২,৬২,৬৬,৩৯	৫৩৬,৮৬,২৩	৭.৩৯%
১৯৯২-৯৩	৯৩৬৯,৪৫,৪৯	৬৯২,২১,২৩	৭.৩৯%
১৯৯৩-৯৪	৯৩৮৭,৬৯,৪৯	৮৮৬,৪৯,০৮	৯.৪৪%
১৯৯৪-৯৫	১২৩০৭,৯৬,৪৪	১১৬৭,৬৪,২৪	৯.৪৮%
১৯৯৫-৯৬	১২৭২২,০৪,৭১	১১৬২,০৮,০০	৯.১৩%

উপরের ছক হতে সহজেই বোঝা যায়, চিংড়ি বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের ক্ষেত্রে কি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। চিংড়ি রপ্তানীর ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রকৃত রপ্তানী আয় আরও বেশী এই কারণে যে, অন্যান্য রপ্তানী আয় যে ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিমাণ আমদানী নির্ভর, সে ক্ষেত্রে চিংড়ি খাতে আমদানীজাত অংকের পরিমাণ অতি সামান্য। দেশের অর্থনৈতিক খাতকে সংহত করতে চিংড়ির মতন সুন্দর সম্ভাবনাটি কোনভাবে নষ্ট হউক এটা আমাদের প্রত্যাশা নয়।

চিংড়ি চাষীদের মধ্যে সমস্যা

অনেক খামার মালিক খামার তৈরীর উপযোগীতার ভিত্তিতে অবকাঠামো ও নক্সা সম্বলিত পরিকল্পনা যথা খামারের স্থান, আয়তন, পানির উৎস্য, পানি সরবরাহ ও নিস্কাশন গেট ও খাল, খামার সংলগ্ন বসতবাটি ইত্যাদি বিষয় বিবেচনায় এনে খামার তৈরী করে না। ফলে একই পোল্ডারের মধ্যেই কেউ ঠিকমত পানি পাচ্ছে কেউ পাচ্ছে না, কেউ খারাপ পানি নিস্কাশন করতে পারছে, কেউ পারছে না। কারো খামারে পানির গভীরতা ঠিক থাকছে বা থাকছে না। খামার সংলগ্ন সরকারী খাল কোন কোন বিশেষ ব্যক্তি বা প্রভাবশালী লোকের মাধ্যমে পরিচালিত হচ্ছে। এতে করে অন্যচাষীরা সে খালের সুবিধা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। যে যেরকমভাবে পারে সে সেরকম উপায় তার কাজ করে যাচ্ছে। খামার স্থাপনে যার প্রভাব বেশী সেই যে কোন প্রকারে তাঁদের খামারের আয়তন বৃদ্ধি করছে, কিন্তু অপেক্ষাকৃত অপ্রভাবশালী ও সাধারণ চাষীরা বঞ্চিত হচ্ছে। খামার সংলগ্ন নদী বা খাল থেকে নালিকগণ তাদের চিংড়ি ঘেরে পানি সরবরাহ ও নিস্কাশনের সুযোগ-সুবিধা যথাযথভাবে প্রাপ্য। কিন্তু যেহেতু তাদের মাঝে সঠিক কোন পরিকল্পনা নেই এবং সরকারী পর্যায়ও পানি সরবরাহ ও নিস্কাশনের জন্যে অবকাঠামো (খাল ও গেট ইত্যাদি) নির্মানের নিশ্চয়তা থাকে না, সেহেতু দেখা যায় অনেক এলাকার বেশীর ভাগ খামার থেকে কাংখীত উৎপাদন পাওয়া যাচ্ছে না।

চিংড়ি ঘেরে বিকল্প শষ্য উৎপাদনের সমস্যা

চিংড়ি ঘেরে একাধিক জমির মালিকের জমি থাকে। শর্তমোতাবেক ঘেরের মালিক ধান বা অন্য ফসল উৎপাদনের জন্য জমির মালিক বা বর্গাচাষীর নিকট জমি ফেরৎ দেওয়ার কথা থাকলেও লীজ গ্রহিতা অনেক ক্ষেত্রে সে মোতাবেক কাজ করেন না। যেহেতু চিংড়ির মাছের দাম বেশী এবং প্রভাবশালী সেহেতু তাঁরা যেটা চান সেটাই প্রধান্য পায়।

ঘের থেকে চিংড়ি চুরি/অবৈধ চাঁদা আদায়ের সমস্যা

বিভিন্ন ঘটনার জের হিসাবে ঘের থেকে চিংড়ি চুরি বা চাঁদা আদায়ের ঘটনা একটি নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। অহরহ এধরনের ঘটনা ঘটেই চলছে। প্রতিকার বা প্রতিরোধ করা একটি দূরহ কাজ। বিভিন্ন ঘটনার জের হিসাবে আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতি রক্ষা করা দিনে দিনে কঠিন হয়ে যাচ্ছে।

চিংড়ি খামার এলাকার পরিবেশ সমস্যা

চিংড়ি চাষ এলাকায় চিংড়িচাষীদের সাথে ধানচাষীসহ অন্যান্য চাষীদের একটি বিরোধ দীর্ঘদিন থেকে চলে আসছে। কারণ যে সব যায়গায় এখন চিংড়ি চাষ হচ্ছে সে সমস্ত এলাকায় পূর্বে ধান চাষসহ অন্যান্য ফসল সবজী ও ফল-ফলাদি উৎপন্ন হত। কিন্তু এখন চিংড়ির মূল্য বেশী হওয়ায় অধিকাংশ লোক চিংড়ি চাষে চলে আসছে। যেহেতু অপরিকল্পিতভাবে অনেকটা চিংড়ি চাষ বিস্তারলাভ করছে সেহেতু অধিক মোনাফার জন্য ধানসহ অন্যান্য কৃষিজাত ফসল উৎপন্ন করার প্রতি এলাকার চাষীরা আগ্রহ/অংশ গ্রহণ করছে না। প্রান্তীক অথবা অপেক্ষাকৃত গরীব বর্গাচাষীরা জমির অভাবে না পারছে চিংড়ি চাষ করতে না পারছে ধানসহ অন্যান্য ফসল উৎপাদন করতে। এছাড়াও অপরিকল্পিত চিংড়ি চাষের কারণে লোনা পানির

প্রভাবে শাক-সব্জী, ফল-ফলাদি হচ্ছে না, গরু-ছাগল ঘাস ও খাদ্যের অভাবে ঠিকমত প্রতিপালিত হচ্ছে না। পরিবেশের উপর এরূপ প্রতিক্রিয়ায় সার্বিকভাবে স্থানীয় জনসাধারণের স্বাভাবিক জীবনযাপন অনেকাংশে বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

চিংড়ি চাষ উন্নয়নের ক্ষেত্রে কিছু প্রস্তাবনা

(১) বাংলাদেশে চিংড়ি চাষে বর্তমানে যে সব পদ্ধতি প্রচলিত আছে সেগুলো হলো ঃ (১) সনাতন পদ্ধতি (২) উন্নত সম্প্রসারিত পদ্ধতি (৩) সেমি ইনটেনসিভ বা আধা-নিবিড় পদ্ধতি এবং (৪) ইনটেনসিভ বা নিবিড় পদ্ধতি। এই চার প্রকার পদ্ধতির মধ্যে ২নং এবং ৩নং টি বাংলাদেশের অর্থনীতির প্রকৃত সহায়ক। উৎপাদন কম হওয়ার কারণে সনাতন পদ্ধতি প্রায় বাতিলের পর্যায়ে পৌঁছেছে। নিবিড় পদ্ধতিতে উৎপাদন বেশী হলেও ইহা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও ঝুঁকিপূর্ণ এবং এই বাবদে আমদানী অংশ ও এনার্জির ব্যবহার বেশী বলে প্রকৃত লাভের পরিমাণ কমে যায়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে মারাত্মক পরিবেশ দূষণের সম্ভবনাও রয়েছে। এই পটভূমিতে ২ এবং ৩ নং অর্থাৎ উন্নত সম্প্রসারিত ও আধা-নিবিড় পদ্ধতির উন্নয়ন ও ব্যাপক প্রচলনের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন।

(২) সামাজিক পরিবেশ দূষণের সমস্যার সমাধান এবং আরও বেশী সংখ্যক জমি চিংড়ি চাষের আওতায় আনার জন্য যে সব নদীর পানি ব্যবহার করে চিংড়ি চাষ করা হয় সে সব নদীর উভয় তীরে ২০ থেকে ৩০ মাইল চওড়া জমি শুধুমাত্র চিংড়ি চাষের অধীনে আনা যেতে পারে। এ প্রয়োজনে নদী থেকে একটু পরপর আনুভূমিক রাস্তার মত খাল খনন করা হবে। খাল খননের জন্য রাস্তার মতই জমি অধিগ্রহণ করা হবে এবং তার জন্য মালিককে ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাকী জমির মালিকানা বর্তমান মালিকের হাতেই থাকবে। বসতির সন্নিহিত সুন্দরবনের রিজার্ভ ফরেষ্ট এলাকার নদীর তীর বরাবর সম্ভাব্য স্থানে ৫ মাইল চওড়া এলাকাও বর্তমান অবস্থায় চিংড়ি ঘের চাষীদের কাছে ইজারা দেবার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। প্রসংগতঃ উল্লেখযোগ্য যে, সুন্দরবন ক্রমান্বয়ে দক্ষিণে বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় এই বনের উভয়ের কিয়দংশ সাময়িকভাবে ব্যবহারের দ্বারা দেশ যদি লাভবান হতে পারে তবে তা ব্যবহার করা যুক্তিযুক্ত বলেই মনে হয়।

(৩) চিংড়ি চাষের একটি প্রধান সমস্যা চিংড়ির পোনা। হ্যাচারীতে উৎপাদিত চিংড়ি পোনা পরিবহন জনিত সমস্যা এবং ঘের এর পরিবেশের কারণে খুব একটা বাঁচে না। সুন্দরবন অঞ্চলের নদীসহ উপকূলীয় অন্যান্য এলাকার নদী হতে সংগৃহীত পোনা চিংড়ি চাষে বেশী ব্যবহার করা হয়। বিগত সময়ে আমদানীকৃত পোনাও ব্যবহার করা হয়েছে। যদিও বর্তমানে চিংড়ি পোনা আমদানী নিষিদ্ধ রয়েছে, তবুও চোরাপথে আসা পোনা ঘেরে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে যে সব সমস্যার সৃষ্টি হয়েছে সেগুলো হলো ঃ

(ক) বিদেশ থেকে আসা চিংড়ি পোনা প্রায়ই ভাইরাস জনিত অসুখে আক্রান্ত হয়ে ঘের-এর সর্বনাশ করে থাকে।

(খ) পোনা সংগ্রহ করতে গিয়ে প্রতি বছর অসংখ্য মানুষের প্রধানতঃ হাওড়-এর কারণে দুর্ঘটনা এবং মৃত্যুর শিকার হয়।

(গ) চিংড়ি পোনা আহরণের লক্ষ্যে প্রতিদিন অসংখ্য মানুষ সুন্দরবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে, ফলে সুন্দর বনের স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত এবং উন্নয়ন ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

(ঘ) সুন্দরবনের নদী হতে পোনা সংগ্রহকালে অনেকে বাঘের আক্রমণের স্বীকার হয়।

(ঙ) চিংড়ি পোনা সংগ্রহ করতে গিয়ে অন্যান্য মাছের পোনা মেরে ফেলা হয় এবং এর ফলে ইতিমধ্যেই দক্ষিণাঞ্চলে মাছের অভাব দেখা দিয়েছে।

এই অবস্থায় প্রস্তাব হলো হ্যাচারীতে উৎপন্ন পোনা 'প্রিনার্সিং'-এর মাধ্যমে ঘের-এর পরিবেশে সহনোপযোগী করা হলে সমস্যাটির সমাধান হবে। চিংড়ি পোনা আহরণকারী দরিদ্র মানুষদেরকে এবং ঘেরের চিংড়ি চাষীদেরকে সূক্ষ্ম ছিদ্র বিশিষ্ট এবং নদীর জল সহনীয় কেইজ বা খাঁচা সরবরাহ করা হলে এই কেইজ নদীতে রেখে তারা নিজেরা চিংড়ি পোনা 'প্রিনার্সিং" এর ব্যবস্থা করতে পারবে। এর ফলে একদিকে যেমন সম্ভাব্য বেকার সমস্যার সমাধান হবে অন্যদিকে পোনা সহজলভ্য হবে এবং সুন্দরবনের অভ্যন্তরে লোকের প্রবেশ বন্ধ হবে।

(৪) চিংড়ি প্রক্রিয়া জাতকরণের বিষয়ে আমাদের দেশ প্রায়ই সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ বিষয়ে সাধারণ অভিজ্ঞতা এই যে, আন্তর্জাতিক সংস্থাসমূহ এ বিষয়ে বিভিন্ন শর্ত আরোপ করে, ব্যক্তিমালিকানাধীন কোম্পানীগুলি কখনও কখনও তা পালন করে, কখনও ভংগ করে এবং প্রাথমিক শর্তগুলি পালন করা হলে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি নতুনতর শর্ত আরোপ করে থাকে। সমগ্র ব্যাপারটি কখনও কখনও অনেকের কাছে রহস্যময় মনে হয়। আবার কখনও কখনও চিংড়ি চাষে পরিবেশ দূষণ হচ্ছে ধুয়া তুলে আমাদের দেশের দু-একটি বেসরকারী সংস্থার প্রতিনিধি চিংড়ি চাষ সম্প্রসারণে বাধার সৃষ্টি করছে, যা দেশের অর্থনীতির জন্য মঙ্গলময় নয়।

এই প্রসংগে যা নির্মম সত্য তা হলো, মুক্তবাজার অর্থনীতিতে উন্নতদেশসমূহ উন্নয়নশীল দেশসমূহের পণ্য প্রবাহ এবং পণ্যমূল্য নিয়ন্ত্রণের জন্য "মানবাধিকার লংঘন, শিশুশ্রম ব্যবহার, নারীদের শোষণ" ইত্যাদি নানা অজুহাতের সাথে অগ্রহণযোগ্য পরিবেশকেও ব্যবহার করে থাকে এবং পরিবেশের নিত্য নতুন সংজ্ঞা তৈরী করে নিজেদের স্বার্থ রক্ষা করে। উন্নত দেশসমূহের এ ধরনের আচরণ আমাদের দেশের ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানসমূহ প্রতিহত করতে পারবে বলে মনে হয় না। এ বিষয়ে সরকারকেই এগিয়ে আসতে হবে এবং আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক জোটের মাধ্যমে দেশের স্বার্থ রক্ষার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

পরিবেশ ও সামাজিক দিকগতভাবে চিংড়ি চাষের সমস্যা সমাধানের সুপারিশ

বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ঘের পদ্ধতিতে চিংড়ি চাষের কিছু কিছু সমস্যার কথা ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে। সৌভাগ্যের বিষয় এই সমস্যাগুলির কোনটিই তেমন মারাত্মক

নয়, আর সমাধানের অতীততো নয়ই বরং অনেকগুলি শুধুমাত্র প্রচারণার ফসল।

চিংড়ি চাষের ফলে জমি নষ্ট হওয়া এখন অতীতের কাহিনী এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ নষ্ট হওয়ার কাহিনী পরিবেশ বিজ্ঞান বিষয়ে অজ্ঞ ব্যক্তিদের প্রচারণা মাত্র। অত্যন্ত লাভজনক চিংড়ি উৎপাদনের পর বর্ষাকালে ঐ জমি বিরাণ দেখে মন খারাপ করা সাধারণ মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক, যদিও ব্যাপারটি তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়।

চিংড়ি চাষের এলাকা থেকে জনবসতি সরিয়ে না নিলে এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা না হলে সামাজিক পরিবেশ যে দুষিত হবে তা বলাই বাহুল্য। এ ব্যাপারে তাই সরকারের উচিত বাংলাদেশের অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য অবদান রক্ষাকারী চিংড়ি চাষকে সকল সমস্যা মুক্ত করার জন্য কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা। সমস্যার সমাধানকল্পে কতিপয় প্রস্তাবনা নিম্নে বিধৃত করা হলো ঃ

(ক) সরকারী পর্যায়ে চিংড়ি চাষের জন্য উপকূলীয় এলাকার উপযুক্ত পানির নদীর উভয় তীরের ২০ থেকে ৩০ মাইল চওড়া জমিকে নির্দিষ্ট করে শুধুমাত্র চিংড়ি চাষের জন্য ঘোষণা করে ইহার অবকাঠামোগত উন্নয়ন সাধন। এক্ষেত্রে খালসহ অন্যান্য অবকাঠামো উন্নয়নে যে জমির প্রয়োজন হবে, তার ক্ষতিপূরণ জমির মালিককে প্রদান করতে হবে।

(খ) চিংড়ি ও ধান চাষ বিরোধপূর্ণ পোল্ডারের ভিতরের জমিতে চিংড়ি ও ধান চাষ সু-সমন্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারী সংস্থার সমন্বয়ে যৌথ সমীক্ষা পরিচালনা পূর্বক চিংড়ি ও ধান চাষের জমি চিহ্নিতকরণ।

(গ) চিংড়ি চাষ এলাকায় শান্তি-শৃংখলা বজায় রাখার জন্য আইন-শৃংখলা বিভাগের ষ্টেশন, আউট পোষ্ট ইত্যাদি যেখানে প্রয়োজনীয়, সেখানেই স্থাপন।

(ঘ) দক্ষিণাঞ্চলের যে সকল এলাকায় চিংড়ি চাষের আধিক্য বেশী, সে সকল চিংড়ি চাষ এলাকার গৃহস্থ পরিবারগুলিকে বিকল্প স্থানে বসবাসের জন্য নতুন বসতি স্থাপনের ব্যবস্থাকরণ।

(ঙ) চিংড়ি চাষ ঘেরের পাশের জমিতে ধান চাষ না করে অধিকতর লাভের.চিংড়ি চাষ করার ব্যবস্থা গ্রহণ।

(চ) ঘের হতে চিংড়ি আহরণ এবং বিপণন সময়ে নিরাপত্তার ব্যবস্থাকরণ।

(ছ) প্রভাবশালী লোকদের দাপটে যাতে সাধারণ চিংড়ি চাষীরা ক্ষতিগ্রস্থ না হয়, সে বিষয়ে প্রভাবশালী ও অপ্রভাবশালী চাষীদের মধ্যে সু-সম্পর্ক স্থাপনের জাগরণ সৃষ্টির প্রয়াশ গ্রহণ।

(জ) একই পোল্ডারের মধ্যের সকল খামার মালিকদের পরস্পর সু-সম্পর্ক রেখে যথাযথ পরিকল্পনার ভিত্তিত্বে খামার স্থাপন নিশ্চিতকরণ।

(ঝ) সরকারীভাবে চিংড়ি চাষের সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে চিংড়ি চাষ এলাকার বিদ্যমান সুযোগ সুবিধা প্রয়োজনে পরিবর্দ্ধন পরিবর্তনপূর্বক অবকাঠামোগত স্থাপনাদী নির্মাণ নিশ্চিতকরণ।

(ঞ) যে পণ্যটি দেশ ও সমাজের সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হিসেবে আত্মপ্রকাশরত, পরিবেশ দূষণের ধুয়া তুলে সে পণ্যটিকে নিয়ে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক চক্রান্ত প্রতিরোধের লক্ষ্যে জন সচেতনতা সৃষ্টিকরণ।

উপসংহার

আমেরিকার বিখ্যাত কৃষি বিজ্ঞানী "জর্জ ওয়াশিংটন কারভার" একবার উল্লেখ করেছিলেন যে, দুটি রেল ষ্টেশনের মধ্যে রাস্তার পাশে তিনি যে সব খাবারপোযোগী বৃক্ষ লতাদি দেখেছেন, তা দিয়ে একটি ছোট সৈন্য বাহিনীর খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব"। একথা যখন তিনি বলেছিলেন তার কিছুদিন পূর্বে আমেরিকার ঐ এলাকায় খাদ্যাভাবে দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল এবং তাতে অনেক লোকের মৃত্যু হয়। এর সরল অর্থ হচ্ছে, ব্যবহার জানা না থাকলে খাবার ঘরে থাকতে ও মানুষ না খেয়ে মরে। চিংড়ি বাংলাদেশের জন্য এমনই সম্ভাবনাপূর্ণ এবং সেই সংগে কিছুটা রহস্যময় এক ফসল। এই ফসলটি নিয়ে দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক চক্রান্তের কিছুমাত্র কমতি নেই। এই অবস্থায় চিংড়ি চাষের দরুন উদ্ভূত নানাবিধ পরিবেশ ও সামাজিকগত বিভিন্ন সমস্যা শুধু সাধারণ জ্ঞান দিয়ে নয় বরং দেশী এবং আন্তর্জাতিক সম্ভাব্য ষড়যন্ত্রের প্রেক্ষাপটে বিচার করে তদানুযায়ী উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করেই করতে হবে।

কাঁক্‌ড়া চাষ ব্যবস্থাপনা

হাবিবুর রহমান খন্দকার
মোঃ রেজাউল করিম
মৎস্য অধিদপ্তর

কাঁক্‌ড়া আর্থোপোড শ্রেণীর শক্ত খোলসবিশিষ্ট জলজ প্রাণী। প্রজাতিভিত্তিক মিঠা ও লোনা পানির উভয় পরিবেশে কাঁক্‌ড়া পাওয়া যায়। মিঠা পানিতে চার প্রজাতির এবং লোনা পানিতে এগার প্রজাতির কাঁক্‌ড়া রয়েছে। মিঠা পানির কাঁক্‌ড়া আকারে ছোট এবং লোনা পানির কাঁক্‌ড়া আকারে বেশ বড় হয়। লোনা পানির কাঁক্‌ড়া সমুদ্রে বসবাস করে। মিঠা পানির কাঁক্‌ড়া বিদেশে রপ্তানী হয় না। সামুদ্রিক বড় আকারের কাঁক্‌ড়া বিদেশে রপ্তানী হয়। তাছাড়া সামুদ্রিক এগার প্রজাতির কাঁক্‌ড়ার মধ্যে একমাত্র "শিলা" কাঁক্‌ড়া রপ্তানী হয়। ইহার বৈজ্ঞানিক নাম সাইলা সিরেটা (Seylla Serrata) । অনেক স্থানে ইহা ম্যাডক্র্যাব নামে পরিচিত। বিদেশে শিলা কাঁক্‌ড়ার মাংসই প্রিয় খাদ্য। বাংলাদেশে সর্বত্র সকল শ্রেণীর লোকের কাছে কাঁক্‌ড়া অতি পরিচিত প্রাণী। কাঁক্‌ড়া মৎস্য সম্পদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। স্থানীয়ভাবে বৃহত্তর জনগোষ্ঠি খাদ্য হিসাবে কাঁক্‌ড়া গ্রহণ না করলেও বিদেশে রপ্তানী করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসহ ইউরোপ মহাদেশেও কাঁক্‌ড়ার চাহিদা রয়েছে। বাংলাদেশ বছরে প্রায় ১৪ কোটি টাকার কাঁক্‌ড়া বিদেশে রপ্তানী করে থাকে। বিশ্ব বাজারে কাঁক্‌ড়ার চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায় ইহার সংগ্রহ প্রক্রিয়া যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছে। পাশাপাশি কাঁক্‌ড়ার চাষ পদ্ধতির কলাকৌশল সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা শুরু হয়েছে। তবে কাঁক্‌ড়া চাষ প্রক্রিয়া আজও প্রাথমিক পর্যায়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষাধীন আছে। বর্তমান রপ্তানীকৃত কাঁক্‌ড়ার প্রায় সবটাই উপকূলীয় চিংড়ি খামার, সমুদ্রের মোহনা, নদী এবং ম্যানগ্রোভ বনাঞ্চল থেকে আহরণ করা হয়ে থাকে।

পরিচিতি ও বিস্তৃতি

কাঁক্‌ড়া বা ম্যাডক্রাভ আফ্রিকার পূর্ব উপকূল, ভারত উপকূল এবং ইন্দোপেসিফিক অঞ্চলের ম্যানগ্রোভ এলাকায় দেখা যায়। এই কাঁক্‌ড়ার চক্ষুপুঞ্জের দুই পার্শ্বে Carapace এর উপরে নয়টি দাঁত রয়েছে যা Serrations বলা হয়। এই "সিরাসনঃ এর সংখ্যা দিয়ে কিশোর কাঁক্‌ড়া চেনা যায়। বাংলাদেশে উপকূলীয় অঞ্চলের প্রায় সর্বত্র কাঁক্‌ড়া পাওয়া যায়। কাঁক্‌ড়ার বয়স সাধারণতঃ ১৬-১৮ মাসের হলেই পূর্ণবয়স্ক বা প্রজননক্ষম হয়। এ সময় একটি কাঁক্‌ড়ার ওজন হয় ৩০০-৫০০ গ্রাম। একটি কাঁক্‌ড়া সর্বোচ্চ ৫ কেজি পর্যন্ত ওজনের পাওয়া গেছে। সাধারণতঃ এক বছর বয়সের কাঁক্‌ড়ার ওজন ৪০০ গ্রাম - ৫০০ গ্রাম হয়ে থাকে। বাগদা চিংড়ির ন্যায় স্ত্রী কাঁক্‌ড়া গভীর সমুদ্রে "নউপ্লি" ছেড়ে থাকে যা পরবর্তিতে পাঁচটি লার্ভা স্তর (Zoea) পার হয়ে "ম্যাগালোপা" (Megalopa) ও পোষ্ট লার্ভা স্তরে উপনীত হয়। এরা জোয়ার, ঢেউ ও বাতাসে উপকূলীয় ম্যানগ্রোভ এলাকায় ভেসে আসে এবং কিশোর (Juvenile) স্তরে উপনীত হয়। একটি স্ত্রী কাঁক্‌ড়া ১-৮ মিলিয়ন ডিম দিতে পারে। বাগদা চিংড়ির ন্যায় কাঁক্‌ড়ার খোলস রয়েছে যা চিংড়ির চেয়ে অপেক্ষাকৃত শক্ত এবং দৈহিক বৃদ্ধির জন্য কাঁক্‌ড়া খোলস পরিবর্তন করে থাকে। কাঁক্‌ড়ার নিজ প্রজাতি ভক্ষণ প্রবণতা রয়েছে এবং এর শক্ত সারসী বা চিমটা দ্বারা সহজে অন্য প্রাণীকে মেরে ফেলতে পারে।

কাঁক্‌ড়া মাটিতে এবং বাঁধে গর্ত করতে পছন্দ করে। ডুবন্ত গাছের শেঁকড় ও ডালপালায় এরা আশ্রয় নেয়। তাই ম্যানগ্রোভ এলাকায় এদেরকে পাওয় যায়। পানি ছাড়া কাঁক্‌ড়া দীর্ঘ সময় বাঁচতে পারে এবং হেঁটে এক স্থান থেকে সহজে অন্য স্থানে চলে যেতে পারে।

কাঁক্‌ড়া চাষের প্রধান সুবিধাসমূহ

* বাংলাদেশের উপকূল অঞ্চলের চাষের পরিবেশ বিদ্যমান।
* আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা থাকায় এর উৎপাদন লাভজনক।
* বর্তমানে বাংলাদেশে প্রাকৃতিক পোনা (কিশোর) পাওয়া যায়।
* কাঁক্‌ড়ার খাবার স্বল্পমূল্যে সংগ্রহ সম্ভব।
* ওজন হিসাবে কাঁক্‌ড়ার বৃদ্ধি হার বেশী।
* কাঁক্‌ড়া রপ্তানীর মাধ্যমে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন করা যায়।
* কাঁক্‌ড়া পানি ব্যতিত অনেকক্ষণ বেঁচে থাকতে পারে এবং প্রতিকূল পরিবেশ সহ্য করতে পারে।
* পচা আবর্জনা খেয়ে পরিবেশ বিশুদ্ধ করে।

কাঁক্‌ড়া চাষের উপযুক্ত পরিবেশ

বাগদা চিংড়ির ন্যায় কাঁক্‌ড়া উপকূল লবনাক্ত পানিতে চাষ করা যায়। কাঁক্‌ড়া চাষের মাটি ও পানির গুনাবলী নিম্নরূপ হওয়া বাঞ্চনীয়।

মাটির গুণাবলী

(ক) নরম দোঁয়াশ বা এঁটেল মাটি।
(খ) হাইড্রোজেন সালফাইট ও এ্যামুনিয়া গ্যাসমুক্ত মাটি।
(গ) জৈব পদার্থ ৭% - ১২%
(ঘ) এসিড সালফেট মুক্ত মাটি।
(ঙ) হালকা শ্যাওলা ও জলজ্ আগাছাযুক্ত পরিবেশ।

পানির গুণাবলী

(ক) লবণাক্ততা ঃ ১০-২৫ পিপিটি।
(খ) তাপমাত্রা ঃ ২৫-৩২°C
(গ) পি এইচ ঃ ৭.৫-৮.৫
(ঘ) এ্যালকালিনিটি ঃ > ৮০ মিগ্রা/লিঃ
(ঙ) হার্ডনেস্ ঃ ৪০-১০০ পি পি এম।
(চ) দ্রবীভূত অক্সিজেন ঃ ৪ পি পি এম এর উর্ধ্বে।

কাঁকড়া চাষের স্থান নির্বাচন

সাধারণভাবে বাগদা চিংড়ির চাষের উপযুক্ত স্থানে সহজেই কাঁকড়া চাষ করা যায়। কাঁকড়ার খামার বা পুকুরে প্রতিনিয়ত লবণাক্ত পানি পরিবর্তনের যথেষ্ট সুযোগ থাকতে হবে। বছরে ৮-১০ মাস ৫ পিপিটির উর্ধ্বে লবণাক্ততা থাকে এরূপ স্থান কাঁকড়া চাষের উপযোগী। কাঁকড়ার চাষ এলাকা বন্য প্রাণী ও পাখিমুক্ত থাকতে হবে।

কাঁকড়া চাষের পুকুর নির্মাণ

বাগদা চিংড়ি চাষের পুকুরের ন্যায় কাঁকড়ার পুকুরের পানি ধারণের জন্য শক্ত বাঁধ নির্মাণ করতে হবে। কাঁকড়া হেঁটে বেড়াতে অভ্যস্ত। তাছাড়া মাটিতে গর্ত করে লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। তাই বাঁধের অভ্যন্তরে বেড়া স্থাপন করা আবশ্যক। বেড়ার উচ্চতা পানির উপরে ০.৫ মিটার রাখতে হবে। পুকুরের অভ্যন্তরে এই বেড়া বাঁশের ঘন পাটা, গাছের ঘন কঞ্চির বুনন, সিমেন্ট দেয়াল বা এ্যাসবেসটাস দ্বারা তৈরী করা যায়। এই বেড়া কমপক্ষে ০.৫ মিটার মাটির নীচে বসিয়ে দিতে হবে যেন কাঁকড়া বেড়ার নিচ দিয়ে গর্ত করে পালিয়ে যেতে পারে। এছাড়া বেড়ার বুনন এমন ঘন হতে হবে যেন কিশোর কাঁকড়া ফাঁক দিয়ে পালিয়ে যেতে না পারে এবং অন্য ক্ষতিকর প্রাণী কাঁকড়ার পুকুরে প্রবেশ করতে না পারে। পুকুর শুকানো এবং পানি সরবরাহের ব্যবস্থা থাকতে হবে। বাগদা চিংড়ির ন্যায় গেট বা বাক্স নির্মাণ করে পানি সঞ্চালনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। পুকুরের আয়তন ০.২-১.০ হেঃ হলে ব্যবস্থাপনার সুবিধা হয়। পুকুরের গভীরতা ১.০-১.৫ মিটার রাখা ভাল।

পুকুর প্রস্তুতি

(ক) শুকানো ও ধৌত করণ

বাগদা চিংড়ির পুকুরের ন্যায় চাষ এলাকার মাটি শুকাতে হবে। শুকাবার পরে মাটির উপরের অম্ল, লবন, বিষাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য পুকুরের তলদেশ ধৌত করতে হবে। পানি তুলে পুনরায় একদিন পর পানি ছেড়ে ধৌত প্রক্রিয়া সমাধা করা যায়। পুকুরের তলদেশ চাষ দেয়ার প্রয়োজন হলে চাষ দেয়ার পর একই নিয়মে তা পুনরায় ধৌত করতে হবে।

(খ) চুন প্রয়োগ

হেক্টর প্রতি সাধারণত ৩০০-৮০০ কেজি CaO (কলিচুন) চাষ পূর্ব মাটিতে এবং বোঁধে দিতে হবে। মাটির পি,এইচ নির্ধারণপূর্বক চুন প্রয়োগ করা উচিত। মাটির পি,এইচ এর ভিত্তিতে নিমোক্ত হারে চুন দেয়া যায়।

মাটির পি এইচ	চুন প্রয়োগের পরিমাণ (টেন/হেক্টর)	
	কৃষি চুন বা ডলোমাইটা	কলিচুন
> ৬.০	১-২	০৫-১.০
৫.০-৬.০	২.-৩	১.০-১.৫
< ৫.০	৩.৫	১.৫-২.৫

(গ) আশ্রয় স্থল সৃষ্টি

কাঁকড়া খোলস ছাড়ার সময় জলজ প্রাণীর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য লুকিয়ে থাকতে পছন্দ করে। প্রকৃতিতে "ম্যানগ্রোভ" গাছের শিকড়ের আড়ালে এরা আশ্রয় নেয়। চাষ পুকুরে বাঁশের কঞ্চি দ্বারা আশ্রয় স্থল তৈরী করা যায়। তাছাড়া সিমেন্টের পাইপ বা পিভিসি পাইপের টুকরাও ব্যবহার করা যায়। সাধারণতঃ ৪´-৬´ ব্যাসের পাইপ ব্যবহার করা যায়। পাইপের ব্যাস বিভিন্ন সাইজের হলে ছোট বড় কাঁকড়া তাদের পছন্দ মত স্থানে আশ্রয় নিতে পারে। পুকুরের তলদেশে এবং অভ্যন্তরে বেড়ার পার্শ্বে এই আশ্রয় স্থল স্থাপন করা যায়। পচনশীল দ্রব্য আশ্রয়ের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।

পুকুরে পানি উত্তোলন ও সার প্রয়োগ

চিংড়ি চাষের ন্যায় কাঁকড়ার চাষ এলাকায় অন্য পানির অনুপ্রবেশ রোধ করার জন্য সবসময় ০.২৫ মিঃমিঃ ছিদ্রযুক্ত নাইলন জাল দিয়ে পানি ছেকে তুলতে হবে। প্রথমবার ৩০ সেঃ মি পানি পুকুরে উঠিয়ে পানিতে জৈব সার ও রাসায়নিক সার প্রয়োগ করা যায়। পানিতে সার একত্রে সব না দিয়ে কয়েক ভাগে ভাগ করে প্রয়োগ করা হলে সারের সুষ্ঠু ব্যবহার করা যায়। যা আর্থিকভাবেও লাভজনক। হেক্টর প্রতি ৫০০ কেঃজি জৈব সার, ১৫ কেজি টি এসপি এবং ১০ কেজি ইউরিয়া সার পানিতে গুলে সর্বত্র ছিটিয়ে দিতে হবে। পানির রং এবং ফাইটোপ্লাংকটনের উৎপাদনের পরিমাণ অনুযায়ী মাত্রা অনুসারে সার প্রয়োগ করতে হবে। সার প্রয়োগের পাশাপাশি ক্রমান্বয়ে পানির গভীরতা বৃদ্ধি করতে হবে এবং পানির গভীরতা ১ মিটারের মধ্যে থাকা বাঞ্ছনীয়। পানিতে উৎপাদিত ফাইটোপ্লাক্টন কাঁকড়ার খাদ্য উপাদান বৃদ্ধিতে সহায়তার পাশাপাশি পুকুরের তলায় ছায়া দেয়। কাঁকড়া সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না এবং ছায়া পছন্দ করে। এছাড়া প্লাংকটন পানির গুণাগুণ সঠিক মাত্রায় রাখতে সাহায্য করে ও বিষাক্ত পদার্থ অপসারণে সহায়তা করে।

কাঁকড়া মজুদকরন

বর্তমানে কাঁকড়া চাষ বলতে কাঁকড়া মোটা তাজা করাকেই বুঝায়। কিশোর কাঁকড়া বাঁশের চাই বা ফাদ, পাতা জাল, থলে জাল দিয়ে ধরা যায়। ২০-৪০ গ্রাম ওজনের ৮-১০ হাজার কাঁকড়া প্রতি হেক্টরে মজুত করা যায়। স্ত্রী কাঁকড়ার চাষ বেশী লাভজনক। তাই স্ত্রী ও পুরুষের অনুপাত ৯:১ বা ৯০% স্ত্রী ১০% পুরুষ মজুদ করা হলে ভালো হয়। কিশোর স্ত্রী ও পুরুষ কাঁকড়া সহজে কাঁকড়ার চিমটা পা ও বুকের ফ্ল্যাপ দেখে সনাক্ত করা যায়। পুরুষ কাঁকড়ার চিমটা পা বড়, স্ত্রী কাঁকড়ার চিমটা পা একই বয়সের পুরুষ কাঁকড়ার চেয়ে ছোট। স্ত্রী কাঁকড়ার বুকের ফ্লাপটি অর্ধ গোলাকার অন্য দিকে পুরুষ কাঁকড়ার ফ্ল্যাপটি অপেক্ষাকৃত সরু ও ইংরেজী ভি আকৃতির। একই বয়সের কাঁকড়া একত্রে সংগ্রহ করা অত্যন্ত কঠিন। তাই ওজন ভিত্তিতে কাছাকাছি ওজনের কাঁকড়া

মজুদ করা হলে চাষকালীন পরিচর্যায় সুবিধা হয়। কিশোর কাঁকড়া একস্থান হতে অন্য স্থানে বাঁশের ঝুড়িতে পরিবহন করা যায়। রপ্তানির জন্য গুনাড বিশিষ্ট স্ত্রী কাঁকড়াগুলো সনাক্ত করা হয়। আহরনের পর যে সমস্ত স্ত্রী কাঁকড়া গোনাড/ডিম্বাশয়বিহীন অবস্থায় পাওয়া যায় সেগুলোকে স্থানীয়ভাষায় খোসা কাঁকড়া বলা হয়। এই খোসা কাঁকড়া বা নরম খোলস বিশিষ্ট কাঁকড়া নির্দ্ধারিত পুকুরে ১৫-২০ দিন রেখে উপযুক্ত খাবার দেওয়া হয়। ইহাকে কাঁকড়া ফেটেনিং বলা হয়। কাঁকড়া ফেটেনিং পদ্ধতি অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে।

খাবার সরবরাহ

কাঁকড়া সর্বভূক। এরা সাধারণতঃ জীবন্ত খাদ্য খেতে পছন্দ করে। ছোট ছোট মাছ, সামুদ্রিক ক্রিমি, শামুক, ঝিনুক, কীট পতঙ্গ খেয়ে থাকে। তবে ময়লা ও পচা জৈব পদার্থ জাতীয় খাবারও এরা খায়। খাদ্য হিসাবে ছোট গুড়া মাছ, শামুক, ঝিনুকের মাংস, চিংড়ি ও চিংড়ির মাথা, বিভিন্ন প্রকার দেহাবশেষ ইত্যাদি ব্যবহার করা যায়। কাঁকড়ার খোলস তৈরীর জন্য ক্যালসিয়াম সমৃদ্ধ খাদ্য প্রয়োজন। তাই মাংসের হাড় বা কাঁটাও কাঁকড়া খেয়ে থাকে। এছড়া চালের কুড়া, গমের ভুষি, আটা, ফিস মিল ইত্যাদি মিশ্রণপূর্বক কাঁকড়ার খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করা যায়। কাঁকড়া দেহের বৃদ্ধির সাথে সাথে খাদ্য চাহিদা বৃদ্ধি পায়। ট্রেতে খাবার দিয়ে খাদ্য গ্রহণের প্রবণতা পর্যবেক্ষণ পূর্বক খাবার সরবরাহ নিয়ন্ত্রণ রাখতে হবে। কাঁকড়া বাগদা চিংড়ির ন্যায় নিশাচর প্রাণী। তাই বিকালে বা সন্ধ্যায় ও রাতে প্রত্যহ ২-৩ বার খাবার দিতে হয়।

পানি ব্যবস্থাপনা

অমাবস্যা ও পূর্নিমায় জোয়ার -ভাটার প্রভাবে কাঁকড়ার পুকুরের পানি পরিবর্তন করা যায়। পানির গুণাগুণ রক্ষার জন্য নিয়মিত চুন ($CaCO_3$) ও সার প্রয়োগ করতে হবে। কোন কারণে প্লাংকটন মারা গেলে কিংবা পানি দূষিত হলে সাথে সাথে পানি পরিবর্তনের ব্যবস্থা নিতে হবে। কাঁকড়া উপযুক্ত পরিবেশ না পেলে অন্যত্র বের হয়ে যায়। কাঁকড়া শক্ত প্রাণী বটে কিন্তু পরিবেশের তারতম্যে বা পানি দূষিত হওয়ার কারণে এরা মারা যায় এবং উৎপাদন ব্যাহত হয়।

কাঁকড়া আহরণ ও বাজারজাতকরণ

মজুদের ৩-৪ মাস পর কাঁকড়া আহরণ করা যায়। বাংলাদেশে সবচেয়ে চাষের উপযুক্ত সময় মার্চ থেকে জুলাই মাস পর্যন্ত। এ সময় পানির গুণাগুণ ও তাপমাত্রা উপযুক্ত পর্যায়ে থাকে। কাঁকড়া ধরার জন্য বাঁশের চাই অথবা জালের তৈরী ফাঁদ সবচেয়ে উপযুক্ত। ধরার সময় কাঁকড়ার পা ভেঙ্গে গেলে বাজারজাত করা যায় না। লিফ্‌ট নেট বা চাই ফাঁদে খাবার দিয়ে কাঁকড়া পর্যায়ক্রমে ধরা যায়। কাঁকড়া ধরার আগেই পুকুরে খাবার সরবরাহ বন্ধ রাখতে হবে।

কাঁকড়া একপাত্র থেকে অন্য পাত্রে নেয়া বা রাখার সময় বাঁশের চিমটা এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে যেন পা ভেঙ্গে না যায়। কাঁকড়াকে পিছন দিয়ে চিমটা বা হাত দিয়ে ধরা যায়। বর্তমানে জীবন্ত কাঁকড়া বিদেশে রপ্তানী হয়ে থাকে। তাই কাঁকড়া চিমটা বা প্লাসটিকের ফিতা দিয়ে ভালোভাবে বেঁধে ঝুড়িতে ভর্তি করে বাজারজাত করা যায়। পরিবহনের সময় ঝুড়িতে শ্যাত শ্যাতে ভাব বজায় রাখার জন্য লবন পানি ছিটিয়ে দিতে হয়। কাঁকড়ার ঝুড়ি অন্ধকার/ছায়াযুক্ত ঠান্ডা স্থানে রাখতে হয়। বাংলাদেশ থেকে এখনও সিদ্ধ করা অথবা হিমায়িত কাঁকড়া বিদেশের বাজরে বাজারজাত করা হয় না। যদি ঐ অবস্থায় রপ্তানী করা যেত তবে পরিবহন খরচ অনেক কম হত।

উপসংহার

কাঁকড়া চাষের উপযুক্ত পরিবেশ আমাদের দেশের উপকূল অঞ্চলে রয়েছে। যদিও এর চাষ এখনও তেমন প্রসার লাভ করে নাই। কাঁকড়ার রপ্তানী বাজারদর হিসাবে এর চাষ বেশ লাভজনক। সঠিকভাবে চাষ করা গেলে বর্তমান হিসাবে প্রতি কেজিতে ৬০ টাকারও বেশী নীট লাভ করা যায়। কাঁকড়াও একটি চাষযোগ্য প্রাণী এবং এর উৎপাদন একটি লাভজনক বিনিয়োগ। এ বিষয়টি প্রদর্শনের জন্য দেশে কাঁকড়া খামার স্থাপিত হওয়া প্রয়োজন। পাশাপাশি এ বিষয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা সরকারী পর্যায়ে করতে হবে। বর্তমানে জীবন্ত কাঁকড়া রপ্তানীর জন্য পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের ছাড়পত্র প্রয়োজন হয়। কাঁকড়া চাষ এবং উৎপাদনকে উৎসাহিত করার জন্য এ দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের উপর ন্যাস্ত করতে হবে। উপকূলীয় এলাকার পানি উন্নয়ন বোর্ডের বরোপিট এলাকায় পরিকল্পিত কাঁকড়া চাষ করে জমির সুষ্ঠ ব্যবহার করা যায়। কাঁকড়ার বাচ্চা সরবরাহ নিশ্চিতঃ করণের জন্য সুন্দরবনের অভ্যন্তরীণ খালসমুহে বেহুন্দী জাল ব্যবহার বন্ধ রাখতে হবে। পরিকল্পিত ব্যবস্থাপনা ও আইন প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাঁকড়া সম্পদ বৃদ্ধি পাবে বলে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রত্যাশা।

আর্টিমিয়া চাষ প্রযুক্তি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ

অধ্যাপক আবদুল মালেক ভুঁইয়া
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

আর্টিমিয়া (Artemia) এক ধরনের ক্ষুদ্র অনুজীব যা জলে বাস করে। এরা ক্রাষ্টিশিয়া শ্রেণীভুক্ত প্ল্যাংকটন (জুপ্ল্যাংকটন) জাতীয় প্রাণী সাধারণত "ব্রাইন শ্রীম্প" নামেই পরিচিত। এ সকল প্রাণীরা লবণাক্ত বদ্ধ জলাশয় যা সমুদ্র থেকে বাঁধের ফলে আলাদা হয়ে গেছে ঐ সকল হ্রদ বা ডোবা জাতীয় পানিতে বাস করে। ক্লোরিন, সালফেট বা কার্বনেট সমৃদ্ধ পানিতে এদেরকে বেশী পাওয়া যায়। অতিরিক্ত লবণাক্ততা এরা পছন্দ করে না বলে সাধারণত মাধ্যমিক লবণাক্ত পানিতে এরা ভাল জন্মায়। যেখানে লবণাক্তাতার পরিমাণ ১০০ পিপিটি থেকে ২৫০ পিপিটি পর্যন্ত তারতম্য হয়। যদিও এরা ২৫০ পিপিটি সহ্য করতে পারে কিন্তু তাদের প্রজনন ১০০-১২৫ পিপিটি লবণাক্ত পানিতেই ভাল হয়। বিভিন্ন গবেষণা পত্র থেকে জানা যায় এরা নিম্নে ৪১ থেকে উর্দ্ধে ২৫০ পিপিটি পর্যন্ত লবণাক্ততা অভ্যস্থিকরণের মাধ্যমে সহ্য করতে পারে। লবণাক্ততার উপর নির্ভর করে এদের দেহের দৈর্ঘ্যেরও পরিবর্তন ঘটে। সাধারণত অতিরিক্ত লবণাক্ত পানিতে এদের দেহ ছোট আকৃতির হয় এবং মাধ্যমিক লবণাক্ত পানিতে দেহ লম্বা আকৃতির হয়। একটি পুর্ণাংগ আর্টিমিয়ার দেহের দৈর্ঘ্য ১২ মিঃমিঃ পর্যন্ত হতে পারে। এরা নানা বর্ণের এবং নানা জাতের হয়। ডিম থেকে পূর্ণাংগ আর্টিমিয়া হতে অনেকগুলি ধাপ পার হতে হয়।

আর্টিমিয়ার দেহে কেরাপেস জাতীয় আবরণ (Carapace) না থাকায় শরীর খুব নরম হয়। ফলে জুপ্ল্যাংকটন ভোজী সকল জলজ প্রাণী এদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করতে খুবই পছন্দ করে। বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা থেকে জানা যায় সকল মাছ এবং চিংড়ির প্রজাতি বাচ্চা অবস্থায় জুপ্ল্যাংকটন খেয়ে বেঁচে থাকে। বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন যে, চিংড়ি তাদের কমবয়সে আর্টিমিয়ার নপ্লই জীবন, খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে। এই জন্য চিংড়ি পোনা উৎপাদনে আর্টিমিয়ার গুরুত্ব অত্যাদিক। আর্টিমিয়া সকল লবণাক্ত পানিতে জন্মায় না বিধায় এর বিস্তার খুবই সীমাবদ্ধ। অতি দুঃখের বিষয় যে, বাংলাদেশের উপকূলীয় লবণাক্ত পানিতে এর উপস্থিতি এখনোও প্রমাণ হয়নি। ফলে চিংড়ি চাষের জন্য বাংলাদেশকে প্রতিবছরই আর্টিমিয়া উৎপাদনকারী দেশ থেকে আর্টিমিয়ার সিষ্ট আমদানি করতে হয়। কারণ আর্টিমিয়ার সিষ্ট ব্যতীত চিংড়ির পোনা উৎপাদন বারংবারই ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে এবং চিংড়ি উৎপাদনকারী সংস্থাগুলি ক্ষতির সম্মুখীন হচ্ছে।

কেবল বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায়ই নয়, পৃথিবীর আরো অনেক দেশ রয়েছে যেখানে কোন আর্টিমিয়া প্রজাতি নেই। কিন্তু বিজ্ঞানের এ যুগে কিছুই অসম্ভব নয়। যেখানে আর্টিমিয়া নেই সেখানেও চাষ হচ্ছে আর্টিমিয়া। মরুভূমিতেও মানুষ আজ চাষাবাদ করছে বিজ্ঞানের বদৌলতে। যেখানে যা নেই সেখানেই তা ফলানোর চেষ্টা চলছে। সাফল্যও লাভ করছে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই। বাংলাদেশেও তাই আর্টিমিয়া চাষের চেষ্টা চলছে। সাফল্য ও আমাদের দ্বারপ্রান্তে। মাত্র কিছুদিন পূর্বে আর্টিমিয়ার দুটি জাতের সাফল্যজনক চাষ ঘটিয়েছেন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ডঃ নুরদ্দিন মাহমুদ। তিনি কক্সবাজার জেলার উপকূলীয় অঞ্চলে লবণের জমিতে একই সংগে লবণ এবং আর্টিমিয়া চাষ করে সাফল্য অর্জন করেছেন। ফলে প্রমাণিত হয়েছে যে বাংলাদেশেও আর্টিমিয়া চাষ সম্ভব।

আর্টিমিয়া চাষ খুবই সহজ পদ্ধতিতে করা সম্ভব। এর জন্য প্রয়োজন মধ্যম মাত্রায় লবণাক্ত পানি যেখানে সাফল্যের সংগে আর্টিমিয়া সিষ্ট থেকে আর্টিমিয়া নপ্লিই লার্ভা উৎপাদন করা সম্ভব। এই জন্য প্রয়োজন বদ্ধ ১০০ পিপিটি মাত্রায় লবণাক্ত জলাশয়। আমাদের উপকূলীয় অঞ্চলসমূহের প্রায় ১৭০০০ হেক্টর এলাকায় লবণ উৎপন্ন হয় যেখানে লবণাক্ততার মাত্রা প্রায়শয়ই ১০০ পিপিটি থেকে উপরের দিকে তারতম্য ঘটে। এ সকল অঞ্চলের অধিকাংশেই সহজে লবণের সংগে আর্টিমিয়া চাষ করা সম্ভব।

বাংলাদেশের লবণ চাষীরা লবণ আহরণের জন্য তাদের প্রতিটি লবণ মাঠে মোট ৬টি কক্ষ তৈরী করে। শেষ কক্ষটি ছাড়া বাকী সকল কক্ষগুলোকেই লবণ বাষ্পীকরণের জন্য ব্যবহার করা হয়। ঐ সকল কক্ষগুলোর সর্বশেষ কক্ষটিতেই লবণের দানা জমাট বাঁধে বা বাঁধানো হয়। আর্টিমিয়া চাষের জন্য একজন কৃষককে লবণ মাঠের প্রথম থেকে চতুর্থ কক্ষটিকেই বেছে নিতে হবে। অর্থাৎ আর্টিমিয়ার কক্ষটির সামনে ৩টি ও পিছনে ২টি কক্ষ থাকবে। ঐ কক্ষটিকে প্রায় ৫০ সেঃমিঃ গভীরতায় খনন করতে হবে। অবশ্যই খননের পর

কক্ষটির মাটির পিএইচ (pH) গুণাগুণ পরীক্ষা করে প্রয়োজনে চুন মিশিয়ে অম্লীয় হলে তা ক্ষারীয়তে পরিবর্তন করতে হবে। চুন প্রয়োগ করে অথবা পানিতে মিশিয়েও একাজ করা সম্ভব। পর্যাপ্ত চুন প্রয়োগের পর মাটির পিএইচ (pH) গুণাগুণ আবার পরীক্ষা করে ক্ষারীয়তার নিশ্চয়তা সাপেক্ষে সেখানে অন্য বাষ্পীকরণ কক্ষ থেকে পানি দিয়ে ভর্তি করতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে পানিতে যেন লবণাক্ততার পরিমাণ অবশ্যই ১০০-১৮০ পিপিটি হয়। আর্টিমিয়া চাষের জন্য নির্মিত পুকুরের তলদেশ যেন অবশ্যই মসৃণ করে সমান করা হয়। প্রতিটি কক্ষের বাঁধ যেন নিঃছিদ্র হয় সেদিকেও দৃষ্টি রাখতে হবে। প্রথম কক্ষ থেকে পরবর্তী কক্ষটি অপেক্ষাকৃত নীচুতে করতে হবে যেন সহজেই পানি একটি কক্ষ থেকে অন্য কক্ষটিতে স্থানান্তরিত করা সম্ভব হয়। এখন আর্টিমিয়া চাষের উপযোগী করার জন্যে পুকুরটিতে অবশ্যই আর্টিমিয়ার খাদ্য উৎপাদন প্রয়োজন। সেজন্যে প্রয়োজন জৈব এবং অজৈব সার পুকুরে মিশ্রণ করানো। আমরা জানি আর্টিমিয়া খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সবুজ উদ্ভিদ, নীলাভ-সবুজ আলজী, ইউগ্লেনা ইত্যাদি। লবণাক্ত পানিতে বিভিন্ন সার (যেমন ইউরিয়া, মুরগীর বিষ্টা ইত্যাদি) মিশালে ২-৩ দিনের মধ্যেই এসকল খাদ্য বা উদ্ভিদ তৈরী হবে আর্টিমিয়া পুকুরে। এ সকল খাদ্য জন্মানোর পরই কেবল আর্টিমিয়ার পোনা পুকুরে ছাড়তে হবে।

আর্টিমিয়া চাষের জন্য প্রস্তুত পুকুরটিতে আর্টিমিয়ার খাদ্য উৎপাদনের পর আর্টিমিয়ার লার্ভা (নপ্লিই) ছাড়তে হবে। কোন কোন ক্ষেত্রে পূর্ণাংগ আর্টিমিয়া অথবা পূর্ণাংগ হওয়ার পূর্বদশা অবস্থায়ও আর্টিমিয়া পুকুরে ছাড়া হয়। পুকুরে আর্টিমিয়া অবমুক্ত করার উপযুক্ত সময় হলো সন্ধ্যার পর। ঐ সময় পানি ঠাণ্ডা থাকে এবং পরবর্তী সময়ে তাপের পরিমাণও কমতে থাকে।

আমাদের দেশে পূর্ণাংগ আর্টিমিয়া পাওয়া যায় না। ফলে বাজার থেকে আর্টিমিয়া সিষ্ট কিনে চা-চামচের চার ভাগের একভাগ সিষ্ট ২৫ পিপিটি লবণাক্ত পরিষ্কার তিন লিটার পানিতে ছাড়তে হবে। পানির পাত্রটির উপরে অবশ্যই কৃত্রিম আলোর ব্যবস্থা রাখতে হবে। পানিতে যেন অক্সিজেনের অভাব না দেখা দেয় সেজন্যে বায়বীয়করণ যন্ত্রের সাহায্যে পানিতে অক্সিজেনের ব্যবস্থা রাখতে হবে। এ অবস্থায় দেখা যাবে ডিম ছাড়ার ৩০ থেকে ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আর্টিমিয়ার সিষ্ট ফুটে বাচ্চা (Nauplii) বের হচ্ছে। এসকল নপ্লিই এখন আর্টিমিয়া চাষ উপযোগী পুকুরে ছাড়তে হবে। এভাবেই আমরা বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের লবণ মাঠে আর্টিমিয়া চাষ করে সিষ্ট উৎপাদন করে প্রচুর বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় এবং অধিক চিংড়ি উৎপাদন নিশ্চিত করে অধিক বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের দিক উন্মোচন করতে পারি।

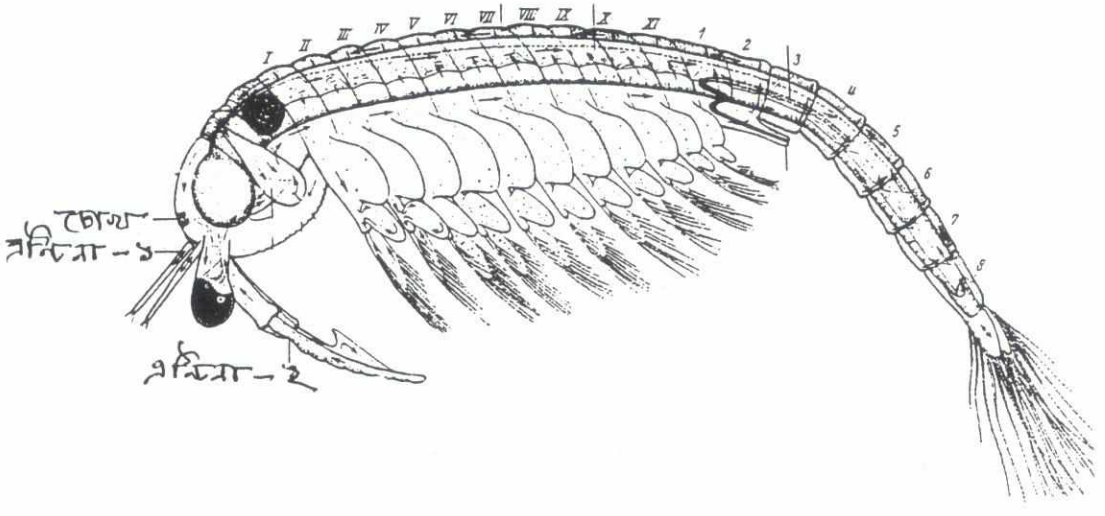

ছবি - একটি পূর্ণাংগ আর্টিমিয়া (Artemia)

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে দূরশিক্ষণের ভূমিকা

মোঃ শাহ আলম সরকার
স্কুল অভ্ এগ্রিকালচার এন্ড রুর‍্যাল ডেভলাপ্‌মেন্ট
বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

মৎস্য সম্পদ

বাংলাদেশ একটি নদী মাতৃক দেশ। এদেশের আনাচে কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে অসংখ্য- নদ-নদী, খাল-বিল, হাওর-বাঁওড়, পুকুর, ডোবা ইত্যাদি জলাশয়। আর এসব জলাশয়ে রয়েছে নানা প্রজাতির মৎস্য সম্পদ। এদেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার তুলনায় এ মৎস্য সম্পদ অপ্রতুল। তাই মানুষের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জন্য মৎস্য সম্পদের আরো উন্নয়ন প্রয়োজন। প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের যেমন বিস্তৃত ক্ষেত্র রয়েছে, তেমনি মৎস্য সম্পদ উন্নয়নেরও যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের বিপুল সংখ্যক জনগণকে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দেয়া প্রয়োজন। এ বিপুল জনগণ দারিদ্রতা ও নানা প্রতিকূলতার কারণে ঐতিহ্যগত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে লেখাপড়া করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। বাংলাদেশের মানুষ দরিদ্রতা, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্বল্পতা, অভিভাবকদের সঠিক দিক নির্দেশনার অভাব ইত্যাদির কারণে যথাসময়ে যথাযথ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষা লাভ করার সুযোগ পাচ্ছে না। দূরশিক্ষণে যেহেতু ঘরে বসে বাসায় থেকে কর্মরত অবস্থায় যে কোন বয়সে শিক্ষা লাভ করা সম্ভব তাই এটি বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা লাভ করার ক্ষেত্রে একটি নতুন দ্বার উন্মোচন করেছে।

দূর শিক্ষণ (Distance Education) ঃ প্রথাগত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী নির্দিষ্ট ক্যাম্পাসে উপস্থিত থেকে নিয়মিত নির্দিষ্ট সময়সূচি অনুসারে শিক্ষকের কাছে পাঠ গ্রহণ করেন। শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর নৈকট্য এর অন্যতম বৈশিষ্ট্য। শিক্ষক এখানে শিক্ষার্থীর সামনে সরাসরি পাঠ উপস্থাপন করেন এবং শিক্ষার্থীর কাছ থেকে তাৎক্ষণিক ফিডব্যাক পেয়ে থাকেন।

অন্যদিকে দূরশিক্ষণে

* শিক্ষক শিক্ষার্থীকে সরাসরি পাঠদান করেন না
* শেখার কাজটি শিক্ষার্থী নিজেই করেন
* বিশেষভাবে লেখা কোর্স বইগুলো শিক্ষকের কাজ করে
* অন্যান্য সামগ্রী যেমন শিক্ষার্থী নির্দেশিকা, অডিও ক্যাসেট শিক্ষার কাজে সাহায্য করে
* উপরিবর্ণিত শিক্ষা সহায়ক সামগ্রী তৈরি হয় যেন শিক্ষার্থী মুখ্যত এগুলোর সাহায্যেই শিক্ষা গ্রহণ করতে পারেন।
* পাঠের সময় ও স্থান শিক্ষার্থী নিজের সুবিধা মত ঠিক করেন।
* পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর প্রয়োজনের প্রতি লক্ষ্য রেখে টিউটরিয়াল সেন্টারে সমস্যা ভিত্তিক আলোচনা ও নির্দেশনার ব্যবস্থা থাকা।
* টিউটরগণ শিক্ষার্থীকে এই সাহায্য প্রদান করেন। শিক্ষার্থী নিজের চাহিদা অনুসারে তা গ্রহণ করেন।

মৎস্য সম্পদের উন্নয়নের জন্য মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন আবশ্যক

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে সাধারণত আনুষ্ঠানিক (formal) এবং অনানুষ্ঠানিক (Non-formal education) শিক্ষা দেয়া হয়ে থাকে। অনানুষ্ঠানিক শিক্ষায় সাধারণত বিভিন্ন মাধ্যমে যেমন বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশন, অডিও ক্যাসেট ইত্যাদির মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান দান করা হয়ে থাকে।

দূরশিক্ষণের মাধ্যমে যেকোন বয়সের যেকোন পেশার লোক ঘরে বসে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম। ফলে দূরশিক্ষণের মাধ্যমেই একমাত্র দেশের বিপুল সংখ্যক লোককে অল্প সময়ে দক্ষ জনবল হিসেবে তৈরি করা সম্ভব। আর এসব দক্ষ জনবল যখন মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জন করার পাশাপাশি মাছ চাষ, মাছের পোনা উৎপাদন ইত্যাদি কাজে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সম্পৃক্ত হবে তখন স্বাভাবিকভাবেই মাছের উৎপাদন বাড়বে। এতে দেশের মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন ঘটবে এবং এর পাশাপাশি জাতীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাই আমরা বলতে পারি যে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের দূর শিক্ষণের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দূরশিক্ষণের মাধ্যমে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য এক নবদিগন্তের দ্বার উন্মোচন করেছে। ১৯৯২ সালের ২০ শে অক্টোবর জাতীয় সংসদের পাশকৃত এক আইনের মাধ্যমে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের যাত্রা শুরু হয়। যাত্রা শুরুর পর থেকে বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় বিভিন্নভাবে আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রামের মাধ্যমে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে দক্ষ জনবল তৈরির ক্ষেত্রে এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বা উ বি ১৯৯২ সাল থেকে বাংলাদেশ বেতার এবং বাংলাদেশ টেলিভিশন এর মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ক বেশ কতোগুলো বাস্তব ভিত্তিক আনুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম ও অনানুষ্ঠানিক প্রোগ্রাম সম্প্রচার করেছেন। ফলশ্রুতিতে এদেশের বিপুলসংখ্যক জনগণ নিজ এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও ঘরে বসে নিজ নিজ কাজের পাশাপাশি মৎস্য বিষয়ক

বাস্তব জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছে এবং মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে এরা প্রত্যক্ষ্য ও পরোক্ষভাবে ভূমিকা পালন করছেন। বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় ১৯৯৭ সালের জানুয়ারী মাসে ব্যাচেলার অব এগ্রিকালচারাল এডুকেশন নামে একটি প্রোগ্রাম চালু করেছেন যা সম্পূর্ণরূপে দূরশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষাদান পদ্ধতিতে শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। উক্ত প্রোগামের মাধ্যমে বাংলাদেশের সমগ্র অঞ্চলের সকল পেশার সকল বয়সের ছাত্র/ছাত্রী নিজ এলাকায় থেকেই মৎস্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে মোট ৯ ক্রেডিটের জন্য ৪টি কোর্স বইয়ের মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করছেন। বর্তমানে উক্ত প্রোগামের ছাত্র/ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় ২৫০০ জন। উক্ত প্রোগ্রামটি সম্পাদনাকারীরা ভবিষ্যতে দক্ষ জনবল হিসেবে দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আশা করা যাচ্ছে। তাছাড়াও বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় দেশের সমগ্র অঞ্চলে বেকার যুবক/যুব মহিলা সহ সকল পেশার সকল শ্রেনীর লোকদেরকে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের লক্ষ্যে সার্টিফিকেট ইন পিসি কালচার এন্ড ফিশ প্রসেসিং (সিপিএফপি) নামে একটি সার্টিফিকেট প্রোগ্রাম জুলাই '৯৮ সালে চালু করতে যাচ্ছে। এ প্রোগ্রামটির মেয়াদ ৬ মাস। প্রগ্রামটি অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন মৎস্য প্রশিক্ষণ কেন্দ্র প্রশিক্ষণ একাডেমী এবং বাংলাদেশ মৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউটের বিভিন্ন কেন্দ্রের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। ফলে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের লোকজন তাদের নিকটস্থ অঞ্চলের টিউটারিয়াল কেন্দ্রে ভর্তি হয়ে মৎস্য বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবে। ফলে কোর্সটি সমাপ্তকারীরা দেশের মৎস্য সম্পদ উন্নয়নে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। তাছাড়া এ প্রোগ্রামের বিভিন্ন বিষয়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে বিশেষজ্ঞ দ্বারা প্রচার করা হবে বিধায় প্রোগ্রামের ভর্তিকৃত ছাত্র/ছাত্রী ছাড়াও অন্যান্য সকল জনগণই ঘরে বসে বাংলাদেশ বেতার ও বাংলাদেশ টেলিভিশনের মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জনে সক্ষম হবেন। একমাত্র দূরশিক্ষণের মাধ্যমেই একজন মৎস্য বিষয়ক বিশেষজ্ঞ একই সাথে লক্ষ লক্ষ জনগণকে মৎস্য বিষয়ে জ্ঞান দান করতে সক্ষম হয়।

শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত ও সচেতন করে গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার পরিবর্তে ভিন্নধর্মী ও বিকল্প শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে। দূর শিক্ষণে দক্ষ মেধাসম্পন্ন ব্যক্তির মাধ্যমে একই সাথে একই ভাষাভাষির বিশাল জনগোষ্ঠীকে শিক্ষিত করা যায় অথচ প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থায় শুধুমাত্র সীমিত কতিপয়ের মাঝে শিক্ষার আলো পৌছানো সম্ভব।

কম্পিউটার, ইন্টারনেট, টেলিযোগাযোগ, ডাকব্যবস্থা, রেডিও, টেলিভিশন, অডিও ভিডিও ক্যাসেট প্রভৃতি প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাকে মানুষের দোরগোড়ায় নিয়ে গেছে।

বাংলাদেশের মতো জনবহুল অথচ উন্নয়নশীল দেশে দূর শিক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ে জ্ঞান অর্জন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

শিক্ষাদান পদ্ধতি

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে ভর্তির সময় ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠসামগ্রী প্রদান এবং পরবর্তীতে টিউটোরিয়াল সেবা প্রদানসহ বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষাদান করা হয়।

পাঠসামগ্রী ঃ ভর্তির সময় প্রতিটি কোর্সের জন্য বিষয় বিশেষজ্ঞ দিয়ে রচিত প্রশিক্ষণ উপযোগী পাঠ্যপুস্তক দেয়া হয়। এসব পাঠ্যপুস্তক এমনভাবে রচিত যেন ছাত্ররা নিজেদের ঘরে বসে নিজে নিজে পড়ে জ্ঞান লাভ করতে পারেন। পাঠ্যপুস্তক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক উভয় বিষয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকে।

ব্যবহারিক ঃ টিউটরগণের তত্ত্বাবধানে ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের নিজ নিজ পারিবারিক পরিবেশ, স্থানীয় সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় প্রতিষ্ঠান এবং টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে ব্যবহারিক বিষয়সমূহ সম্পর্কে হাতে কলমে শিক্ষালাভ করে থাকে।

টিউটোরিয়াল ঃ ছাত্র-ছাত্রীরা তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক বিষয়ে পাঠসংক্রান্ত যেসব সমস্যার সম্মুখীন হবেন তা সমাধানের জন্য নির্ধারিত টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে বিশেষজ্ঞ শিক্ষকের পরামর্শ নিতে পারবেন। টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে সপ্তাহের নির্দিষ্ট শুক্রবারে পরামর্শ প্রদান করা হয়।

রেডিও ও টেলিভিশন ঃ পাঠ্যসূচির অপেক্ষাকৃত গুরুত্বপূর্ণ এবং জটিল অংশের উপর মাঝে মাঝে রেডিও ও টিভি প্রোগ্রাম প্রচার করা হবে।

মৎস্য সম্পদ উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন দেশের বিশাল জনগোষ্ঠিকে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান অর্জনের সুযোগ দিয়ে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা। কিন্তু আমাদের দেশে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান লাভের জন্য হাতেগোনা গুটিকয়েক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে যাতে নির্দিষ্ট বয়সের নির্দিষ্ট সংখ্যক লোক মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান লাভের সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু এতে বিশাল জনগোষ্ঠি মৎস্যবিষয়ক জ্ঞান অর্জন থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। অথচ দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে যেকোন বয়সের যে কোন পেশার যে কোন লোককে একই সাথে লক্ষ লক্ষ লোককে এ বিষয়ে জ্ঞান দান করে শিক্ষিত করা সম্ভব দেশের সর্বোচ্চ মেধাবী ও দক্ষ ব্যক্তিদের মাধ্যমে একই সাথে লক্ষ লক্ষ লোককে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞানে শিক্ষিত করে তোলা বা মৎস্য বিষয়ক জ্ঞানের প্রসার ঘটানোর ক্ষেত্রে দূর শিক্ষণ পদ্ধতির অগ্রণি ভূমিকা পালন করতে পারে। প্রচলিত শিক্ষা পদ্ধতিতে শিক্ষক শিক্ষাদানে অগ্রণি ভূমিকা পালন করে। কিন্তু দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থী মড্যুলার পদ্ধতিতে লেখা বই প্রশিক্ষণ পদ্ধতিতে লেখা হয় বিধায় নিজে অধ্যয়ন করে শিখে এবং রেডিও টিভি প্রোগ্রাম ও অডিও ভিডিও ক্যাসেট দেখে শুনে শিক্ষার্থী নিজেকে প্রস্তুত করে তোলেন।

দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে একজন মৎস্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ মৎস্য বিজ্ঞানী বা একজন মৎস্যবিষয়ক শিক্ষক নিকটস্থ। নির্ধারিত টিউটোরিয়াল কেন্দ্রে সাধারণত ছুটির দিনগুলোতে (সাধারণত শুক্রবারে) ক্লাশে শিক্ষার্থীদের সাথে উপস্থিত হন

এবং শিক্ষার্থীদের সমস্যাগুলো সাধারণত সমাধান করা হয়। ছাত্রদেরকে প্রশ্ন করে টিউটর তাদের ফিডব্যাক জেনে তাদেরকে উৎসাহ দিয়ে থাকেন এবং পাঠ গ্রহণের প্রয়োজনীয় পরামর্শ ও সহায়তা দিয়ে থাকেন। দূরশিক্ষণ পদ্ধতিতে সমগ্রদেশের মানুষ একই সাথে জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম।

মৎস্য শিক্ষার সুযোগকে তৃণমূল পর্যায়ে পৌছে দেয়ার লক্ষ্যে সারাদেশে বা উ বি ১২ টি আঞ্চলিক ও ৮০ টি স্থানীয় কেন্দ্রের মাধ্যমে শিক্ষার প্রসার ঘটাচ্ছে। শিক্ষার্থীরা নিজ এলাকার পার্শ্ববর্তী স্থানীয় কেন্দ্র ও আঞ্চলিক কেন্দ্রসমূহে সাধারণ ছুটির দিনগুলোতে যোগাযোগ করে শিক্ষা গ্রহণ প্রোগ্রামের ভর্তি আনুষ্ঠানিক ও উপ-আনুষ্ঠানি প্রোগ্রামসহ অন্যান্য সকল প্রগ্রামের মাধ্যমে মৎস্য বিষয়ক জ্ঞান লাভ করার সুযোগ পায়।

মন দিন চিংড়ি ও মাছ চাষে প্রগতি ফিশ লিমিটেড আছে আপনার পাশে

জাতীয় পুরস্কার ও স্বর্ণপদক প্রাপ্ত দেশের শ্রেষ্ঠ মৎস্য সমবায়ী উৎপাদিত

চিংড়ির শুষ্ক ও সুষম খাবার

পিলেট ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করুন।

মৎস্য অধিদপ্তর ও বিসিক অনুমোদিত চিংড়ি ও মাছের সম্পুরক খাদ্য

উৎপাদনকারী

প্রগতি ফিশ লিমিটেড

(ভুটান ও ভারত হইতে আমদানীকৃত ডলোমাইট সরবরাহ করা হয়)

রেজিষ্টার্ড অফিশঃ কে, ডি, এ, এভিনিউ, খুলনা। ফোন ঃ ০৪১-৭২২০০৭, ৭২৪৫৭৭, ৭২২৩৬৭।

বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য শিল্পের সম্ভবনা

সৈয়দ জাফর সাদেক
সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিমিটেড

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মৎস্য ও চিংড়ি সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। আমাদের জাতীয় উৎপাদনের শতকরা প্রায় ৫ ভাগ, রপ্তানী আয়ের শতকরা প্রায় ১২ ভাগ এবং প্রাণীজ আমিষের চাহিদার শতকরা ৬০ ভাগের উপর আসে এ সম্পদ থেকে। মৎস্য ও চিংড়ি খাতে প্রায় ১২ লক্ষ জনশক্তি সার্বক্ষণিকভাবে জড়িত। এছাড়াও বাংলাদেশের মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা প্রায় ১০ ভাগ লোক তাদের জীবিকা অর্জনের জন্য প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এ খাতে নিয়োজিত আছে।

মৎস্য ও চিংড়ি খাতে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিশাল সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এ খাতে অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক নয়। পরিসংখ্যান মতে, ১৯৭০ সালে বাংলাদেশে মাছের মোট বার্ষিক উৎপাদন ছিল প্রায় ৮ লাখ মেট্রিক টন। ১৯৮২ সালের দিকে এর পরিমাণ সাড়ে ৬ লাখ মেট্রিক টনে নেমে গিয়েছিল, যা ইদানীং কালে বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২ লাখ মেট্রিক টনের উপর। সামগ্রিকভাবে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু দৈনিক মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ অনেক কমেছে। এক সমীক্ষায় জানা যায়, ১৯৬২ সালে বাংলাদেশের মানুষের দৈনিক মাথাপিছু মাছ প্রাপ্তির পরিমাণ যেখানে ছিল ৩৩ গ্রাম, সেখানে ১৯৯৫ সালের দিকে তা ১৮ গ্রামে এসে দাঁড়িয়েছে।

এ হতাশাজনক পরিস্থিতির উত্তরণ ঘটাতে হলে বাংলাদেশের বিপুল জলসম্পদকে সনাতনীয় চাষ ব্যবস্থা থেকে বের করে এনে উন্নত এবং আধুনিক চাষ ব্যবস্থার আওতায় আনতে হবে।

বাংলাদেশে মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদন

১৯৯৫-৯৬ সালে বাংলাদেশে মোট মৎস্য উৎপাদনের পরিমাণ ছিল ১২ লক্ষ ৬৪ হাজার মেট্রিক টন (সূত্র ঃ বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন)। এর শতকরা মাত্র ৩০ ভাগ আসে মৎস্য চাষ হতে। অথচ আমাদের দেশের প্রায় ৪৩.৩৭ লক্ষ হেক্টর অভ্যন্তরীণ জলাশয়কে পরিকল্পিত চাষ ব্যবস্থার আওতায় আনা গেলে মোট মৎস্য উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা সম্ভব।

আমাদের দেশে বর্তমানে একর প্রতি পুকুর-দীঘিতে মাছের বার্ষিক গড় উৎপাদন ৩০০ থেকে ৪০০ কেজি মাত্র। আর চিংড়ির ক্ষেত্রে এর পরিমাণ মাত্র ১৫০ থেকে ২০০ কেজি। অথচ উন্নত ও আধুনিক চাষ ব্যবস্থা এবং অবকাঠামোগত উন্নয়ন ঘটাতে পারলে এ উৎপাদন ৫ থেকে ১০ গুণ বাড়ানো সম্ভব।

যাহোক, আশার কথা যে, বাংলাদেশে পরিকল্পিত মৎস্য ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে ইতিমধ্যেই সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বেশ কিছু পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে এবং এর ফলে সাফল্যও আশাব্যঞ্জক। সৌদিবাংলাদেশ শিল্প ও কৃষি বিনিয়োগ প্রতিষ্ঠান (সাবিনকো)'র উদ্যোগে ১৯৮৭ সালে প্রথম বাংলাদেশে আধা নিবিড় চিংড়ি খামার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা দেয়া হয়, যার উৎপাদন প্রতি চাষ চক্রে প্রতি একরে ২,০০০ থেকে ৩,০০০ কেজি পর্য্যন্ত পাওয়া গেছে। পাশাপাশি মিঠা পানির মাছ চাষের ক্ষেত্রেও সাবিনকো'র অর্থায়িত প্রকল্পগুলোতে উৎপাদনের হার বছরে প্রতি একরে প্রায় ৫,০০০ কেজি।

তবে একথা ঠিক, শুধুমাত্র উন্নত ও আধুনিক চাষ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে মৎস্য ও চিংড়ি চাষে শতভাগ সাফল্য আশা করা যাবে না। এর জন্যে প্রয়োজন সহায়ক শিল্পসমূহের বিকাশ এবং অন্যান্য অবকাঠামোগত উন্নয়ন।

মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদনে সহায়ক শিল্পসমূহ

মৎস্য ও চিংড়ি উন্নয়নে লাগসই প্রযুক্তির পাশাপাশি দু'টি সহায়ক শিল্পের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি হচ্ছে সুষম দানাদার সম্পূরক খাদ্য এবং অপরটি হচ্ছে হ্যাচারী। যেহেতু, মৎস্য ও চিংড়ি উৎপাদনের সাফল্য এ দুটো শিল্পের উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল, সেহেতু খাদ্য ও হ্যাচারী শিল্পের উন্নয়নেও প্রয়োজনীয় পৃষ্ঠপোষকতা অত্যাবশ্যক। এ বিষয়টি মাথায় রেখেই ১৯৮৭ সালে সাবিনকোর অর্থায়নে বাংলাদেশে প্রথম মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্য প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান "সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিঃ" প্রতিষ্ঠিত হয়। বস্তুত, এ শিল্প প্রতিষ্ঠানটি উৎপাদনে যাওয়ার পর থেকেই বাংলাদেশে পরিকল্পিত মৎস্য ও চিংড়ি চাষের ক্ষেত্রে নতুন ধারার সৃষ্টি হয়েছে। অতি সম্প্রতি, সাবিনকোর পাশাপাশি আরও দু'একটি ব্যক্তিমালীকানাধীন প্রতিষ্ঠান এ খাতে এগিয়ে এসেছে, যা বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদার প্রমাণস্বরূপ।

দানাদার সম্পূরক খাদ্যের গুরুত্ব

উন্নত পদ্ধতিতে অধিক ঘনত্বে চাষের ক্ষেত্রে সম্পূরক খাদ্যের বিকল্প নেই। এর ব্যবহারে চাষকৃত মৎস্য ও চিংড়ির দ্রুতবৃদ্ধি, স্বল্প সময়ে বাজারজাতকরণের আকৃতি প্রাপ্তি, স্বগোত্রভোজন প্রতিরোধ, অপুষ্টিজনিত রোগ প্রতিরোধ ইত্যাদি সুবিধা পাওয়া যায়। উপরন্তু, উচ্চমানসম্পন্ন খাদ্য ব্যবহারে খাদ্যরূপান্তর হার (FCR.) সুবিধাজনক হয়, যা পরবর্তীতে মুনাফার হার বহুগুণে বৃদ্ধি করে।

আমাদের দেশে সম্পূরক খাদ্যের ব্যবহার সনাতনীয় ধ্যান-ধারণায় বহুলাংশে প্রভাবিত। এছাড়াও পুঁজির স্বল্পতার কারণেও মৎস্য চাষীরা পুকুরে সার প্রয়োগ এবং মাঝে মাঝে দু'এক বস্তা চালের কুড়া, খৈল, গোবর, হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা, গরুর নাড়ী-ভূড়ি

ইত্যাদি অশোধিত দ্রব্য প্রয়োগ করে। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই এসবের মাত্রাতিরিক্ত ব্যবহার পুকুরের পরিবেশে মারাত্মক বিপর্যয় ডেকে আনে। ফলশ্রুতিতে একদিকে যেমন উৎপাদন ব্যাহত হয়, অন্যদিকে তেমনি আর্থিক ক্ষতির কারণ হয়।

যাহোক, সাম্প্রতিককালে মৎস্য অধিদপ্তর এবং অন্যান্য বেসরকারী উন্নয়ন সংস্থাসমূহের ব্যাপক প্রচারের ফলে বাংলাদেশে দেরীতে হলেও সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছে, যা খুবই আশাব্যঞ্জক। বর্তমানে প্রায় সকল মাঝারি এবং বড় মৎস্য খামারীগণ সম্পূরক খাবারের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। সম্পূরক খাবার ব্যবহারকারীরা আবার দুটি ধারায় বিভক্ত, যেমন-(১) মেশিনে প্রস্তুত সুষম দানাদার খাদ্য ব্যবহারকারী; এবং (২) খোলাবাজার হতে বিভিন্ন কাঁচামাল সংগ্রহ করে বিভিন্ন মাত্রায় হাতে তৈরী করে ব্যবহারকারী।

মেশিনে প্রস্তুত সুষম দানাদার খাদ্য বৈজ্ঞানিকভাবে উচ্চ প্রযুক্তি নির্ভর। এর ব্যবহার লাভজনক এবং সহজ। অন্যদিকে, হাতে প্রস্তুত খাদ্য ব্যবহারে প্রাথমিকভাবে খাদ্যের জন্য প্রত্যক্ষ বিনিয়োগের পরিমাণ কম হলেও পরবর্তীতে তা অর্থনৈতিক ক্ষতির কারণ হয়, যা নিচের তুলনামূলক চিত্র থেকে সুস্পষ্ট।

সুতরাং এটা অনস্বীকার্য যে, দানাদার সম্পূরক খাদ্য ব্যবহারে শুধমাত্র উচ্চ ফলনই নিশ্চিত হয় না বরং এর ব্যবহার অনেক নিরাপদ।

বাংলাদশে মৎস্য খাদ্য শিল্পের সম্ভাবনা

যেহেতু আধুনিক চাষ ব্যবস্থায় সম্পূরক খাবারের বিকল্প নেই, সেহেতু মৎস্য খাদ্য শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশ অত্যাবশ্যক। সনাতনীয় পদ্ধতিতে মাছ চাষের প্রবণতা ছাড়াও বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য ব্যবহার বৃদ্ধির একটি বিশেষ প্রতিবন্ধকতা হচ্ছে প্রান্তিক চাষীদের নিকট মৎস্য খাদ্যের সহজ সরবরাহ এবং প্রাপ্তি। কেবলমাত্র দু'একটি মৎস্য খাদ্য উৎপাদন ও সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের পক্ষে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে খাদ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করা এক কথায় অসম্ভব। এর জন্যে এ শিল্পে বিকাশ অত্যন্ত প্রয়োজন। মাছের খাদ্য তৈরীতে ব্যবহার করার উপযোগী অনেক সম্ভাবনাময় উপাদান আমাদের দেশে খুবই সহজলভ্য এবং তুলনামূলকভাবে স্বল্পমূল্যে পাওয়া যায়। এতে করে দেশীয় কাঁচামাল ব্যবহার নির্ভর খাদ্য শিল্প স্থাপন করে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় সম্ভব। আবার কিছু কিছু উপাদান, যেমন কসাইখানার বর্জ্য, হাঁস-মুরগীর খামারের বর্জ্য ইত্যাদি সংরক্ষণ ও প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের অভাবে মৎস্য খাদ্য শিল্পে এগুলোর যথাযথ ব্যবহার বিঘ্নিত হচ্ছে। তাই কাঁচামাল প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বিকাশও মৎস্য খাদ্য শিল্প বিকাশের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এছাড়াও, বাংলাদেশে মৎস্য খাদ্য শিল্পের পরিপূর্ণ বিকাশের জন্যে সরকারী পর্যায়ে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং এর ব্যবহারে সুফল সম্পর্কে খামারীদের মাঝে ব্যাপক সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।

উপসংহার

১৯৯০ সাল থেকে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত এ সাত বছরে বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের গড় বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ৬.৫ ভাগ যা চাহিদার তুলনায় কম। যথাযথ উন্নয়ন পরিকল্পনা ও কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে এ খাতে উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করার উদ্যোগ ইতিমধ্যেই সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে নেয়া হয়েছে। পঞ্চম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে ২০০১ সাল নাগাদ বাংলাদেশে মৎস্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২০ লাখ টনের উপর। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হলে মৎস্য ও চিংড়ি চাষের উন্নতির পাশাপাশি সহায়ক শিল্পগুলোরও বিকাশ একান্তভাবে প্রয়োজন। কারণ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য বিপুল পরিমাণ মৎস্য খাদ্য প্রয়োজন হবে। সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, মৎস্য ও চিংড়ি খাদ্য শিল্পের বিকাশের জন্য এ মুহূর্ত থেকেই সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা ও উদ্যোগ প্রয়োজন।

বিবরণ	মেশিনে প্রস্তুত দানাদার সম্পূরক খাদ্য	হাতে প্রস্তুত অদানাদার খাদ্য
গঠন	দানাদার	অদানার খাদ্য
বয়স ভেদে খাবারের আকৃতি	সুবিধাজনক	সুবিধাজনক নয়
পুষ্টিমান	নিয়ন্ত্রিত	অনিয়ন্ত্রিত
খাদ্য উপাদানের মিশ্রণ	সমভাবে বিস্তৃত	অসমভাবে বিস্তৃত
জীবানুমুক্তকরণ	হয়	হয় না
ভিটামিন ও খনিজ লবণের স্থায়ীত্ব	স্থায়ী	অনেকাংশে অস্থায়ী
মাছ ও চিংড়ির বৃদ্ধি	দ্রুত	ধীর
পানিতে স্থায়ীত্ব	বেশী	কম
পানির দূষণ	হয় না	হয়
খাদ্য রূপান্তর হার	লাভজনক	লাভজনক নয়
খাদ্যের গ্রহণযোগ্যতা	আছে	নেই
গুদামজাতকরণ	করা যায়	করা যায় না।

কর্মসংস্থান ও আয়ের লক্ষ্যে বিল এলাকায় মাছ চাষ

ডঃ এস ডি ত্রিপাঠি
দেবাশীষ মজুমদার
ইকলাম, ঢাকা

এ দেশের অর্থনীতিতে মৎস্য সম্পদের গুরুত্ব অপরিসীম। মাছের যে প্রাচুর্যতা এবং বহুমুখিতা রয়েছে তার যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারলে প্রাণীজ আমিষের অভাব দূর করা সম্ভব। এ ছাড়া ব্যাপক উৎপাদনের মাধ্যমে কর্মসংস্থান এবং আয়ের সুযোগ সৃষ্টিও হতে পারে। বিগত কয়েক বছর ধরে সরকারী এবং বেসরকারী পর্যায়ে মাছ চাষের বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণের ফলে বদ্ধ জলাশয় (পুকুর) থেকে মৎস্য উৎপাদন অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু নদী নালা খাল বিল প্রভৃতি উৎস থেকে উৎপাদন বাড়েনি। অথচ অতীতে এই সকল উৎস্য হতে প্রচুর মাছ পাওয়া যেত।

বাংলদেশে মৎস্য সম্পদের মধ্যে বিলের সংখ্যা কত এর কোন সঠিক পরিসংখ্যান না থাকলেও মোট অভ্যন্তরীণ জল সম্পদের ৩% এর আওতাভুক্ত। সঠিক জরিপ করলে এ পরিমাণ বৃদ্ধি পাবে কিন্তু কমবে না। দেশের প্রতিটি জেলাতেই ছোট এবং বড় বাৎসরিক এবং মৌসুমী বিল আছে যেগুলির আকার ১ হেক্টর থেকে শুরু করে ১০০ হেক্টর বা তার উর্দ্ধেও হতে পারে। আলোচ্য প্রবন্ধে ছোট এবং মাঝারি আকারের বিলে (১ হেঃ থেকে ১০ হেঃ) চাষ পদ্ধতি এবং ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অতীতে এই সকল বিল থেকে প্রচুর পরিমাণে শিং, মাগুর, কৈ, প্রভৃতি নানা জাতের মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু কৃষি জমিতে কীটনাশকের ব্যবহারে অতিরিক্ত আহরণ, অপরিকল্পিত বাঁধ নির্মাণ ইত্যাদি নানাবিধ মনুষ্যজনিত কারণে এই সকল বিল এলাকা বর্তমানে মাছশূন্য হয়ে পড়ছে।

ব্যবস্থাপনা

বিলগুলি প্রধানতঃ বহু মালিক অথবা খাস ব্যবস্থাপনা রয়ে গেছে। সুতরাং এদেরকে চাষের আওতায় আনার জন্যে সরকার এবং এনজিওদের সমন্বিত উদ্যোগ প্রয়োজন। স্থানীয় দরিদ্র জনগোষ্ঠী এবং বেকার যুবকদের সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ এবং আর্থিক সহায়তা করলে বিলে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব।

চাষ পদ্ধতি

ছোট এবং মাঝারি আকৃতির বিলগুলিকে বড় দীঘি (ট্যাঙ্ক) হিসাবে চিন্তা করে নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে চাষ করা যেতে পারে।

মাছ ছাড়ার আগে করণীয়

বিলগুলির যেহেতু কোন নির্দিষ্ট আকার বা আকৃতি নেই, সে জন্য বিলের এক বা দু'দিকে মাটি দিয়ে পাড় তৈরী করতে হবে যাতে মাছ ভিতর থেকে বের হতে না পারে। তবে পাড় নির্মাণের সময় এলাকার উপযুক্ততা অনুসারে পানি প্রবেশ এবং নির্গমনের ব্যবস্থা করে দিতে হবে। চৈত্র এবং বৈশাখ মাসে যখন বিলে পানির পরিমাণ কম থাকে তখন জাল দিয়ে সকল ধরনের রাক্ষুসে মাছ সরিয়ে ফেলুন। বিলগুলি পুকুর থেকে অনেক বড় বিধায় বিষ প্রয়োগ করে মাছ মারা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ঠিক হবে না। এ ছাড়া বিল এলাকার পানি সেচ কাজ, গরু ছাগলের গোসল, হাঁস চরানো প্রভৃতি নানাবিধ কারণে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উপরন্তু, বিলের প্রকৃতি (nature) অনেকটা মুক্ত জলাশয়ের মত সে কারণে রাক্ষুসে এবং অন্যান্য মাছ সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করা সম্ভব নয়। সুতরাং জাল টেনে এদের নিয়ন্ত্রণ করে মাছ চাষ করতে হবে।

রাক্ষসে মাছ দমনের পর প্রতি শতাংশে ১ কেজি হিসাবে চুন প্রয়োগ করা প্রয়োজন। এরপর প্রতি শতাংশে ৪ কেজি গোবর অথবা ২ কেজি হাঁস মুরগির বিষ্ঠা প্রয়োগ করে ৩-৪ ইঞ্চি আকারের রুই জাতীয় মাছের পোনা ছাড়তে হবে।

মজুদ ঘনত্ব এবং অনুপাত

প্রতি শতাংশ হিসাবে		
কাতলা	-	৮ টি
সিলভার কার্প	-	৬ টি
রুই	-	১২ টি
মৃগেল	-	৬ টি
কমন কার্প	-	৮ টি
সরপুঁটি	-	৫ টি
	সর্বমোট	৪৫ টি

বিলে যদি প্রচুর পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ থাকে তবে গ্রাসকার্প ছাড়লে ভাল ফলন পাওয়া সম্ভব। তবে সে ক্ষেত্রে বিলে ধানের চারা রোপন করার পূর্বেই গ্রাসকার্প ছেড়ে বড় করে নিলে পরবর্তীতে ধানের কোন ক্ষতি হবে না।

মজুদ পরবর্তী ব্যবস্থাপনা

পোনা মজুদের পর শতাংশ প্রতি ২ কেজি হাঁস-মুরগীর বিষ্ঠা অথবা ৪ কেজি গোবর ১৫ দিন পর পর ব্যবহার করতে হবে। ইউরিয়া, টিএসপি প্রভৃতি রাসায়নিক সারের দাম বেশী এবং কৃষি জমিতে ব্যবহার হয় সে কারণে বিলে রাসায়নিক সার দেয়ার দরকার নেই। সম্ভব হলে মাছ ছাড়ার পর ৩-৪ মাস পর্যন্ত মাছের শরীরের ওজনের ২% হারে চালের কুড়া প্রতিদিন মাছকে খাওয়ালে দ্রুত বৃদ্ধি পাবে। এছাড়াও শীতের দুই মাস চুন আধা কেজি প্রতি শতাংশ হিসাবে ১ মাস পর পর ব্যবহার করতে হবে।

আহরণ

মাছ ছাড়ার ৩ মাস পর থেকে ৪০০ গ্রাম বা তদূর্ধ্বের মাছকে ধরে ফেললে অন্যান্য মাছ দ্রুত বড় হবে।

ইকলার্ম এবং বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনিস্টিটিউট ছোট এবং মাঝারি আকৃতি বিলে মাছ চাষের কলাকৌশল নির্ণয়ের জন্যে কাজ করে চলেছে। নিম্নের সারণীতে প্রশিকার মাধ্যমে ময়মনসিংহের ভালুকা এলাকার বিলে মাছ চাষ করে যে ফলাফল পাওয়া গেছে তা তুলে ধরা হলো।

সারণী-১ ভালুকা এলাকার বিল থেকে প্রাপ্ত মৎস্য উৎপাদন।

গ্রুপের নাম	বিলের আয়তন (হেক্টর)	চাষকালীন সময় (মাস)	চাষ পূর্ববর্তী প্রাকৃতিক আহরণ (কেজি)	মজুদ ঘনত্ব সংখ্যা/ হেঃ	মোট প্রাপ্ত উৎপাদন (কেজি)
আশার আলো যুব সমিতি	১.৭	৮	১৫০	১৩.০০০	১,৭৭৫
নতুন পথের সন্ধান	২.০	৮	৩০০	১২,০০০	২,২১৩
যুব কল্যাণ সমিতি	৩.৪	৭	৪০০	১০.০০০	৩,৪০১

মাছের উৎপাদন এবং আয়

উল্লেখিত পদ্ধতিতে চাষ করলে বিল এলাকা থেকে ৭-৮ মাসে হেক্টর প্রতি কম পক্ষে ১ টন মাছ অনায়াসে উৎপাদন করা সম্ভব। বিল এলাকা থেকে আয়ের পরিমাণ নির্ভর করে ব্যবস্থাপনা এবং বিলের প্রকৃতির উপর। যদি পাড় নির্মাণ, মাছ ধরা, পোনা এবং খাদ্য বাবদ ব্যয়কে নিয়ন্ত্রণ করা যায় তবে বিল এলাকা থেকে মাছ চাষ করে প্রচুর আয় করা সম্ভব। এই প্রদ্ধতির চাষে বিল এলাকাতে ধান উৎপাদনের কোন ক্ষতি হবে না।

শেষ কথা

মাঝারি এবং বড় আকৃতির বিলগুলি দেশীয় প্রজাতির ছোট মাছের ভাল উত্তম আশ্রয় হতে পারে। বিলগুলিকে চাষের আওতায় এনে বর্ষা মৌসুমে ছোট প্রজাতির মাছগুলিকে ব্যাপকভাবে না ধরে মজুদকৃত মাছের সাথে এদের বড় হবার এবং প্রজনন করার সুযোগ দিলে বিল এলাকাতে ছোট মাছের উৎপাদন বাড়বে এবং এতে বিলে মজুদকৃত কার্প প্রজাতির মাছের উৎপাদনের আংশিক ব্যাঘাত হলেও সার্বিকভাবে মোট আয় অনেক বাড়ানো সম্ভব। আর এ ভাবে ছোট প্রজাতির দেশীয় মাছকে লুপ্ত হওয়ার হাত থেকে রক্ষা করা যাবে।

সেচ প্রকল্প এলাকায় সমন্বিত মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন কার্যক্রম

কে. ইউ. এম. সহিদুর রহমান
এফ সি ডি আই প্রকল্প, ঢাকা

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয়ে সমন্বিত মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (এফ,সি,ডি,আই) বাংলাদেশ সরকারের নিজস্ব অর্থানুকূল্যে মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ের সরাসরি নিয়ন্ত্রণাধীন গ্রামীণ জনগোষ্ঠির আত্মকর্মসংস্থানের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে নিয়োজিত একটি ব্যতিক্রমধর্মী প্রকল্প। এ প্রকল্পের সাথে সম্পৃক্ত রয়েছে পানি সম্পদ মন্ত্রণালয়, ভূমি মন্ত্রণালয় এবং যোগাযোগ মন্ত্রণালয়। প্রকল্প বাস্তবায়নে মৎস্য অধিদপ্তর এবং পশুসম্পদ অধিদপ্তর সরাসরি নিয়োজিত। প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য হল- (ক) পতিত ও আধাপতিত জমি ও জলাশয় উৎপাদনমুখী সম্পদে পরিণত করা (খ) জলাশয় পার্শ্বের দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে টেকসই আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন (গ) প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কার্যকর জনশক্তি হিসেবে গড়ে তোলা (ঘ) মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধি (ঙ) পশু পাখির জাত উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি (চ) দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুষ্টির যোগান বৃদ্ধি (ছ) কর্মসংস্থান, সর্বোপরি সমন্বিত অর্থনৈতিক কার্যক্রমের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন।

জলাশয় চিহ্নিতকরণ ও জরিপ

সমন্বিত কার্যক্রম গ্রহণের প্রথম পদক্ষেপ হল উপযুক্ত জলাশয় চিহ্নিত ও নির্বাচন করা। প্রকল্প এলাকায় যে ধরনের জলাশয় কার্যক্রমের আওতায় রয়েছে সেগুলো হল বরোপিট, খাল, বদ্ধনদী ও খাসপুকুর। এ সমস্ত জলাশয়ের কোনটি মৌসুমী আবার কোনটি মেয়াদী। পতিত মৌসুমী বা মেয়াদী জলার কোনটিতে মাছ চাষের জন্য উন্নয়ন প্রয়োজন আবার উন্নয়ন ছাড়াও অনেকগুলো মাছ চাষের আওতাধীন আনা সম্ভব। কাজেই মাছ চাষের জন্য জলাশয় চিহ্নিত ও নির্বাচন সঠিক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

এ পর্যন্ত ১৭টি সেচ প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত ৪৭,৫২৫ হেঃ খাস/ অধিগ্রহণকৃত ভূমি/ জলাশয়ের মৌজা ম্যাপ সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে, এর মধ্যে ২১৮৮ হেঃ জলাশয় এখনই মাছ চাষ উপযোগী, ৩১,৩২৩ হেঃ জলাশয় সংস্কারপূর্বক মাছ চাষ উপযুক্ত এবং ১৩,৬১৩ হেঃ ভূমি ঘাস, ফলমূল ইত্যাদি চাষ উপযুক্ত বলে চিহ্নিত করা হয়েছে।

জলাশয় উন্নয়ন

মোট ৭,৫০০ হেঃ জলাশয় প্রকল্প কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এর মধ্যে বরোপিট ৩,০০০ হেঃ বদ্ধ নদী ৩,০০০ হেঃ, বদ্ধ খাল ১,০০০ হেঃ এবং খাসপুকুর ৫০০ হেঃ। ৭,৫০০ হেঃ জলাশয়ের মধ্যে ১,৫৮৫ হেঃ জলাশয় বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর সহায়তায় পুনঃখননের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। এর মধ্যে বরোপিট ১,০০০ হেঃ বদ্ধ নদী ৩০০ হেঃ, বদ্ধ খাল ২৩৫ হেঃ এবং খাসপুকুর ৫০ হেঃ। এ পর্যন্ত বাস্তবায়িত ফলাফলে দেখা যায় ১১৩৩ হেঃ বরোপিট, ৪৭৮ হেঃ বদ্ধ নদী, ৭৬ হেঃ বদ্ধ খাল এবং ৯ হেঃ খাস পুকুরসহ মোট ১৬৯৬ হেঃ কার্যক্রমের আওতায় আনা হয়েছে।

ডেমোসেড (হাঁস-মুরগীর ঘর নির্মাণ)

প্রকল্পের প্রতি ২৫টি হাঁস অথবা মুরগীর জন্য ১টি করে মোট ১,০৮১ টি ডেমোসেড নির্মাণের সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৩০০ টি ডেমোসেড নির্মাণ করা হয়েছে।

দলগঠন

প্রকল্প এলাকার দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে সম্পৃক্ত করে একটি সুনির্দিষ্ট নীতিমালার ভিত্তিতে দলগঠন করা হয়। প্রকল্পের দলগঠনের নীতিমালার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে- (ক) দলের প্রতিটি সদস্যকে প্রকল্প (বাঁধ, পুকুর, বরোপিট, মরা নদী, খাল ইত্যাদি) এলাকার আশপাশের আধিবাসী হতে হবে। (খ) প্রকল্পভুক্ত এলাকার ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা এবং মৎস্য চাষ ও পশু পালনে আগ্রহী ব্যক্তিকে দলে অন্তর্ভুক্তির ব্যাপারে অগ্রাধিকার দেয়া হবে। (গ) দলের সদস্য সংখ্যা প্রকল্প অনুপাতে হবে। এক পরিবারের ১ জনের অধিক সদস্য দলভুক্ত হতে পারবে না (ঘ) দলের কার্যাদি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য ৫ (পাঁচ) সদস্যবিশিষ্ট একটি পরিচালনা কমিটি থাকবে। উক্ত

কমিটির মধ্যে ১ জন দলপতি, ১ জন সহ-দলপতি, ১ জন সচিব-কাম- কোষাধ্যক্ষ ও ২ জন সদস্য থাকবে।

দলগঠনের তালিকা যৌথভাবে থানা মৎস্য কর্মকর্তা ও থানা পশুসম্পদ কর্মকর্তা প্রস্তুত করে থাকেন। এ ব্যাপারে স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের সহায়তা নেয়া হয়।

প্রকল্পভুক্ত সেচ প্রকল্প এলাকায় এ পর্যন্ত মোট ১৮৬৫ টি দলগঠন করা হয়েছে যার সদস্য সংখ্যা হল ৩৬,৬২২ জন। এর মধ্যে পুরুষ ৩০,১১৭ জন এবং মহিলা ৬,৫০৫ জন।

সঞ্চয় কার্যক্রম

প্রকল্পের দলগঠনের নীতিমালায় ভূমিহীন, প্রান্তিক চাষী, বেকার যুবক এবং বিত্তহীন পুরুষ ও মহিলা সমন্বয়ে দল গঠনের কথা বলা হয়েছে। এ ধরনের জনগোষ্ঠীর পক্ষে মাছ চাষ বা পশু পালনের জন্য জরুরি প্রয়োজনে তাৎক্ষণিকভাবে অর্থ বিনিয়োগ করা সম্ভব হয়ে ওঠে না, সে কারণে সুষ্ঠুভাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সুফলভোগী সদস্যদের দ্বারা সাপ্তাহিক অর্থ জমার মাধ্যমে সঞ্চয় তহবিল গঠন করা হচ্ছে। সাপ্তাহিক কিস্তিতে জমাকৃত অর্থ প্রতিমাসে নিকটস্থ ব্যাংকে জমা রাখা হয়।

ইজারা প্রদান

জলাশয়ভিত্তিক স্থানীয় ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত সুফলভোগী দলের নিকট বুক ভ্যালু নির্ধারণ পূর্বক জলাশয় দীর্ঘ মেয়াদী (৫ বছর প্রতি বছর নবায়ন যোগ্য) ইজারা প্রদান প্রকল্পের একটি মূল কাজ। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী প্রকল্পভুক্ত ২৫১৭ হেঃ জলাশয় ইজারা প্রদান করে প্রায় ৩৫ লক্ষ টাকা রাজস্ব সংশ্লিষ্ট বিভাগের খাতে জমা হয়েছে।

মৎস্য সম্প্রসারণ কার্যক্রম

প্রকল্প এলাকায় প্রদর্শনী মৎস্য খামার স্থাপনের পাশাপাশি প্রকল্পভুক্ত দলসমূহকে সম্প্রসারণ-এর মাধ্যমে ইজারাকৃত (উন্নয়নকৃত/ উন্নয়নবিহীন) জলাশয় সমূহে দলের সদস্যদের স্ব-উদ্যোগে মাছ চাষের কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়। প্রকল্প এলাকার উপযোগিতার ওপর ভিত্তি করে বিভিন্ন এলাকায় যে সমস্ত মৎস্য বিষয়ক কার্যক্রম গ্রহণের সংস্থান রয়েছে তা হলো ঃ (ক) বরোপিটে মাছ চাষ; (খ) খালে মাছ চাষ; (গ) বদ্ধ নদীতে মাছ চাষ; (ঘ) পুকুরে মাছ চাষ।

বরোপিটে মাছ চাষ

সেচ ও নিষ্কাশন খাল খননের লক্ষ্যে বাঁধ নির্মাণের পর সৃষ্ট বরোপিটগুলো বর্তমানে প্রায় অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে আছে। কোন কোন বরোপিটে প্রাকৃতিক ভাবে কিছু মাছের বংশ বৃদ্ধি ঘটে যা দরিদ্র জনগণ আহরণ করে থাকে। এই বরোপিটগুলো মাছের পোনা ও দ্রুত বর্ধনশীল মাছ উৎপাদনের একটি উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। বরোপিটগুলোর আকার, খনন/ পুনঃখনন ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হলে বিপুল পরিমাণ মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রকল্পাধীন মোট ৩০০০ হেঃ এলাকা এই কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষমাত্রা রয়েছে। এ পর্যন্ত ১১৩০ হেঃ-এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বরোপিটে মাছ চাষ প্রদর্শনী খামারের আংশিক তথ্য অনুযায়ী এ পর্যন্ত মোট ৩৫০ (১৯৭ হেঃ) মেঃ টন মাছ উৎপন্ন হয়েছে যা থেকে মোট ১২৭ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

খালে মাছ চাষ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধ নির্মাণের ফলে বাঁধের ভিতরের এলাকা প্লাবন মুক্ত হওয়ায় বাঁধের ভিতরের এলাকার খালগুলো পানি সেচ ও নিষ্কাশনের কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেচ কার্যক্রম সুবিধা অপরিবর্তিত রেখে উল্লেখিত খালে মৎস্য চাষ উপযোগী পানির উচ্চতা রক্ষা করে এবং প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণের মাধ্যমে মাছ চাষ করা সম্ভব। এই উদ্দেশ্যে খালের অভ্যন্তরে নির্দিষ্ট দূরত্বে পেন স্থাপন, মৎস্য চাষ ব্যবস্থা ইউনিট তৈরি করাসহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় সংস্কার করা হলে বিপুল পরিমাণ মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। উক্ত প্রকল্প হতে ৩১১ হেঃ প্রদর্শনী খামারসহ মোট ১০০০ হেঃ এই কার্যক্রমের আওতায় আনয়নের লক্ষমাত্রা রয়েছে। এ পর্যন্ত মোট ৬১ হেঃ খালে প্রদর্শনী খামারসহ মোট ৭৬ হেঃ খামার স্থাপন করা হয়েছে। উক্ত প্রদর্শনী খামার হতে ১২.৭ (২৪ হেঃ) মেঃ টন মাছ উৎপন্ন হয়েছে যা থেকে ৪.০০ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে। খালে প্রদর্শনীসহ সর্বমোট ১১৭ মেঃ টন মাছ উৎপন্ন হয়েছে যা থেকে আয় হয়েছে ৩৫.০০ লক্ষ টাকা।

বদ্ধ নদীতে মাছ চাষ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ বাঁধের ফলে অনেক নদী বদ্ধ জলাশয়ে

পরিণত হয়েছে। যেমন- চাঁদপুর সেচ প্রকল্পের ডাকাতিয়া নদী, পাবনা সেচ প্রকল্পের ইছামতি নদী। এসব নদীগুলোতে প্রচুর মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রকল্প কর্তৃক মোট ৩০০ হেঃ জলাশয় এই কার্যক্রমের অধীনে আনার সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৫৬০ হেঃ এ কার্যক্রমে আনা হয়েছে। বদ্ধ নদীতে মাছ চাষ প্রদর্শনী খামার হতে ৩৯ (৩২ হেঃ) মেঃ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে যা থেকে ১৫.০০ লক্ষ টাকা আয় হয়েছে।

পুকুরে মাছ চাষ

বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নিষ্কাশন ও সেচ প্রকল্প বাস্তবায়নের পূর্বে সংশ্লিষ্ট এলাকাসমূহের পুকুরগুলোতে মৎস্য উৎপাদনের হার ছিল অত্যন্ত কম। বন্যায় এ সকল পুকুর প্লাবিত হয়ে মৎস্য কার্যক্রম ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠতো বলে উক্ত পুকুরসমূহে সাধারণত মৎস্য উৎপাদন কার্যক্রম গ্রহণ করা হত না। বন্যা নিয়ন্ত্রণ অবকাঠামো নির্মাণের পর পুকুর প্লাবিত হয়ে যাবার আশংকা না থাকায় পুকুরগুলোতে মাছ চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি ও কর্মসংস্থানের মাধ্যমে এ সকল পুকুর থেকে প্রতিবছর হেক্টর প্রতি ২.৫ মেঃ টন মাছ উৎপাদন করা সম্ভব হবে। প্রকল্পাধীন ৫০০ হেঃ খাস পুকুর এ কার্যক্রমের অধীন আনার লক্ষমাত্রা রয়েছে। পুকুরগুলোতে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচীর গমের মাধ্যমে ৫০ হেঃ জলাশয় প্রয়োজনীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে মাছ চাষের উপযোগী করার লক্ষমাত্রা থাকলেও এ পর্যন্ত মোট ১৭.৩১২ হেঃ জলাশয় উন্নয়ন করা হয়েছে। উল্লেখিত জলাশয়ের আওতাধীন মোট ৫০ হেঃ পুকুরে প্রদর্শনীখামার স্থাপনেরও লক্ষমাত্রা রয়েছে। ইতিমধ্যে ১৫ হেঃ পুকুরে মাছ চাষ প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। মাছ চাষ প্রদর্শনী খামার থেকে মোট ৮.৭৩ (৯ হেঃ) মেঃ টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে যার বিক্রয় মূল্য ২.৭৪ লক্ষ টাকা।

প্রদর্শনী কার্যক্রমে শুধুমাত্র প্রথম বছরই উপকরণ সরবরাহ করা হয়। তাই মাছ চাষের পর বিক্রিত অর্থ হতে এর চাষ বাবদ অর্থের সমপরিমাণ অর্থ সুফলভোগীদের সঞ্চয় তহবিলে জমা করতে হয়। এতে করে পরবর্তী বছরগুলোতে কোনরূপ আর্থিক সহযোগিতা ছাড়াই মাছ চাষ কার্যক্রম অব্যাহতভাবে চলতে পারে। এ ব্যাপারে জেলা ও থানা মৎস্য কর্মকর্তাগণ প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করে থাকেন।

পশুসম্পদ সম্প্রসারণ কার্যক্রম

সমন্বিত কার্যক্রমে ইজারাকৃত জলাশয়ের বিপরীতে গঠিত গ্রুপের মধ্যে মৎস্য কার্যক্রমের পাশাপাশি পশুসম্পদ কার্যক্রমও গ্রহণ করা হয়। এ কার্যক্রমে রয়েছে ঃ (ক) হাঁস-মুরগীর প্রদর্শনী খামার; (খ) ছাগল পালন প্রদর্শনী খামার; (গ) গরু মোটা-তাজাকরণ প্রদর্শনী খামার; (ঘ) প্রদর্শনী ঘাষ চাষ ও ফল-মূলের খামার।

হাঁস-মুরগীর প্রদর্শনী খামার

গ্রুপের সদস্যদের স্বল্প সময়ে অধিক আয়ের লক্ষ্যে এবং অধিক ডিম উৎপাদনক্ষম উন্নত জাতের হাঁস-মুরগীর খামার স্থাপনের নিমিত্তে মোট ১০৮১টি প্রদর্শনী খামার স্থাপনের লক্ষমাত্রা নির্ধারিত রয়েছে। প্রতিটি খামারে ২৫টি হাঁস অথবা মুরগী (২২টি স্ত্রী জাতের এবং ৩টি পুরুষ জাতের) থাকবে। একটি গ্রুপে সদস্য সংখ্যা অনুপাতে ১ থেকে ৪টি পর্যন্ত প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়ে থাকে। এ পর্যন্ত ১৪৬টি মুরগী পালন এবং ১৬৫টি হাঁস পালন প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। মুরগী খামার হতে ২.৭৪ লক্ষ ডিম যার বিক্রয় মূল্য ৯.৮১ লক্ষ টাকা এবং মোট ৫৮.৪ হাজার বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে। হাঁসের খামার হতে ২.৪০ লক্ষ ডিম উৎপাদিত হয়েছে যার বিক্রয় মূল্য ৯.২৩ লক্ষ টাকা।

ছাগল খামার

এ পর্যন্ত ৩৬৭টি ছাগল প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে এবং স্থাপিত খামার হতে ২১২৮টি বাচ্চা উৎপাদিত হয়েছে।

গরু মোটা-তাজাকরণ খামার

মোট ৮৬৩টি গরু মোটা-তাজাকরণ প্রদর্শনী খামার স্থাপন এবং সংস্থান রয়েছে। প্রতিটি খামারে ১টি গরু থাকে। এ পর্যন্ত ৩২৯টি গরু মোটা-তাজাকরণ প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হয়েছে। গরু বিক্রয় হতে সুফলভোগীদের ৭.৮৬ লক্ষ টাকা মুনাফা অর্জিত হয়েছে।

ঘাস চাষ ও ফলমূলের খামার

সর্বমোট ৪১১ একর জমিতে ঘাস চাষের প্রদর্শনী খামার স্থাপন করা হবে। এ পর্যন্ত ১১০ একর ঘাস চাষ

খামার স্থাপন করা হয়েছে। এ হতে প্রায় ৫০০ মেঃ টন ঘাস উৎপাদিত হয়েছে এবং সুফলভোগীরা প্রায় ১৯০ মেঃ টন ঘাস বিক্রি করেছে। এছাড়াও জলাশয়ের পাড়ে ফলমূলের গাছ লাগানো, শাকসব্জি এবং তরিতরকারী চাষ করা হচ্ছে। এ ব্যাপারে প্রকল্প থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ প্রদান করা হচ্ছে।

প্রশিক্ষণ

মোট ১৫,০০০ সুফলভোগী সদস্যকে প্রশিক্ষণ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। এ পর্যন্ত ৬,৬০৭ জন সুফলভোগী সদস্যকে মৎস্য ও পশুসম্পদ বিষয়ে এবং ২৫ জন কর্মকর্তাকে মৎস্য ও পশুসম্পদ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

সমন্বিত কার্যক্রম

এফসিডিআই প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে একটি জলাশয়কে কেন্দ্র করে একাধিক সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে বহুমুখী আয়ের ব্যবস্থা করা। বরোপিট, খাল, বদ্ধ নদী, পুকুরের যে কোন একটি জলাশয়কে কেন্দ্র করে ১৪টি প্যাকেজ কর্মসূচীর সমন্বয়ে এ কার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যায়। এ প্যাকেজগুলো হলো ঃ (১) বরোপিটে মাছ চাষ/ পোনা প্রতিপালন (২) পুকুরে মাছ চাষ/ পোনা প্রতিপালন (৩) খালে মাছ চাষ (৪) বদ্ধ নদীতে মাছ চাষ (৫) মুরগীর খামার (৬) হাঁসের খামার (৭) গরু মোটা-তাজাকরণ (৮) ছাগল খামার (৯) শীতকালীন ঘাস চাষ (১০) গ্রীষ্মকালীন ঘাস চাষ (১১) শাক-সব্জি চাষ (১২) ফলমূলের চাষ (১৩) অবকাঠামো উন্নয়ন এবং (১৪) জলাশয় উন্নয়ন। উপরোক্ত প্যাকেজগুলো বাস্তবায়িত হলে সুফলভোগীদের ১০ ধরনের আয়ের সংগ্রহ হবে। এগুলো হলো (১) বড়মাছ বিক্রি হতে আয় (২) পোনা (৩) মুরগী (৪) হাঁস (৫) ডিম (৬) ছাগল (৭) গরু (৮) শাক-সব্জি (৯) ফল-মূল হতে আয় এবং (১০) সঞ্চয়।

শেষ কথা

বন্যানিয়ন্ত্রণ ও সেচ প্রকল্প এলাকায় এবং অন্যান্য জলাশয় সমন্বিত মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পটি (এফ,সি,ডি,আই) দেশের অব্যাবহৃত পতিত জলাশয়গুলো সংস্কারের আওতাধীন এনে উন্নয়ন পূর্বক সমন্বিত কার্যক্রমে বাস্তবায়ন করায় ইতোমধ্যেই এর সুফল গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মাঝে ব্যাপক উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছে। আশা করা যায়, এর ফলে সামগ্রিক উৎপাদন বৃদ্ধি ও প্রাণীজ আমিষের ঘাটতি পূরণ এবং কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টিসহ গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচন করা সম্ভব হবে।

কাপ্তাই হ্রদে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কৌশল

এম এ হাই
কাপ্তাই হ্রদ মৎস্য উন্নয়ন ও উৎপাদন বৃদ্ধি প্রকল্প

জলবিদ্যুৎ উৎপাদনকল্পে সৃষ্ট কাপ্তাই হ্রদ বাংলাদেশের এমন কি দক্ষিণ এশিয়ার বৃহত্তম কৃত্রিম জলাধার। ১৯৬১ সালে কর্ণফুলী নদীর উপর কাপ্তাই নামক স্থানে বাঁধ দেয়ার ফলে এই হ্রদের সৃষ্টি হয়। এই হ্রদের গড় আয়তন ৫৮,৩০০ হেক্টর। এই হ্রদের পানির সর্বোচ্চ গভীরতা ৩৫ মিটার এবং সর্বনিম্ন গভীরতা ৯ মিটার। সৃষ্টির পর থেকে এই জলাধার বিভিন্ন প্রজাতির উল্লেখযোগ্য পরিমাণ মাছ সরবরাহের মাধ্যমে প্রাণীজ আমিষ যোগান দিয়ে আসছে। প্রতিবছর এই হ্রদ থেকে ৭/৮ হাজার টন মাছ উৎপাদিত হচ্ছে যার বাজার মূল্য ২৫০ মিলিয়ন টাকার অধিক। অত্যধিক গভীরতা, অসম তলদেশ, মাছের প্রাথমিক খাদ্য প্ল্যাংটনের অপ্রতুলতা ইত্যাদি প্রতিকূল পরিবেশ বিরাজমান সত্ত্বেও বিগত ১০ বছরে কাপ্তাই হ্রদে হেক্টর প্রতি বার্ষিক গড় উৎপাদন পাওয়া গেছে প্রায় ১০০ কেজি। প্রতিবেশী দেশের এই ধরনের হ্রদের উৎপাদনশীলতার চেয়ে কাপ্তাই হ্রদের বার্ষিক গড় উৎপাদন বেশী। উদাহরণ হিসাবে ভারতের ভবানীসাগর এবং শ্রীলংকার ভিক্টোরিয়া রিজার্ভায়ারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। যাদের উৎপাদন যথাক্রমে ৮০ কেজি ও ৭৫ কেজি। কাপ্তাই হ্রদে ৭২ প্রজাতির মাছের মধ্যে ৩১ প্রজাতির মাছ বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরিত হয়ে থাকে। মিঠা পানির মাছের মধ্যে রুই, কাতলা, মৃগেল, মহাশোল, কালিবাউস, ঘনিয়া, বাটা, সরপুঁটি, চিতল, আইড়, শোল, গজার, কেচকী, চাপিলা, মলা, কুঁচো চিংড়ি ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া কয়েক প্রজাতির বিদেশী মাছ যথাঃ- সিলভার কার্প, গ্রাস কার্প, কার্পিও, তেলাপিয়া ইত্যাদি কয়েক বছর আগে এই হ্রদে প্রবর্তন করা হয়েছে। হ্রদ এলাকায় স্থানীয় জনগণের চাহিদা মিটিয়ে বন্দর নগরী চট্টগ্রাম, রাজধানী শহর ঢাকাসহ দেশের অন্যান্য স্থানে এই হ্রদের মাছ সরবরাহ করা হয়ে থাকে।

কাপ্তাই হ্রদের সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হলেও রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বর্তমান দশকে আশংকাজনকভাবে হ্রাস পেয়েছে। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিসহ রুই জাতীয় মাছের আশানুরূপ উৎপাদন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ১৯৯৫/৯৬ হতে ১৯৯৯/২০০০ সাল মেয়াদে একটি উন্নয়ন প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে।

চলতি প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য হলো ঃ- (১) হ্রদের অভ্যন্তরে নার্সারী নির্মাণের মাধ্যমে বড় আকারের সহনশীল পোনা উৎপাদন। (২) হ্রদের অভ্যন্তরে উন্নত পদ্ধতিতে মাছ চাষ করা। (৩) মাছ উৎপাদনের সাথে সাথে অবতরণ, সংরক্ষণ ও পরিবহন সুবিধাদি বৃদ্ধিকরণ। (৪) রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন হ্রাসের ওপর বিএফআরআই কর্তৃক গবেষণা পরিচালনা এবং পেন ও কেইজ পদ্ধতি প্রবর্তনের সম্ভাব্যতা যাচাই। (৫) হ্রদের মাছ পাচার রোধকল্পে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারকরণ।

গবেষণা

বাংলাদেশের পূর্ব প্রান্তে খাগড়াছড়ি, রাঙ্গামাটি আর বান্দরবান পার্বত্য জেলা। এরমধ্যে শুধুমাত্র খাগড়াছড়ি ও রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলাতে কাপ্তাই হ্রদের অবস্থান। হ্রদ সৃষ্টির প্রাক্কালে যে সকল পাহাড়ী উপত্যকা পানিতে নিমজ্জিত হয় এবং বর্তমানে সারা বছর অথবা বছরের নির্দিষ্ট সময় পানি ধারণ করে এই সব অসংখ্য পাহাড়ী ঘোনাও মৌসুমী মাছ চাষের উপযোগী।

এ বিষয়টির ওপর গবেষণা পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন কর্পোরেশন চলতি প্রকল্পের আওতায় বাংলাদেশ মাৎস্য গবেষণা ইনস্টিট্যুটকে অর্থায়নের ব্যবস্থা করেছে। এই কর্মসূচীর অধীনে বিএফআরআই জানুয়ারী/ ১৯৯৭ থেকে পেন কালচার বা জালের ঘের দিয়ে পাহাড়ী ঘোনায় মাছ চাষ শুরু করে। রাঙ্গামাটি সদর, নানিয়ারচর এবং লংগদু এই তিন স্থানে তিনটি পরীক্ষামূলক পেন স্থাপন করা হলেও বিভিন্ন প্রতিকূলতার কারণে কেবলমাত্র রাঙ্গামাটি সদরের পেনটি মোটামুটি সাফল্য লাভ করেছে। ৩ একর আয়তনের এই পেন থেকে এক বছরে প্রায় ৫০ হাজার টাকার মাছ বিক্রি করা হয়েছে। স্থানীয় জনসাধারণকে সম্পৃক্ত করে উৎপাদনের অংশ (৫১% ঃ ৪৯%) বন্টন ভিত্তিতে বর্তমান

বছরেও বিএফআরআই বিভিন্ন স্থানে ৬টি পেন স্থাপনের কার্যক্রম গ্রহণ করেছে। এই গবেষণা কার্যক্রম কৃতকার্য হলে পেন কালচার পদ্ধতিতে মাছ চাষ সম্প্রসারণের পথ সুগম করবে। যা স্থানীয় জনসাধারণের দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক হবে।

পাহাড়ি ঘেরে পোনা প্রতিপালন

জাল দ্বারা ঘের তৈরী করে পোনা উৎপাদনের সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের জন্য কর্পোরেশনের পক্ষ থেকে ১৯৯৭ সালে রাঙ্গামাটি সদর হাসপাতাল এলাকায় প্রায় ১২ একর আয়তন বিশিষ্ট ঘোনায় পরীক্ষামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়। চুন, সার ও সম্পূরক খাদ্য প্রয়োগসহ অন্যান্য পরিচর্যার মাধ্যমে ২৮ হাজার ৯-১০ সেঃমিঃ আকারের পোনা প্রতিপালন করা হয়ে থাকে। পানি সরে যাওয়ার কারণে আড়াই মাস পরে প্রায় ২০/২৫ সেঃমিঃ আকারের ১৫ হাজার পোনা আহরণ করে মূল হ্রদে অবমুক্ত করা হয়। স্বল্প সময় হলেও এই কার্যক্রমে পোনার বৃদ্ধি পাওয়া গেছে আশাব্যঞ্জক। আর্থিক বিশ্লেষণেও এই কর্মসূচীটি সফল বলে বিবেচিত হয়েছে। উপরোক্ত গবেষণা ও বাস্তব প্রয়োগ পদ্ধতির সফলতার ওপর ভিত্তি করে বর্তমান বছর থেকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে নিম্নোক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে।

পোনা প্রতিপালন ও মাছ চাষ

কাপ্তাই হ্রদে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদন বৃদ্ধিকল্পে প্রতি বছর ৩০-৪০ টন রুই, কাতল, মৃগেল ইত্যাদি মাছের পোনা অবমুক্ত করা হয়ে থাকে। এরূপ বিপুল পরিমাণ পোনা নিকটবর্তী কোন স্থান হতে সংগ্রহ করা সম্ভব না হওয়ায় অনেক দূরবর্তী স্থান বিশেষ করে কুমিল্লা এলাকা হতে সংগ্রহ করা হয় বিধায় পরিবহনকৃত পোনার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ পথিমধ্যে এবং কিছু পোনা হ্রদে অবমুক্তির পর মারা যায়। তাছাড়া পরিবহনকৃত পোনা দুর্বল/ক্লান্ত থাকার কারণে অবমুক্তির পর অনেক পোনা হ্রদে অবস্থিত চিতল, বোয়াল, গজার, শোল ইত্যাদি রাক্ষুসে মাছের শিকারে পরিণত হয়। ফলে পোনা অবমুক্তির বিপরীতে ইপ্সিত ফল লাভ করা সম্ভব হচ্ছে না। দূরবর্তী স্থান হতে পোনা সংগ্রহ করে অবমুক্তির ক্ষেত্রে উদ্ভূত সমস্যা মোকাবিলার উদ্দেশ্যে হ্রদের পরিবেশে প্রতিপালিত পোনা অবমুক্তির বিষয়টি গভীরভাবে বিবেচনায় আনা হয়। বিশেষজ্ঞ পর্যায়ের সুপারিশ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে আলোচনার ভিত্তিতে হ্রদের পরিবেশে পোনা প্রতিপালনের একটি কর্মসূচী ইতিমধ্যে হাতে নেয়া হয়েছে।

একটি বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রতিষ্ঠানের সাথে ১০ বছর মেয়াদী একটি চুক্তি করা হয়েছে। চুক্তি মোতাবেক উক্ত প্রতিষ্ঠান উল্লেখিত জলাশয়ে প্রতিপালিত রুই জাতীয় মাছের পোনা হতে প্রথম ৫ বছর ২৫ টন হারে এবং পরবর্তী ৫ বছর ২৬ টন করে নির্ধারিত আকারের পোনা হ্রদের মূল অংশে অবমুক্ত করবে। অবশিষ্ট পোনা হতে চাষকৃত মাছের বিপরীতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্পোরেশনের নির্দ্ধারিত রয়েলটি/ শেয়ার প্রদান করে তাদের মাছ বাজারজাত করতে পারবে। এসব কাজে প্রয়োজনীয় লোকবল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্যে হতে নিয়োগ করতে হবে বলে চুক্তিপত্রে বাধ্যবাধকতা রয়েছে।

পোনা/মাছ চাষের জন্য চুক্তিবদ্ধ খামারী কার্যক্রম শুরু করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের পক্ষ হতে মে/৯৮-এর শেষ সপ্তাহ হতে কয়েক দফায় প্রায় দুই কোটি রেণু/ ধানী পোনা সংশ্লিষ্ট এলাকায় ছাড়া হয়েছে এবং সম্পূরক খাদ্য সরবরাহ ও অন্যান্য প্রযুক্তি প্রয়োগ করে যথানিয়মে পরিচর্যা করা হচ্ছে। প্রতিনিয়ত পরীক্ষা করে দেখা গেছে প্রতিপালনাধীন পোনার বৃদ্ধির হারও সন্তোষজনক। যৌথ উদ্যোগে পোনা প্রতিপালন কর্মসূচীর জন্য প্রয়োজনীয় লোকবল স্থানীয় জনসাধারণের মধ্য হতে নিয়োগ করা হয়েছে। এ যাবৎ নিযুক্ত ২০ জন স্থানীয় যুবক বর্তমানে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অধীনে কাজ করছে।

এই কার্যক্রম সফল হলে বছরে ২৫/৩০ লক্ষ টাকা সাশ্রয় হবে। অপরদিকে স্থানীয়ভাবে হ্রদের পরিবেশে প্রতিপালিত পোনা সবল অবস্থায় লেকে অবমুক্ত করার ফলে আগামীতে রুই জাতীয় মাছের উৎপাদনসহ হ্রদের সামগ্রীক মাছ উৎপাদন বৃদ্ধি পাবে।

শেষ কথা

প্রাকৃতিকভাবে উৎপাদিত ও অবমুক্ত রুই জাতীয় মাছ উৎপাদনের পাশাপাশি পাহাড়ী ঘোনায় মাছ চাষ সম্প্রসারণ সম্ভব হলে অত্র অঞ্চলের অধিবাসী বেকার যুবক, দুস্থ মহিলা মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের দারিদ্র্য বিমোচনসহ নতুন কর্মসংস্থানের পথ খুলে যাবে। অপরদিকে জাতীয় আয় কৃষি ছাড়াও প্রাণীজ আমিষ সরবরাহে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি সাধিত হবে।

অংশীদারিত্বমূলক মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প ব্যবস্থাপনা

মোঃ আবদুল খালেক
সৈয়দ আরিফ আজাদ
মৎস্য অধিদপ্তর

কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত এ দেশের জাতীয় আয় বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান, দারিদ্র্য বিমোচন এবং পুষ্টি চাহিদা পূরণে ক্রমবর্ধমান হারে অনন্য অবদান রেখে চলেছে মৎস্য খাত। মৎস্য খাতের এ ধারা অব্যাহত রাখার পক্ষে আভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয় থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য মৎস্য অধিদপ্তর কতিপয় বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এমন একটি পদক্ষেপের সফল উদাহরণ - ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প। ১৯৯০ সালের জুলাই মাস থেকে ময়মনসিংহ জেলার ৬টি থানায় একটি পাইলট প্রকল্প হিসেবে এর যাত্রা শুরু হয়। প্রাথমিক পর্যায়ে এ প্রকল্পের মূল লক্ষ্য ছিল - উন্নত মৎস্য চাষ পদ্ধতি সম্প্রসারণের মাধ্যমে লক্ষ্য জনগোষ্ঠী (ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষী)-এর

১. আত্মকর্মসংস্থান
২. পুঁজি সংগঠন এবং
৩. দারিদ্র্য বিমোচন

এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য নিম্নলিখিত কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় ঃ-

(ক) প্রদর্শনী পুকুর স্থাপনের মাধ্যমে মৎস্য চাষে উদ্বুদ্ধকরণ ঃ প্রকল্পের শুরুতেই সংশ্লিষ্ট এলাকার জনসাধারণকে উন্নত মাছ চাষের কলাকৌশল হাতে কলমে শেখানো ও উৎসাহিত করণের লক্ষ্যে নির্বাচত পুকুরে প্রদর্শনী মৎস্য চাষ কার্যক্রম শুরু করা হয়। ১ম ধাপে ৪৩ হেক্টর জলায়তনে ৫১১টি প্রদর্শনী পুকুর পরিচালিত হয় - যার মাধ্যমে ১১৬ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদন সম্ভব হয়। ১৯৯৩-৯৪ সালে আরও ৫.৯ হেঃ এলাকায় ১২৮টি পুকুরে এ জাতীয় কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়। এ প্রদর্শনী মৎস্য চাষ কার্যক্রম এলাকার জনসাধারণের মাঝে ব্যাপক সাড়া জাগাতে সক্ষম হয়।

(খ) ঋণ কার্যক্রম ঃ প্রকল্পের শুরু থেকেই ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষীদের মৎস্য চাষে অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রযুক্তিগত সহায়তার পাশাপাশি বিনা বন্ধকী (without collateral) ঋণ প্রদান কার্যক্রম চালু করা হয়।

কার্প জাতীয় মাছের মিশ্র চাষ ও নার্সারী স্থাপনের জন্য ১ম ধাপে ৮২৩ জন চাষীর মাঝে ৮৫.৮৫ লক্ষ টাকা ঋণ বিতরণ করা হয়। এর মাঝে শতকরা ভাগ ছিলেন মহিলা চাষী। ১-৩ বৎসর মেয়াদী এ ঋণের প্রায় শতকরা ৯৯ ভাগ আদায় করা সম্ভব হয়।

পরবর্তী পর্যায়ে (২য় ধাপের শুরুতে) প্রকল্প থেকে ঋণ বিতরণের পাশাপাশি বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহকে সম্পৃক্ত করে এ কার্যক্রম জোরদার করার উদ্যোগ নেয়া হলেও কৌশলগত কারণে এনজিও'দের সম্পৃক্ততার বিষয় বিবেচনায় আনা হয়।

(গ) সংযোগ চাষী কার্যক্রম ঃ প্রকল্প এলাকায় ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে যাতে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয় সেজন্য প্রদর্শনী ও ঋণদান কার্যক্রমের পাশাপাশি সংযোগ মৎস্য চাষী নির্বাচনের মাধ্যমে তাদের প্রশিক্ষণ ও প্রযুক্তিগত সহায়তা প্রদান করে মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ কার্যক্রম জোরদার করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হয়। ১ম ধাপ ও ২য় পর্যায়ের ১ম দিকে ১৯৯৪ সাল পর্যন্ত এ কার্যক্রমে মোট ২৫৯৪ জন চাষী অন্তর্ভুক্ত হন। এ সকল চাষীর পুকুরের মোট আয়তন ২৯৭ হেঃ এবং উৎপাদন ১০৬৫ মেট্রিক টন মাছ।

(ঘ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঃ প্রকল্পের আওতাভুক্ত সকল পর্যায়ের মাছ চাষীদের জন্য নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি প্রকল্প এলাকায় কর্মরত সকল পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

প্রকল্পের ১ম ধাপের অভূতপূর্ব সাফল্যে দাতা সংস্থা ডানিডা (DANIDA) প্রকল্পকে ২য় ধাপ পর্যন্ত সম্প্রসারণের সুপারিশ করে। সরকার ও দাতা সংস্থার সমঝোতার প্রেক্ষিতে ১৯৯৩ সালের জুলাই মাস থেকে নতুন করে বৃহত্তর ময়মনসিংহ এবং গাজীপুর তথা ৭টি জেলার ২৬টি থানায় প্রকল্প কার্যক্রমের ২য় পর্যায় বাস্তবায়ন শুরু হয়। এপ্রিল ১৯৯২ সালে দাখিলকৃত প্রজেক্ট ডকুমেন্টে বিবৃত এপ্রাইজাল রিপোর্ট অনুযায়ী ২য় ধাপের ১ম বছর প্রকল্প থেকে লক্ষ্য জনগোষ্ঠী তথা ভূমিহীন ও প্রান্তিক মৎস্য চাষীদের সরাসরি ঋণ প্রদানের প্রস্তাব রাখা হয়। ২য় বছর থেকে বাণিজ্যিক ব্যাংক এবং উপযুক্ত এন.জি.ও-কে এ কাজে সম্পৃক্ত করতে পরামর্শ দেয়া হয়।

প্রদর্শনী ও ঋণ প্রদান কার্যক্রম ১ম ধাপের মত অব্যাহত রাখার পাশাপাশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম আরও শক্তিশালী করার জন্য ২য় ধাপে থানা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা নিয়োজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

১৯৯৩ থেকে ১৯৯৭ পর্যন্ত এন.জি.ও-দের অংশগ্রহণ ব্যতিরেকেরই প্রকল্প কার্যক্রম অব্যাহত রাখা হয়। নানা কারণে এ সময়ের মাঝে এন.জি.ও সম্পৃক্ত করা সম্ভব হয়নি। এরই মাঝে মধ্যবর্তী মূল্যায়ন (যা ১৯৯৬ সালে দাতা সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত হয়) রিপোর্ট অনুযায়ী বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ, দাতা সংস্থা এবং সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সমূহের গোলটেবিল বৈঠকের আলোচনা ও সমঝোতা অনুযায়ী ১৩-৫-৯৮ তারিখ থেকে ত্রিপাক্ষিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে এ প্রকল্পের নতুন পদযাত্রা শুরু

হয়েছে। এদিন এন.জি.ও, দাতা সংস্থা (ডানিডা) এবং সরকারের মনোনীত প্রতিনিধির মাঝে সমঝোতা স্মারক (এম.ও.ইউ) স্বাক্ষরিত হয়েছে।

নব আঙ্গিকে ২য় ধাপ

প্রকল্পের ২য় পর্যায়ে ভৌত লক্ষ্যমাত্রা ছিল ২০০০ সালের মাঝে ২৫০০০ পুকুরে গড় পড়তা ২.৫ টন/হেক্টর মাছ উৎপাদন করা হবে। ইতিমধ্যে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত ২০,০০০ পুকুরে ঋণ প্রদান/প্রযুক্তি সম্প্রসারণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন সম্ভব হয়েছে। অবশিষ্ট ৫০০০ পুকুরে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণের লক্ষ্যে এন.জি.ওদের উপর ঋণ প্রদানের দায়িত্ব হস্তান্তর করা হয়েছে। ত্রিপাক্ষিক অংশগ্রহণের মাধ্যমে প্রকল্পের কাজে নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে।

বর্তমানে বাস্তবায়নাধীন কার্যাবলীর কতিপয় কৌশল নিম্নে বর্ণিত হলো

- উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি সম্প্রসারণে এক কেন্দ্রিক লক্ষ্যমাত্রার (individual approach) পরিবর্তে দলীয় লক্ষ্যমাত্রায় (group approach) কাজ করা।
- ঋণ কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মৎস্য চাষী দল গঠনের মাধ্যমে ক্ষুদ্র ঋণ সহায়তা (micro credit) প্রদান করা
- প্রযুক্তি হস্তান্তরের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণমূলক কর্ম সম্পাদন ও শিখন (Participatory Action Learning-PAL) পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা।
- কম ব্যয় (Low-cost) করে মাছ উৎপাদন করার পদক্ষেপ গ্রহণ- সম্ভাব্য উৎপাদন উপকরণ চাষীর নিজ উদ্যোগে আহরণ ও বিনিয়োগ করা যেমন ঃ গোবর, ক্ষেত্র বিশেষ কুড়া ইত্যাদি।
- সহজ শর্তে এনজিওদের মাধ্যমে ঋণদান কর্মসূচি।
- পুনঃপৌনিক (Repeated) মাছ ধরা (Harvesting) এবং পুনঃমজুদ (Re-stocking) কৌশল অবলম্বন,
- নিম্ন পর্যায় থেকে মৎস্য চাষী দল (Fish Farmers Group, - FFG) এর মাধ্যমে প্রকল্প প্রস্তাবনা তৈরী (bottom up planning) ও বাস্তবায়ন।
- ১০-১৫ জন সদস্যের যে মৎস্য চাষীদল গঠিত হবে সেখানে খাবার মাছ উৎপাদনকারী মৎস্য চাষী, নার্সারী পরিচালনাকারী, পোনা ব্যবসায়ী, মাছ ধরা ও বাজারজাতকারী, উপকরণ প্রস্তুতকারী (যেমন ঃ জাল নির্মাতা) প্রভৃতি মাছ চাষ ও ব্যবস্থাপনার বহুমুখী কর্মে নিয়োজিত ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করা (দলের বহুমাত্রিকতা বৃদ্ধি করার জন্য)।
- চাষীদল-এর নির্বাহী কমিটি গঠন করে স্থানীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণক্ষম নেতৃত্ব গড়ে তোলা।
- সকল পর্যায়ে মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও ক্ষমতায়নের উপযোগী পরিবেশ গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখা।
- প্রকল্প মেয়াদ শেষ হওয়ার পরও (অন্যূন ৫ বছর) প্রচলিত কার্যক্রম পরিচালনার জন্য এন.জিও-ডি.ও.এফ (NGO-DOF) সহযোগিতা অব্যাহত রাখা। [এ ছাড়াও প্রকল্প ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে কতিপয় নতুন ও অভিনব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে। এর মাঝে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হলো ঃ-
- কেন্দ্রীয় প্রকল্প ব্যবস্থাপনা (CPM) এর ক্ষেত্রে সরকার ও দাতা সংস্থার অংশীদারিত্বের পাশাপাশি সহযোগী এনজিওদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করা হয়েছে।
- দল গঠনে ও প্রেরণা সৃষ্টি, প্রশিক্ষণ, সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি, প্রযুক্তি হস্তান্তর ও ঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন - প্রতিটি ক্ষেত্রে ডিওএফ (DOF), ডিটিএ (DTA) এবং এনজিও (NGO) দেরও সরাসরি অংশগ্রহণের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা হয়েছে।
- প্রকল্পভুক্ত কর্মকর্তাগণের মাঝ থেকে প্রশিক্ষণ কর্মকর্তা ও থানা মহিলা উন্নয়নকারী এবং তদ্‌নিম্নপদস্থ কর্মচারীগণকে সংশ্লিষ্ট এনজিওদের নিকট ন্যাস্ত করা হয়েছে - প্রকল্প মেয়াদে এদের যাবতীয় ব্যয় (যথা ঃ বেতন-ভাতাদি) ডিটিএ (DTA) বহন করবে। এটা করা হয়েছে ইতিমধ্যে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত ও অভিজ্ঞ জনবলকে এনজিওদের সহায়তাদানে নিযুক্ত করার জন্য যাতে প্রকল্পের কাজ সহজে সুচারুরূপে সম্পন্ন করা সম্ভব হয়।
- কেন্দ্রীয় ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি জেলা ও থানা পর্যায়েও ত্রি-পাক্ষিক ব্যবস্থাপনার প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো তৈরী করা হয়েছে।
- এনজিও-দের ভৌত সুবিধাদি হিসেবে অফিস ও সম্প্রসারণ সরঞ্জামাদি, যানবাহন ইত্যাদি প্রকল্প মেয়াদকালীন সময়ে ব্যবহারের জন্য প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সরবরাহ করা হয়েছে।

আশা করা যায় নতুন পর্যায়ে প্রকল্পের এ পদযাত্রার মধ্যমে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি করে একটি সফল, লাভজনক কর্মসূচী কাঙ্খিত লক্ষ্যে পৌঁছুতে সক্ষম হবে। একই কৌশল অবলম্বন করে পটুয়াখালী, বরগুনা মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং বৃহত্তর নোয়াখালী জেলায় মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।

অভ্যন্তরীণ উন্মুক্ত জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদনের ক্রমহ্রাসমান প্রবণতার মোকাবেলায় ময়মনসিংহ মৎস্য চাষ সম্প্রসারণ প্রকল্প একটি সাহসী ও বাস্তবমুখী কর্মপ্রয়াস হিসেবে ইতিমধ্যে চিহ্নিত হয়েছে।

আমাদের প্রত্যাশা

প্রকল্পের লক্ষ্য জনগোষ্ঠীর তথা ভূমিহীন ও প্রান্তিক চাষীগণ, মহিলা ও পুরুষ উন্নত মৎস্য চাষ পদ্ধতি অনুসরণ করে আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডে সরাসরি অংশগ্রহণ করে স্ব-কর্ম সংস্থানে সক্ষম হবেন, যার ফলশ্রুতিতে তাদের আর্থসামাজিক অবস্থান ও ভৌত অবস্থার উন্নয়ন হবে। থানা পর্যায়ে মৎস্য চাষ উন্নয়ন ও সম্প্রসারণের বর্তমান ক্ষমতা আরো বাড়বে এবং প্রকল্প এলাকার বদ্ধ জলাশয়ে উন্নত মৎস্য চাষ প্রযুক্তি প্রয়োগের ফলে মৎস্য উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পাবে। এনজিওদের মাধ্যমে পুকুর পরিচালনাকারীগণ মৎস্য উৎপাদনের জন্য সহজ শর্তে ঋণ সহায়তা প্রাপ্তির বিষয়ে নিশ্চয়তা লাভ করবেন।

মৎস্য চাষে পল্লী উন্নয়ন

এ. কে বর্মণ
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

ভূমিকা

বাংলাদেশের আয়তন ১,৪৩,৯৯৮ বর্গ কিলোমিটার এবং জনসংখ্যা প্রায় ১২ কোটি। ঘনবসতিপূর্ণ এ দেশটিতে গড়ে প্রতি বর্গকিলোমিটারে ৮০০ জনেরও বেশী লোক বাস করে। অভ্যন্তরীন জলাশয়ে ১৪৭ লক্ষ হেক্টর আয়তনের ১৩ লক্ষ চাষোপযোগী পুকুর দীঘি রয়েছে। অতএব কৃষকদের জীবন ধারণের জন্য সমন্বিত উন্নত চাষ পদ্ধতিতে প্রয়োজনীয় খাদ-শস্য, শাকসব্জি, ফলমূল, মাছ, মুরগী ইত্যাদি উৎপাদন করে আমাদের চাহিদা পূরণ করা ছাড়া অন্য কোন গত্যন্তর নাই। বিশ্বের দরবারে আমরা মাছে-ভাতে বাঙ্গালী। খাদ্য তালিকায় মাছ আমাদের অতি প্রিয় এবং অন্যতম সুস্বাদু ও পুষ্টিকর খাদ্য। সুজলা-সুফলা, শস্য-শ্যামলা নদীমাতৃক এদেশটি স্মরণাতীত কাল হতেই মৎস্য সম্পদে সমৃদ্ধ হওয়া সত্ত্বেও বর্তমানে চাহিদার তুলনায় মাছের উৎপাদন প্রায় অর্ধেক। এ কারণে বাজারে মাছের প্রাপ্তি খুবই কম, মূল্য বেশী, অথচ মৎস্য সম্পদ বাড়ানোর ব্যাপক সম্ভাবনা রয়েছে। এ ছাড়াও রয়েছে বিস্তৃত জলাশয় ও উপযুক্ত মৎস্য প্রজননের সহনশীল পরিবেশ। একটু মনোযোগী হলেই আমরা উন্নত পদ্ধতিতে মাছের চাষ করে পুষ্টি ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি করে পারিবারিক আয় বৃদ্ধি করতে পারি, দেশকে দরিদ্রতার অভিশাপ থেকে মুক্ত করে মৎস্যচাষে আমাদের অবহেলিত অনুন্নত পল্লী সমাজকে আর্থ সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারি। দেশের ক্রমবর্ধমান পুষ্টির চাহিদা পূরণ, কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং জাতীয় অর্থনীতিতে বিভিন্ন জলাশয়ে মাছচাষ সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র হিসেবে পরিণত হতে পারে। মাছচাষে চাষীরা সমপরিমাণ আবাদী জমি অপেক্ষা অনেক বেশী লাভবান হতে পারেন। খাদ্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল হিসেবে আমাদের গ্রাম বাংলার ভাই ও বোনদের ব্যাপকহারে মৎস্য চাষে এগিয়ে আসতে হবে। বাড়ির আঙিনায় অবস্থিত পুকুরে নারী সমাজও মাছচাষে সম্পৃক্ত হতে পারে, আপনার আয় বৃদ্ধিতে সহায়তা করতে পারে। এভাবে সকলে মিলে মাছচাষ করলে যে সুযোগ এবং সম্ভাবনা আমাদের রয়েছে তাতে পুষ্টির অভাব ও গ্রামীণ দরিদ্রতা দূর করে সুখী ও সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গড়ে তোলা কোনই কঠিন কাজ নয়।

উন্নয়ন কর্মকান্ড

প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত কারণে বাংলাদেশের মৎস্য উৎপাদনের বিস্তর ক্ষেত্র রয়েছে। ক্রমবর্ধমান মৎস্য চাহিদা পূরনের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের বদ্ধজলাশয় ও অভ্যন্তরীন মুক্তজলাশয়সহ বিশাল জলসম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য নিরলস প্রচেষ্ঠারত আছে।

আমাদের পল্লী অঞ্চলে রয়েছে অসংখ্য দীঘি, পুকুর, ডোবা, নালা যেখান থেকে আমরা পরিবারের পুষ্টির অভাব পূরণ করেও আর্থিক স্বচ্ছলতার পথ খুঁজতে পারি। এ সকল জলাশয়ের মধ্যে প্রায় ১ লক্ষ হেক্টর খাস পুকুর-দীঘি, বিল-বাঁওড়, ছড়া, পথিপার্শ্বিক ডোবা-নালা, সেচ প্রকল্প এলাকার বড়োপিট ও সেচনালা ইত্যাদিতে মাছ চাষের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও পতিত অথবা কম ব্যবহৃত অবস্থায় রয়েছে। দেশের জলজসম্পদের সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা করে দেশে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে পুষ্টি সরবরাহ, কর্মসংস্থান, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জন, বিবিধ প্রকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি আর্থ-সামাজিক কর্মাকন্ডের ব্যাপারে মৎস্য সম্পদের বর্তমান অবদান ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করার সম্ভাবনা প্রচুর। এসব সম্ভাবনার আলোকে পতিত ও অব্যবহৃত জলাশয় সংস্কার এবং আধুনিক প্রযুক্তি প্রয়োগ করে ব্যাপকভাবে মৎস্যচাষ সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বিশ্বখাদ্য কর্মসূচী ও ইইসি বাংলাদেশে দারিদ্র্য দূরীকরণ, উৎপাদন বৃদ্ধি ও লক্ষ জনগোষ্ঠীর কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে সহায়তা প্রদানের জন্য জলাশয়ের উন্নয়নের নিমিত্তে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর আওতায় খাদ্য সহায়তা প্রদান করে আসছে। এখাদ্য সহায়তার মাধ্যমে প্রতি বছর হাজা-মজা পতিত জলাশয় সংস্কার করা হচ্ছে। এছাড়া বিভিন্ন বেসরকারী এনজিও তাদের কার্যক্রমের আওতায় মহিলাদের দল গঠন ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র মহিলাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন সাধন করছে।

সামাজিক আন্দোলন

মৎস্য চাষে পল্লীর বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর ভাগ্য উন্নয়ন করতে হলে মৎস্য চাষকে একটা সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তুলতে হবে। কৃষিনির্ভর বাংলাদেশের উন্নয়ন বহুলাংশে নির্ভর করে মৎস্য সম্পদের উপর। ইতিমধ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা মৎস্য চাষে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করে একটি সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন।

মৎস্য চাষকে সামাজিক আন্দোলন হিসেবে গড়ে তোলার প্রয়াসে জনগণের সচেতনতা বৃদ্ধি ও আগ্রহ সৃষ্টি এবং প্রযুক্তির সম্প্রসারণ প্রয়োজন। প্রতিবছর এই সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার প্রয়াসেই মৎস্য সপ্তাহ বা মৎস্য পক্ষ উদ্‌যাপন করা হয়। মৎস্য সম্পদ বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়ন, বিপুল জনগোষ্ঠীর দারিদ্র্য বিমোচন, কর্মসংস্থান, প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণে সহায়তা করে। বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য খাতের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সম্ভাবনাময়।

সমন্বিত মৎস্য চাষ

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার শতকরা ১০ ভাগ লোকের খন্ডকালীন কর্মসংস্থানের উৎস হচ্ছে এই মৎস্য সেক্টর।

গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর শতকরা ৭৩ ভাগ কোন না কোনভাবে মৎস্যচাষ, উৎপাদন, বিপণন ইত্যাদির সাথে জড়িত। কিন্তু দুঃখের বিষয় আমাদের চাহিদার তুলনায় উৎপাদন আশানুরূপ নহে। মাছের উৎপাদন বাড়াতে হলে ক্ষুদ্র চাষীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে। গ্রামের জনগণ দরিদ্র ও ভূমিহীন বিধায় অনেকে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও অর্থের অভাবে মাছ চাষ করতে আগ্রহী নয়।

আসলে মাছ চাষ এমন একটি কাজ যা অতি সহজে এবং বেশ কম খরচে করা যায়। যেমন নিজের বাড়িতে পুকুর না থাকলে অন্য কারো পুকুর ইজারা নেয়া যায়। তাও যদি না হয় তবে রাস্তার পার্শ্বে পতিত ডোবা বা খালে মাছ চাষ করা যেতে পারে। এবার মাছের খাবারের দিকে যাই। মাছ পানিতে বিদ্যমান শেওলা ও প্রাণিকণা খেয়ে বড় হয়। এছাড়া পরিমাণ মত সার, গোবর প্রয়োগ করে পানিতে মাছের প্রাকৃতির খাদ্য জন্মাতে পারে। এছাড়া খৈল, কুড়া, ভূষি, জবাইকৃত পশুপাখির নাড়িভুড়ি, রক্ত, নানা প্রকার কচুরিপানা ইত্যাদি। এগুলো সংমিশ্রণ করে নিজেরাই খাদ্য তৈরী করে মাছকে খাওয়াতে পারি।

এছাড়া সমন্বিত চাষ প্রক্রিয়ায় ধানের সাথে মাছ চাষ করে এক রকম বিনা খরচেই মাছ উৎপাদন করে বাড়তি আয় করে নিতে পারি। ধান চাষকালে ক্ষেতে একরে ১২০০ রাজপুঁটি, তেলাপিয়া, অথবা মিরর কার্পের উপযুক্ত পোনা ছাড়া যেতে পারে। ক্ষেত্র বিশেষ গলদা চিংড়িও দেয়া যায়। ধান আবাদের জন্য ক্ষেতে যে সার ও গোবর ব্যবহার করা হয় তা মাছেও কাজে লাগবে। মাছের জন্য কোন বাড়তি খাদ্যের প্রয়োজন হয় না। একই সাথে ধানের ক্ষেতে একরে ১৫০-২০০ কেজি মাছ আমরা ইচ্ছে করলেই উৎপাদন করে নিতে পারি।

অপর দিকে হাঁস-মুরগীর সাথে মাছের চাষ করে বিনা খরচে একর প্রতি ২ টনের বেশী মাছ উৎপাদন করতে পারি। এতে মাছে অন্য কোন খাবার দিতে হয় না। হাঁস মুরগীর যে বিষ্ঠা পুকুরে পড়ে তা দিয়েই মাছের জন্য খাবার তৈরী হয়। এই প্রযুক্তিতে আমরা অল্প খরচে পুকুরের উপর হাঁস-মুরগীর ঘর তৈরী করে তাতে প্রতি একরে ২০০ হাঁস অথবা মুরগী প্রতি পালন করে আমরা অতিকম খরচে ও একই সাথে মাছ-মাংস ও ডিমের চাহিদা পূরণ করতে পারি। খাদ্য ছাড়াও অর্থকরী ফসল হিসাবে গ্রাম ও শহরের জনগণকে ব্যাপকহারে মৎস্য চাষে এগিয়ে আসতে হবে। বাংলাদেশের গ্রামীণ পরিবারগুলো গৃহপালিত পশুপাশি এবং মাছ চাষের সমন্বয় সাধনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। প্রতি হেক্টর পুকুরে বছরে ৩৫০০-৪৫০০ কেজি মাছ, ৯০০০০-১২৫০০০ হাঁসের ডিম এবং ৫০০-৭০০ কেজি হাঁসের মাংস উৎপন্ন হতে পারে। পল্লীর দরিদ্র জনগোষ্ঠীকে একমাত্র মৎস্য চাষের মাধ্যমেই তাদের ভাগ্য লক্ষীর আগমন ঘটতে পারে।

একটি সম্ভাবনাময় কর্মসূচী

মৎস্য চাষে পল্লী উন্নয়ন নিঃসন্দেহে একটি সম্ভাবনাময় কর্মসূচী। বাংলাদেশে ক্রমবর্ধমান মৎস্য চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে মৎস্য অধিদপ্তর দেশের বিশাল জলরাশি ও মৎস্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের জন্য নিরলস প্রচেষ্টারত। বদ্ধ জলাশয়সমূহে উন্নত পদ্ধতিতে মৎস্য চাষের জন্য মৎস্য অধিদপ্তর সকল প্রকার কারিগরি জ্ঞান প্রদান করে থাকে। অনাবাদী পুকুরসমূহে আবাদকল্পে যে সকল সমস্যা রয়েছে তা দূর করে ঐ সকল জলাশয় মৎস্য চাষের জন্য স্থানীয় মৎস্য বিভাগের কর্মীগণ প্রকল্প প্রস্তুতপূর্বক ব্যাংক ঋণের সুপারিশ করে থাকে।

মৎস্য অধিদপ্তরের আওতাধীন মৎস্যবীজ উৎপাদন খামার হতে উৎপাদিত রেণু পোনা সুলভমূল্যে মৎস্য চাষীদের নিকট সরবরাহ করে থাকে। সফল ও উৎসাহী মৎস্য চাষীদের মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকে। প্রয়োজনে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণ করে থাকে। গ্রাম পর্যায়ে বেকার যুবকদের সংগঠিত করে সমবায়ভিত্তিক মৎস্য চাষে সংগঠিত করে থাকে।

বাংলাদেশের দরিদ্র জনগণের সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত করে মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনায় তাদের অবদান নিশ্চিত করার জন্য মৎস্য অধিদপ্তর ছাড়াও যে সকল সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের বাস্তব অভিজ্ঞতা রয়েছে তারা এক্ষেত্রে কার্যকর ও উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

পুকুর মালিকদের মৎস্য সম্পদের উন্নত ব্যবস্থাপনায় সম্পৃক্ত করার জন্য মৎস্য বিভাগীয় কর্মকান্ডের পাশাপাশি তাদেরকে অর্থ বিনিয়োগ, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও পরিবেশের প্রভাব ইত্যাদি বিষয়ে সচেতন করে তোলার জন্য সরকারী পর্যায় ছাড়াও বিভিন্ন বেসরকারী সংস্থা ও এন.জি.ও নিরলস কাজ করে যাচ্ছে বিশেষ করে মৎস্য চাষের মাধ্যমে গ্রামীণ জনগণের ভাগ্য উন্নয়নের মাধ্যমে পল্লী উন্নয়ন বাস্তবায়িত করার প্রয়াসে।

মৎস্য চাষের মাধ্যমে পল্লীর জনগণের ভাগ্য উন্নয়ন এই সম্ভাবনাময় কর্মসূচীর মাধ্যমে আমাদের গ্রাম বাংলার মহিলাগণ সাংগঠনিক কাজ কর্মের পাশাপাশি মাছ চাষ বাড়তি আয়ের সংস্থান এবং পরিবারের সদস্যদের পুষ্টির ব্যবস্থা করতে পারেন।

প্রতিটি উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে মহিলাদের অংশগ্রহণ অপরিহার্য। নারী সমাজের উন্নতির উপর মূলতঃ জাতীয় কল্যাণ ও সমৃদ্ধি বহুলাংশে নির্ভর করে বিশেষ করে মৎস্য চাষে পল্লী উন্নয়ন কর্মকান্ডে মহিলাদের সঠিক উন্নয়ন এবং অধিকার সংরক্ষণ সরকারের এক বলিষ্ঠ নীতি।

উপসংহার

বাংলাদেশ নিম্ন আয় ও ঘনবসতিপূর্ণ একটি দরিদ্রতম দেশ। জনসংখ্যার শতকরা প্রায় ৮৫ জন লোক বাস করে গ্রামীণ এলাকায়। নিম্ন আয়, ভূমিহীন, বেকারত্ব গ্রামীণ জীবনের নিত্যসহচর। গ্রামের উন্নয়নের উপরই নির্ভর করে সমগ্র দেশের উন্নয়ন। উন্নয়নের সুফল সুষম বন্টনের লক্ষ্যে নিম্নতম আয়ের দরিদ্র শ্রেণীর জনগণের উপযুক্ত ও তাদের সাধ্যের মধ্যে সহজলভ্য স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে। এ লক্ষ্য অর্জনে উপযুক্ত, টেকসই ও যথাযথ কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আত্মকর্মসংস্থান সৃষ্টিতে, পল্লী উন্নয়নে ও দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য চাষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে এবং অদূর ভবিষ্যতেরও পালন করবে উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে।

রুই জাতীয় মাছ চাষ ও সম্প্রসারণ কৌশল

মোঃ আবদুল লতিফ খান
মৎস্য অধিদপ্তর ঢাকা।

বাংলাদেশে দ্রুত বর্ধনশীল মাছ সমুহের মধ্যে রুই, কাতলা, কালিবাউস, মৃগেল, সিলভার কাপ, কমন/ মিরর কার্প, গ্রাসকার্প এবং সরপুটি পুকুরে একত্রে চাষ করা যায়। রুই জাতীয় মাছের পোনা সহজে পাওয়া যায় এবং একত্রে চাষ করা লাভজনক। মাছ চাষের কয়েকটি কারিগরী ধাপ নিম্নে বর্ণনা করা হলো ঃ-

পুকুর নির্বাচন

পুকুরের সারা বছর পানি রাখা যায় এ ধরনের পুকুর নির্বাচন করা ভালো। তবে বৎসরের শুকনা সময়ে দুই এক মাস পানি থাকে না এই রকম পুকুর হলেও মাছ চাষ করা যাবে। নিজের পুকুর না থাকলে অন্য সরকারী খাস পুকুর কিংবা ব্যক্তিমালিকানাধীন পুকর ইজারা নেয়া যায়। দোআঁশ, বেলে দোঁআশ এবং এটেল মাটির পুকুর মাছ চাষের জন্য উত্তম।

সামান্য সংস্কার

পুকুর শুকিয়ে পুকুরের তলা সমান করে নিতে হবে। পাড় ভাঙ্গা থাকলে মেরামত করতে হবে। কোন ধরণের জলজ অনাকাংখিত আগাছা থাকলে তা মুক্ত করে নিতে হবে। পানিতে দিনে অন্ততঃ আট ঘন্টা সূর্যরশ্মি বিচ্ছুরিত হয় এ জন্য প্রয়োজনে পাড়ে গাছের ডাল ছোট করে দিতে হবে। এতে পুকুরের উপরিভাগে বাতাস প্রবাহ ও সহজ হবে এবং পানিতে দ্রবীভূত অক্সিজেন পরিমাণমত থাকবে যা মাছের শ্বাস-প্রশ্বাশের জন্য অত্যন্ত প্রয়োজন।

চুন প্রয়োগ

প্রতি শতকে এক কেজি হারে পাথুরে চুন চুর্ণ করে ছিটিয়ে নিতে হবে। পুকুরে শুকনো অবস্থায় চুন প্রয়োগ করতে হয়। তবে, সামান্য পানি কিংবা কাদা থাকলেও চুন প্রয়োগ করা যায়। চুন প্রয়োগের ফলে রোগ জীবাণু, আগাছা ও রাক্ষুসে মাছ বিণষ্ট হয় এবং পানির প্রয়োজনীয় ক্ষারত্ব বজায় থাকে। অল্প পানিতে রাক্ষুসে মাছ বিনষ্ট করার জন্য চুনের প্রযোগ মাত্রা দ্বিগুণ করতে হবে এবং সংস্কারের পুর্বে কোথাও গর্ত থাকলে তাতে সঠিকভাবে চুন প্রয়োগ করতে হবে। বিকল্পভাবে প্রতি এক ফুট গভীরতার জন্য শতাংশ প্রতি ৫০ গ্রাম রোটেনন অথবা তিন কেজি মহুয়ার খৈল কিংবা তিন শত গ্রাম চা বীজের গুঁড়া অথবা একশত পঞ্চাশ গ্রাম তেঁতুল-এর গুঁড়া খোসা প্রয়োগ করে রাক্ষুসে মাছ ধ্বংস করা যায়।

সার প্রয়োগ (পোনা ছাড়ার আগে)

চুন প্রয়োগের ৫ থেকে ৭ দিন পরে শতাংশ প্রতি জৈব সার হিসাবে ৫-৮ কেজি গোবর কিংবা ৩-৪ কেজি মুরগীর বিষ্ঠা এবং অজৈব সার হিসাবে ৭৫ গ্রাম ইউরিয়া ও ২০ গ্রাম টি,এস,পি পুকুরে ছিটিয়ে লাংগলের কিংবা আঁচড়ার সাহায্যে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে নিতে হবে।

পুকুরে পানি সরবরাহ

সার প্রয়োগের পর পরেই পুকুরে পানি সরবরাহ করতে হবে। সরবরাহ কৃত পানি যদি পার্শ্ববর্তী কোন জলাশয়ের হয় তাহলে পানি প্রবেশের পথে ঘন ফাঁসের জাল আটকিয়ে দিতে হবে যাতে অবাঞ্ছিত কোন মাছ প্রবেশ করতে না পারে।

পোনা মজুদ

পুকুরের তিন স্তরের প্রাকৃতিক খাদ্য মালার সকল উদ্ভিদ কণা এবং প্রাণী কণা যাতে ব্যবহৃত হয় এজন্য সকল স্তরের প্রাকৃতিক খাদ্যভূক মাছের পোনা মজুদ করতে হবে। রুই জাতীয় পোনার আকার ছাড়ার সময়ে ১০ সেন্টি মিটারের উর্ধ্বে (৫˝-৭˝ ইঞ্চি) হতে হবে। আধা নিবির পদ্ধতিতে সার ও সম্পুরক খাদ্য প্রয়োগ ব্যবস্থাপনায় জলায়তনের শতাংশ প্রতি সিলভার কার্প ছয়টি, কাতলা তিনটি, রুই ছয়টি, মৃগেল তিনটি, কমন/মিরর কার্প তিনটি, কালি বাউস দুইটি, গ্রাসকার্প চারটি সরপুঁটি তেরটি, মোট ৪০ টি হারে পোনা মজুদ করলে ভাল উৎপাদন হবে। গ্রাসকার্প এবং সরপুঁটি পোনার জন্য মোট ওজনের শতকরা ৪০ ভাগ ক্ষুদি পানা ও

নরম ঘাষ খাদ্য হিসাবে দিতে হবে। পোনার প্রাপ্যতা এবং পুকুরের উৎপাদন শীলতার উপর ভিত্তি করে পোনার সংখ্যা কম বেশী হতে পারে। তবে ছোট এবং অতিরিক্ত সংখ্যক পোনা মজুদ করা বিরত থেকে বড় এবং আংগুরী পোনা পরিমাণ মত মজুদ করলে আশানুরূপ উৎপাদন পাওয়া যায়।

সম্পুরক খাদ্য

পোনা মজুদের পরেই সম্পুরক খাদ্য হিসাবে সরিষার খৈল এবং কুড়া কিংবা গমের ভুষি প্রতিদিন সকালের দিকে একই সময়ে পুকুরে দিতে হবে। সরিষার খৈল আগের দিন তিজিয়ে রেখে পরের দিন কুড়া ভূষির সঙ্গে মিশিয়ে কোন মাটির পাত্রে এক মিটার পানির নিচে দিলে ভালো হয়। গ্রীষ্ম কালে সকল মাছের মোট ওজনের শতকরা দুইভাগ এবং শীতকালে শতকরা একভাগ সম্পুরক খাদ্য দিতে হবে।

উপরী সার প্রয়োগ (পোনা মজুদের পরে)

পোনা মজুদের পরে পানির সবুজ রং সত্ত্বেও হাত কুনই পর্যন্ত পুকুরের পানিতে ডুবিয়ে যদি হাতের তালু দেখা যায় কিংবা সেকিডিস্ক বিশ সেঃ মিঃ এর নিচে দেখা যায় তাহলে প্রতিদিন গোবর, ইউরিয়া এবং টি,এস,পি প্রয়োগ করতে হবে। জলায়তনের শতাংশ প্রতি গোবর দুইশত গ্রাম ইউরিয়া পাঁচ গ্রাম এবং টি,এস,পি, দুই গ্রাম পানিতে গুলে প্রতিদিন প্রয়োগ করতে হবে। মেঘলা দিনে সার দেয়া যাবে না। পুকুরে প্ল্যাংকটন বেশী হলে সার দেয়া বন্ধ রাখতে হবে। বর্ণিত নিয়মে সেকিডিস্ক দ্বারা পানির স্বচ্ছতা দেখলে কিংবা হাতের তালু দেখা গেলে পুনরায় দৈনিক সার প্রয়োগ করতে হবে।

নমুনা সংগ্রহকরণ

পুকুরে মাছের বৃদ্ধি ঘটছে কিনা অথবা রোগ বালাইয়ের প্রার্দুভাব পরীক্ষা করা এবং পুকুরে মজুদ মাছের পরিমাণ নির্ধারণ করার জন্য মাছে অন্ততঃ দুই বার জাল টেনে কমপক্ষে মজুদ মাছের শতকরা ১০ ভাগ ধরে উহার ওজন নিয়ে প্রজাতি ভিত্তিক গড় ওজন বের করতে হবে। এই গড় ওজন দ্বারা পুকুরের মজুদ মাছের সংখ্যার সাথে গুণ করে মোট মজুদ মাছের পরিমাণ নির্ণয় করে পরবর্তী সম্পুরক খাদ্যের প্রয়োগ মাত্রা নির্ধারণ করতে হবে। একই সময়ে মাছের দেহের রোগ বালাই আছে কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে। এ ছাড়াও জাল টানা হলে পুকুরের তলদেশে জমে থানা মিথেন, এমোনিয়া ইত্যাদি ক্ষতিকর গ্যাস বের হয়ে যাবে। অন্য দিকে জাল টানার ফলে মাছ ছুটাছুটি করবে। এতে মাছের রোগ না হওয়ার ফলে দৈহিক বৃদ্ধি ঘটে। জাল টানার ফলে পুকুরের তলদেশে কাদায় বাঁধা অবস্থায় থাকা মৌলিক পদার্থ সমূহ বের হয়ে আসার সুযোগ পায় এবং মাছের প্রাকৃতিক খাদ্য তৈরি হতে সহায়তা করে।

অন্যান্য পরিচার্যা

মাছ চাষের সফলতা অধিকাংশ নির্ভর করে পুকুরে পানির পরিবেশ ঠিক রাখা। জৈব পদার্থের কোন রকম পচন ক্রিয়া যেন না হয় সেদিকে নজর দিতে হবে। তাই যে সব পদার্থ পানিতে পচন ক্রিয়া ঘটাতে পারে তা যাতে পুকুরে না পড়ে তার ব্যবস্থা করতে হবে। পুকুরে গাছের পাতা পড়ে অনেক সময়ে পানির পরিবেশ নষ্ট করতে পারে। এর প্রতিকারের জন্য পুকুর পাড়ের গাছের ডাল কেটে ফেলতে হবে। নালা-নর্দমার বিষাক্ত পানি পুকুরে যাতে কোন ক্রমে প্রবেশ করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্য কোন উৎস্য থেকে আনা পানি, জাল বা অন্য কোন পাত্র পুকুরের পানিতে মিশানো উচিৎ নয়। এ সবের মাধ্যমে পুকুরে রোগ বালাই সংক্রামিত হতে পারে। তাই পুকুরে গবাদি পশু গোসল করানো থেকে বিরত থাকা উচিৎ। অনেক সময়ে বাজার থেকে মাছ এনে রন্ধন কাজের জন্য পুকুরে ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। এতে পুকুরে রোগ সংক্রামণ ঘটতে পারে।

আংশিক আহরণ

নিদিষ্ট একটি সময়ে মাছ যখন বয়ঃপ্রাপ্ত হয় তারপর মাছের দৈহিক বৃদ্ধি দ্রুততর হয় না। ফলে নির্দিষ্ট বয়সের পরে পুকুরে প্রতিপালন করার প্রয়োজন নেই। কাজেই পুকুরে বড় মাছ রাখা হলে অধিক লাভ পাওয়া যায় না। তাই বাজারজাতকরণ উপযোগী মাছ ধরে ফেলতে হয। ইহা ছাড়া পুকুরে সর্বোচ্চ ধারণ ক্ষমতার অধিক মাছ মজুদ রাখা হলে ছোট মাছের দৈহিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। তাই পুকুর থেকে নিয়মিত বড় মাছ ধরে ছোট মাছকে বড় হওয়ার সুযোগ দিতে হবে। বড় মাছ ধরে ফেললে পুকুরে বেশী জায়গা হওয়াতে এবং বেশী খাদ্য খেয়ে ছোট মাছ গুলি বড় গওয়ার সুযোগ পাবে। এসব সুবিধার কারণে আংশিক মৎস্য আহরণ করা হয। বিশেষজ্ঞদের মতে বিঘা প্রতি কার্প জাতীয় মাছের পুকুরে ধারণ ক্ষমতা ২২৪

কেজি। কাজেই বিঘা প্রতি ২২৪ কেজির বেশী মাছ আহরণ করে বিক্রয় করতে হবে। সাধারণতঃ অতিরিক্ত মাছ আহরণের সময়ে পুকুরের বড় মাছ আহরণ করে ছোট মাছ গুলিকে বড় হবার সুযোগ করে দেয়া উত্তম তবে, একমাসে যে কয়টি মাছ আহরণ করা হবে সমান সংখ্যক একই প্রজাতির মাছের পোনা পুকুরে মজুদ করতে হবে। এভাবে আহরণ ও মজুদের মাধ্যমে মৎস্য চা করলে অনেক বেশী উৎপাদন পাওয়া যায়।

সম্পুর্ণ আহরণ

নিয়মিত আংশিক আহরণের মাধ্যমে বড় মাছ ধরার ফলে ছোট মাছ বড় হওয়ার সুযোগ পাবে। মাছকে পুকুরে বেশীদিন না রেখে বৎসর শেষে পুরাপুরি আহরণ করে পরবর্তী বৎসরের জন্য পুকুর তৈরী করা ভাল। বৈশাখ-জৈষ্ঠ মাসে পুকুরে যখন পানি কম থাকে তখন সম্পূর্ণ মাছ ধরে ফেলতে হবে।

হিসাব সংরক্ষণ

উৎপাদন পরিকল্পনা মোতাবেক এক বৎসরের মাছ চাষের ব্যয় ও আয়ের হিসাব ক্রমাগতভাবে সংরক্ষণ অবশ্যই করতে হবে। বৈজ্ঞানিক ভাবে উন্নত কারিগরী সহায়তায় রুই জাতীয় মাছের চাষ করলে প্রতি শতাংশ জলায়তনে বিশ কেজি মাছ উৎপাদন করা সম্ভব। প্রকৃত মুনাফা ব্যয়ের তিন গুণ পর্যন্ত হতে পারে। প্রতি বৎসর স্থানীয় থানা মৎস্য কর্মকর্তার সঙ্গে আলোচনা করে মৎস্য চাষের উৎপাদন পরিকল্পনা করতে হয়।

মাছ চাষ সম্প্রসারণ

মাছ চাষ সম্প্রসারণের জন্য সরেজমিনে অর্থাৎ পুকুর পাড়ে মৎস্য চাষীদের এবং বেকার যুবকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা সর্বোত্তম। একজন আদর্শ মৎস্য চাষীর যে পুকুরে মৎস্য উৎপাদন ভাল হচ্ছে সেই পুকুর পাড়ে মৎস্য বিভাগীয় সম্প্রসারণ কর্মী, উক্ত পুকুরের মৎস্য চাষী এবং আশে পাশের অন্যান্য মৎস্য চাষীগণ উপস্থিত হবেন। অতঃপর পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আলোকে সকলে মিলে পুকুরের মৎস্য চাষ সম্পন্ধে আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন। মৎস্য বিভাগীয় সম্প্রসারণ কর্মী বর্ণিত বিজ্ঞান ভিত্তিক চাষে মৎস্য উৎপাদন বেশী হয় তা উপস্থিত সকলকে বুঝিয়ে বলবেন। পুকুর হতে একটু দূরে গাছের ছায়ায় উপস্থিত সকলের বসার ব্যবস্থা করবেন। সম্প্রসারণ কর্মী হোয়াইট বোর্ড কিংবা ব্লাক বোর্ড এবং ফ্লিপ চার্ট ব্যবহার করে প্রশিক্ষণার্থীদের বুঝাবেন এবং অত্যান্ত হৃদ্যতাপূর্ণ ভাবে জিজ্ঞাসা বাদ করবেন। সফল মৎস্য চাষী কি ভাবে মৎস্য চাষে সফলতা লাভ করলেন তা সবাইকে বলবেন এবং জাল টেনে আংশিক আহরণ দেখাবেন। এ ভাবে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত অন্যান্য মৎস্য চাষীগণ নিজ নিজ পুকুরে মৎস্য চাষ করবেন এবং তাদের পাশ্ববর্তী পুকুর মালিকদের মৎস্য চাষে শিক্ষা দেয়ে উদ্বুদ্ধ করবেন। দেশপ্রেম জাগ্রতকরণ এবং উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে এভাবে সারাদেশের জলাশয়ে সফল ভাবে মাছ চাষ করা সম্ভব।

মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ সফল হোক

দেশের উন্নয়ন ও সমৃদ্ধির
আমরাও অংশীদার

মডার্ণ হ্যাচারী লিমিটেড

উন্নতমানের চিংড়ি পোনা ও উৎপাদনকারী উপমহাদেশের বৃহত্তম ও সর্বাধুনিক প্রতিষ্ঠান

প্রধান কার্যালয় ঃ ইলিয়াস মার্কেট, ১৮৭ খাতুনগঞ্জ, চট্টগ্রাম, ফোন ঃ ৬১০৯১৪, ৬২০৯১০, ৬২৪৩৭২
ফ্যাক্স ঃ ৮৮-০৩১-৬১০৮৪১, টেলেক্স ঃ ৬৩৩০৫১ ইউনাইটেড বিজে।

শাখা কার্যালয় ঃ তুফান বাস ষ্টেশন, কালিগঞ্জ রোড, সাতক্ষীরা। ফোন ঃ ০৪৭১-৩৪৫৬, ২৬০৪।

প্রজেক্ট ঃ হ্যাচারী জোন, কলাতলী, কক্সবাজার। ফোন ঃ ০৩৪১-৩৫১৯।

মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে ডাকউইডের ভূমিকা

মুহঃ আজিজুল করিম
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়

ডাকউইড বা কুটিপানা এক ধরনের ক্ষুদ্রাকৃতির ভাসমান জলজ উদ্ভিদ। পানির উপরিভাগে এই উদ্ভিদ কচুরীপানার চেয়েও দ্রুত বিস্তার লাভ করে। কুটিপানার ব্যবহার সম্বন্ধে বিগত দু'দশক থেকে কিছুটা সচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চলছে। কুটিপানার গুণ ও ব্যবহারের সম্ভাবনা সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই স্পষ্ট ধারণা নেই। কুটিপানাকে অনেকেই "miracle crop" হিসেবে আখ্যায়িত করতে দ্বিধাবোধ করেন না। এর অত্যুৎপাদনের উজ্জ্বল সম্ভাবনা দেখে গবেষকগণ আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন। খাদ্য হিসেবে কুটিপানা তৃণভোজী মাছ এবং গবাদিপশু, হাঁস-মুরগির কাছে প্রিয়।

বাংলাদেশে প্রায় ছয় জাতের কুটিপানা দেখা যায়। এর মধ্যে তিন প্রকার কুটিপানা উল্লেখযোগ্য ও বহুল আলোচিত।

(১) লেমনা (Lemna)

(২) স্পাইরোডেলা (Spirodela)

(৩) উল্‌ফিয়া (Wolffia)

বাংলাদেশের খাদ্য সংকট একটি জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। শুধু মানুষের খাদ্য সংকট নয়, গবাদিপশু ও মাছের খাদ্য সংকটও প্রকট। মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পশুসম্পদের সংরক্ষণ, বৃদ্ধি ও উন্নয়নে যে কয়টি প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তার মধ্যে খাদ্য ও বীজ সংকট, রোগ-বালাই-এর প্রাদুর্ভাব, বাজারজাতকরণের অসুবিধা এবং ব্যবস্থাপনা দুর্বলতা প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। বলাবাহুল্য, মাছ ও পশুখাদ্য সমস্যা সমাধানে সচেতনতা খুব প্রবল নয়। অথচ এই সমস্যা জোড়ালোভাবে মোকাবেলা না করে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব। ইদানিং মাছ ও পশু খাদ্য উৎপাদনে কিছু দেশী-বিদেশী উদ্যোক্তা নিয়োজিত থাকলেও, তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। স্থানীয়ভাবে লাগসই প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে মাছ ও পশু খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি করে এই সমস্যার সমাধান করা ছাড়া বিকল্প নেই।

পশু খাদ্যের চাহিদা

দেশে পশু খাদ্যের চাহিদা আনুমানিক ১২৯ মিলিয়ন মেট্রিক টন এবং দানাদার খাদ্যের চাহিদা প্রায় ১২ মিলিয়ন মেট্রিক টন। এই চাহিদার মাত্র ৪০ ভাগ দেশে উৎপন্ন হয়। বাকি ৬০ ভাগ অপূরণীয় থেকে যায়। উল্লেখ্য, ক্রমবর্ধমান পশুখাদ্য ও মাছের খাদ্য নিরূপনে একটি জরিপ প্রয়োজন।

কুটিপানার খাদ্যমান

কুটিপানা পশু ও মাছের আদর্শ খাদ্য। গুণাগণের দিক দিয়ে এতে শুষ্ক ওজনে আমিষের পরিমাণ সর্বোচ্চ ৪৫ শতাংশ। তবে প্রাকৃতিক আবাসে জন্মানো কুটিপানায় আমিষের পরিমাণ কখনও কখনও সর্বনিম্ন ৬-৮ শতাংশ হতে পারে। শুধু পরিমাণগত দিক দিয়েই নয় ডাকউইডের আমিষের গুণগত মানও উন্নত ধরনের। কুটিপানায় আবশ্যকীয় অ্যামাইনো এসিডের মধ্যে টিপটোফেন ও লাইসিন ব্যতিরেকে মানুষ ও পশুপাখির খাদ্যে ব্যবহৃত অ্যামিনো এসিড আছে। কুটিপানায় আমিষ, গুণগত মানের দিক থেকে প্রায় ডিমের সমকক্ষ। এ ছাড়া কুটিপানায় কিছু পরিমাণ ভিটামিন 'এ' ও 'বি' রয়েছে। কুটিপানায় আঁশ কম থাকে, যে কারণে মাছের খাদ্য হিসেবে সহজপাচ্য। খাদ্য হিসেবে কুটিপানা ও সয়াবিন সমতুল্য। কোন কোন বিজ্ঞানী কুটিপানায় সয়াবিনের চেয়ে বেশি আমিষ প্রাপ্তির কথা বলেছেন। তারা আরও বলেছেন, 'খৈল'-এর চেয়ে প্রায় দেড়গুণ বেশি আমিষ কুটিপানায় রয়েছে। সংশ্লিষ্ট গবেষকদের প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে, খাদ্যমান, উৎপাদন ব্যয়, সহজলভ্যতা ও ব্যবহার পদ্ধতি তুলনা করলে কুটিপানার শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ হবে।

কুটিপানার ব্যবহার

কুটিপানা খাদ্য হিসেবে মাছ ও পশুর জন্য উপযুক্ত। এ ছাড়া কুটিপানা বর্জ্য পানি/ দূষিত পানি (Waste-water) শোধনের জন্য উপযুক্ত কুটিপানা বিশেষতঃ গার্হস্থ

(domestic) বর্জ্য পানি শোধনে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। গবেষকদের মতে, কুটিপানা পানির নানা প্রকার ময়লা, ধাতু ও বিষাক্ততা শুষে নিতে সক্ষম। কুটিপানা আরও অন্যান্য কাজে ব্যবহৃত হতে পারে, যেমন কুটিপানা বর্জ্য পানির উপরিভাগ আবৃত করে থাকলেও দুর্গন্ধ নিয়ন্ত্রণ হতে পারে, মশার বিস্তার রোধ করতে পারে, এমনকি প্রাকৃতিক নিয়মে খরতাপে পানির বাষ্পীভবনের হারকে ৩০ শতাংশ হ্রাস করতে পারে। কুটিপানার বহুমুখী ব্যবহার বিজ্ঞানীদের আরও গবেষণা ও অনুসন্ধানে অনুপ্রাণিত করেছে। বলাবাহুল্য, গবেষণালব্ধ জ্ঞান দিয়ে কুটিপানা ব্যবহারে অনুপ্রেরণা জনসাধারণের মধ্যে জাগ্রত করা ডাকউইড গবেষণা প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য। কুটিপানা দ্রুত বৃদ্ধি পায়, প্রায় সব ঋতুতে এবং আবহাওয়ায়, এমনকি অযত্নে এর বৃদ্ধি লক্ষ্য করা যায়। তবে, আলোর তীব্রতা, বায়ুর গতি, প্রখর তাপ, পানির অত্যাধিক লবণাক্ততা কুটিপানার বৃদ্ধি ব্যাহত করে। সুবিধা হলো যে, প্রায় সকল প্রকার জৈব বর্জ্য (organic waste) যেমন, গবাদিপশুর মল-মূত্র, রান্না ঘরের ব্যবহৃত পানি ও বর্জ্য দ্রব্যাদি, বায়োগ্যাস বর্জ্য, গোসলখানার পানি, কসাইখানার বর্জ্য, খাদ্যশিল্প ও দুগ্ধ খামারের বর্জ্য এবং শহরের নানাবিধ বর্জ্যতে (urban refuse) পর্যাপ্ত পুষ্টি উপাদান যেমন, নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাসিয়াম ও ক্যালসিয়াম থাকায় কুটিপানা দ্রুত উৎপাদিত হতে পারে। অজৈব সার দিয়েও কুটিপানার উৎপাদন করা যেতে পারে। তবে জৈব সার দিয়ে কুটিপানা উৎপন্ন করতে কেজি প্রতি ৪০-৪৫ পয়সা ব্যয় হয় এবং অজৈব সার প্রয়োগে খরচ হয় প্রতি কেজি ৭০-৮০ পয়সা। এ কারণে উৎপাদন ব্যয়ের তারতম্যের ওপর কুটিপানার ব্যাপক প্রচলন নির্ভর করছে।

উপসংহার

বাংলাদেশে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের আয়তন প্রায় ৪৩.৫০ লক্ষ হেক্টর। ১৯৯৬-৯৭ সালে দেশে ১৩.৭৩ লক্ষ মেট্রিক টন মাছ উৎপাদিত হয়েছে। এর মধ্যে প্রায় ১০.৭৯ লক্ষ টন অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাশয় থেকে এবং ২.৯৪ লক্ষ মেট্রিক টন বদ্ধ জলাশয় থেকে উৎপন্ন হয়েছে। চাহিদার তুলনায় উৎপাদিত মাছের পরিমাণ বেশ কম বলা চলে। আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় মাছ সুষম আমিষের উৎস। সুষম আমিষের অভাবে মানবদেহে নানাবিধ সমস্যা সৃষ্টি হয়, বিশেষতঃ শিশুদের স্বাভাবিক বৃদ্ধি ও মস্তিষ্ক বিকাশে বাধাগ্রস্ত হয় এবং পুষ্টির অভাবজনিত মৃত্যু হয়ে থাকে। এ কথা বিবেচনা করলে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে খাদ্য হিসেবে প্রাণীজ আমিষ সমৃদ্ধ মাছের ওপর নির্ভরশীলতা ক্রমাগত বেড়েই যাবে।

দেশে ২৩৪ লক্ষ গরু, ৮.২০ লক্ষ মহিষ, ৩৩৫ লক্ষ ছাগল, ১১.১০ লক্ষ ভেড়া, ১৩৮২ লক্ষ মোরগ-মুরগি এবং ১৩৬ লক্ষ হাঁস রয়েছে। পশুসম্পদের প্রবৃদ্ধির জন্য পশু খাদ্যের ব্যাপক উৎপাদন বৃদ্ধি আশু প্রয়োজন। অনেকেই মনে করেন পশু খাদ্য সংকটের সহজ সমাধান না থাকলেও, কুটিপানার ব্যাপক চাষ ও ব্যবহার আংশিক সমাধান দিতে পারে।

মনে রাখা প্রয়োজন, কুটিপানা মাছ কিংবা পশুর একক খাদ্যহিসেবে প্রভাব সৃষ্টি করতে না পারলেও পরিপূরক খাদ্য হিসেবে ব্যাপক অবাদন রাখতে পেরেছে। মাছের খাদ্য ও পশু খাদ্যের যে সংকট বিরাজমান এবং এই সংকটের ফলে জাতীয় অর্থনীতিতে যে নেতিবাচক প্রভাব ফেলছে, তা পূরণে কুটিপানার ব্যবহার আংশিকভাবে হলেও সফল, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সমাজভিত্তিক মৎস্য অভয়াশ্রম ঃ মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির কৌশল

মোঃ মোকাম্মেল হোসেন, মৎস্য অধিদপ্তর
এস,এম, নাজমুল আলম, কারিতাস

পৃথিবীতে সব প্রাণীকূলেরই একটি আশ্রয়স্থল আছে। মাছ সে প্রাণীকূলেরই শীতল রক্তবিশিষ্ট একটি প্রাণী যার অবাধ বিচরণ এবং পরবর্তী বংশ বৃদ্ধির জন্য নিরাপদ আশ্রয়স্থলের প্রয়োজন। শাব্দিক অর্থে এই নিরাপদ আশ্রয়স্থলকে অভয়াশ্রম বলা হয়। আমাদের দেশে মনুষ্য ও প্রাকৃতিক সৃষ্ট নানাবিধ কারণে মুক্ত জলাশয়ে বিগত বছরগুলোতে মৎস্য উৎপাদন অনেকাংশে হ্রাস পেয়েছে। বিশেষ করে মৎস্য প্রজনন ক্ষেত্রগুলো ধ্বংস হওয়ার ফলে অনেক প্রজাতির প্রাকৃতিক মাছের বিলুপ্তি ঘটেছে। এ পরিস্থিতিতে মৎস্য সম্পদ রক্ষা করে উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে কয়েকটি পদক্ষেপের মধ্যে মৎস্য অভয়াশ্রম একটি বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। সরকারও সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে প্রকল্পের মাধ্যমে অভয়াশ্রম স্থাপন করে। সরকারী পর্যায়ে পাহারার ব্যবস্থা থাকা সত্ত্বেও সুফলভোগীদের সচেতনতা ও আগ্রহের অভাবে উক্ত অভয়াশ্রম মাছের নিরাপদ আশ্রয়স্থল হিসেবে রক্ষিত ছিল না। এ অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে সরকার পরবর্তী প্রকল্পসমূহ বিশেষ করে সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পে সুফলভোগীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে নিম্নলিখিত উপায়ে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধির কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করে। যেমন ঃ (ক) প্রকল্পভুক্ত মুক্ত জলাশয়ে পোনা মজুদ, (খ) মাছের প্রজনন ক্ষেত্র বা আশ্রয়স্থল সংরক্ষণ

জেলা শহর দিনাজপুর থেকে প্রায় ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পূর্ব কোণে নবাবগঞ্জ ও বিরামপুর থানায় অবস্থিত একটি উন্মুক্ত মৌসুমী বিল - আশুরার বিল। বিলটির দৈর্ঘ প্রায় ১০-১২ কিলোমিটার এবং আয়তন প্রকল্প প্রস্তাবনা অনুযায়ী ৫,৩০০ একর। এলাকার কথিত প্রবাদে জলাশয়টি পানির নির্গমন ও আগমনের জন্য আশিটি উন্মুক্ত দ্বার আছে বিধায় বিলটির নামকরণ হয়েছে আশুরার বিল। বিলটির বিভিন্ন জায়গায় ৮টি গভীর খাদ রয়েছে যা স্থানীয় ভাষায় দহ বলে এবং গ্রীষ্মকালে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এর মধ্যে বুড়ির দহ অন্যতম। বিলের তীর ঘেঁষে এক পাশে রয়েছে বিশাল গভীর অরণ্য। নৈসর্গিক শোভামন্ডিত এ বিলটিকে ঘিরে রয়েছে রূপকথার অনেক কল্পকাহিনী।

ষাট এর দশকে বিভিন্ন জেলা থেকে নদী ভাঙ্গনের শিকার, নিঃসম্বল পরিবার সে বিলের পার্শ্ববর্তী এলাকায় বসতি স্থাপন শুরু করে এবং পেশা পরিবর্তন করে মাছ আহরণই হয়ে উঠে তাদের জীবিকা ও আয়ের প্রধান উৎস। আশে পাশের এলাকাগুলোতে চাহিদা মোতাবেক মাছের প্রধান উৎস হিসেবে এ বিলের নাম-ডাক ছিল। পার্শ্ববর্তী নলশিশা নদীর সংগে খননের মাধ্যমে সংযোগ স্থাপন করায় বর্ষা মৌসুমে নদী বাহিত পলিতে ধীরে ধীরে ভরাট হয়ে বিলের তলদেশ উঁচু হতে থাকে। আবার শুষ্ক মৌসুমে জেগে উঠে জমি। পত্তনির মাধ্যমে জেগে উঠা জমিতে চাষাবাদের ফলে বিলের আয়তন ক্রমশঃই সংকুচিত হতে থাকে। কমে যেতে থাকে জলায়তনসহ মৎস্য সম্পদ। সাংস্কৃতিক বৈষম্য এবং গ্রামীণ নেতৃত্বে প্রভাব রাখার জন্য স্থানীয় মৎস্যজীবীগণ নিজ নিজ গ্রামের নিকটবর্তী দহতে কাঠা স্থাপন করে কর্তৃত্ব বজায় রাখত। পাশাপাশি এক গ্রামের জেলে অন্য গ্রামের নিকটবর্তী দহতে মাছ ধরতে যেতে অনেকাংশে উৎসাহী হতো না। বর্ষা ও মৌসুম শেষে বিভিন্ন জাল ও ফাঁদের মাধ্যমে অবশিষ্ট মাছগুলো ধরার ফলে ফলে প্রজনন ক্ষেত্রগুলো নষ্ট হতে থাকে। ফলে মাছের পরিমাণ কমতে থাকে। দিন দিন বিলুপ্ত হতে থাকে অনেক প্রজাতি। ৯০-এর দশকে মহামারী আকারে দেখা দেয় মাছের ক্ষতরোগ। বিলুপ্ত হতে শুরু করে অনেক প্রজাতির মাছ। মৎস্য সমৃদ্ধ বিলের ঐতিহ্য পুনরুদ্ধারের এবং মৎস্যজীবীদের কল্যাণার্থে সরকার একটি প্রকল্পের মাধ্যমে আশুরার বিলে দু'দুবার টনে টনে কার্প জাতীয় মাছের পোনা অবমুক্ত করেন। কিন্তু পোনা অবমুক্ত পরবর্তী বন্যা ও মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠীর সক্রিয় অংশগ্রহণ না থাকায় সে উদ্যোগ থেকে প্রকৃত সুফল পাওয়া যায়নি।

১৯৯৬'র জানুয়ারী থেকে মৎস্য অধিদপ্তর, ইকলার্ম ও বেসরকারী সংস্থাসমূহের সমন্বয়ে বাস্তবায়িত সমাজভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা ও উন্নয়ন প্রকল্পের কার্যক্রম আরম্ভ হয়। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে পরিবেশের সাথে সংগতি রেখে মৎস্য আহরণ বা চাষের মাধ্যমে একটি স্থায়িত্বশীল মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন এবং তা থেকে আয়ের প্রকৃত বন্টনের ওপর একটি সঠিক পদ্ধতি উদ্ভাবন করা।

কারিতাস উক্ত প্রকল্পে আশুরার বিলসহ আরো ৪টি জলাশয়ে কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিজেদের সম্পৃক্ত করে। কারিতাস এবং প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রমের উল্লেখযোগ্য অংশগুলো হলো ঃ

* মৎস্য ব্যবস্থাপনা থেকে যাতে দরিদ্র মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠী অধিকতর সুযোগ পায় তা নিশ্চিত করার জন্য তাদের সহায়তা প্রদান করা।
* মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও মৎস্য আহরণ সহনশীল পর্যায়ে সীমিত রাখার মাধ্যমে জলাশয়ে মাছ ধরার অধিকার পেতে পারে সে লক্ষ্যে মৎস্যজীবী জনগোষ্ঠিদের উদ্বুদ্ধ ও সংগঠিত করা।
* পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নের জন্য দলীয় সদস্যদের প্রশিক্ষণ প্রদান এবং পারিবারিক আয় বৃদ্ধির জন্য আয়-বর্ধক বহুমুখী কর্মকান্ডে মৎস্যজীবীদের নিয়োজিত করা।
* টেকসই সাংগঠনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে মুক্ত জলাশয়ের সর্বোচ্চ ব্যবহারে সমাজের জনগোষ্ঠির অংশগ্রহণে সহায়তা করা।

* জনগোষ্ঠী/সংগঠিত দলগুলোকে "এপেক্স" পর্যায়ে বৃহত্তর জন সংগঠনের সাথে জড়িত করার মাধ্যমে শক্তিশালী করা, যাতে করে তারা মৎস্য সম্পদ, সামাজিক অধিকার এবং ঋণ সুবিধাদি অধিক হারে পেতে পারে।

এ প্রকল্পের একটি বিশেষত্ব হলো তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের মতামতকে অবশ্যই গুরুত্ব সহকারে অনুধাবন করা যাতে করে মৎস্যজীবীরা তাদের জীবন ও পরিবেশের জ্ঞান এবং অভিজ্ঞতা বিশ্লেষণ করে প্রকল্প কর্তৃক দেয় সুবিধাদির সমন্বয়ে নিকটবর্তী জলাশয়ের মৎস্য সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন কার্যক্রমে নিজেদের সম্পৃক্ত করে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে পারে। ইংরেজীতে এ ধারণাকে Bottom up approach বলে।

শুরুতে কারিতাস অন্যান্য সহযোগী প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় প্রকল্প ধারণা প্রদানসহ উদ্বুদ্ধকরণ কার্যক্রমে প্রকৃত সুফলভোগীদের চিহ্নিত করার কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। এতে করে প্রকৃত সুফলভোগীদের নিয়ে গ্রামভিত্তিক মৎস্যজীবী ও মহিলা দল গঠনের পথ সহজতর হয়।

প্রকল্পের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনে কারিতাস তার উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ শিক্ষার মাধ্যমে প্রকল্প কার্যক্রম এগিয়ে নিয়ে যায়। কারিতাস মনে করে প্রতিটি মানুষই এক একটি শক্তির আঁধার। এ শক্তি শুধু অজ্ঞতার কারণে জীবনীশক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারে না। সম্প্রসারণ শিক্ষা গতানুগতিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কার্যক্রমের মত নয়। এ শিক্ষায় সমাজের সকল পর্যায়ের শিক্ষিত, অশিক্ষিত পরীক্ষালব্ধ জ্ঞান বা ধারণার প্রসার লাভ করে থাকে যা পরোক্ষভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি বা সামাজিক প্রচলিত রীতিনীতি পরিবর্তনের সাথে ওতপ্রতোভাবে জড়িত। সম্প্রসারণ শিক্ষার মাধ্যমেই মানুষ তার দৈনন্দিন বিভিন্ন কর্মপ্রণালীতে বৈচিত্র্য আনে এবং অর্জন করে নতুন অভিজ্ঞতা। ঠিক এ ধারণাটাকে ভিত্তি করে কারিতাস, মৎস্য অধিদপ্তর ও ইকলার্ম সংগঠিত দলগুলোর উন্নয়ন তথা নিকটবর্তী জলাশয়ে তাদের নিবিড় যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রায়োগিক কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। এ পরিকল্পনার আওতায় রয়েছে ঃ

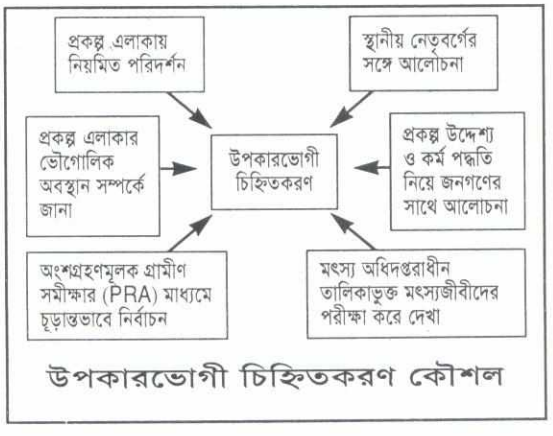

উপকারভোগী চিহ্নিতকরণ কৌশল

সাংগঠনিক দক্ষতা বৃদ্ধি কৌশল

* দলভুক্ত প্রতিটি সদস্য সঞ্চয়ী মনোভাবাপন্ন হবে।
* নিরক্ষর সদস্যকে বয়স্ক শিক্ষা কার্যক্রমের আওতায় অক্ষর জ্ঞানসম্পন্ন করে তোলা।
* সামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে সচেতনতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি করা।
* ঋণ সুবিধাদি প্রদানের মাধ্যমে আত্মকর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ডে সদস্যদের সম্পৃক্ত করা।
* নিয়মিত সভা, কর্মশালা, শিক্ষা সফরের মাধ্যমে নিজেদের সংগৃহীত জ্ঞান ও তথ্যের বিনিময় করা।

সম্প্রসারণ শিক্ষা বিস্তারে যোগাযোগের মাধ্যম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কেননা সম্প্রসারণ কর্মীদেরকে সাধারণ মানুষের মধ্যে জ্ঞান, ধারণা কিংবা কৌশল বিস্তারের ক্ষেত্রে জনগণের চাহিদা বা কোন পদ্ধতি জনসাধারণ সুন্দরভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে তা বিচার বিশ্লেষণ করে নির্ধারণ করতে হয়। কারিতাস উক্ত বিলে সার্বক্ষণিকভাবে ২ জন সম্প্রসারণ কর্মীকে নিয়োগ করে। পাশাপাশি মৎস্য অধিদপ্তর ও ইকলার্মের যৌথভাবে জরিপ কার্যক্রম পরিচালনার জন্য ৩ জনকে নিয়োগদান করে। সম্প্রসারণ কার্যক্রম ও কর্মীদের দক্ষতাপূর্ণ যোগাযোগ এবং প্রকল্প কর্তৃক দেয় সুবিধাদির ফলে মৎস্যজীবীরা আশুরার বিলের বর্তমান ও ভবিষ্যত গুরুত্ব, সমস্যা ও তাদের করণীয় সম্পর্কে ফলপ্রসূ উদ্যোগ গ্রহণ করে।

এরই মধ্যে ১৯টি দলে ৪২৩ জন মৎস্যজীবী এবং ৪টি দলে ৭৫ জন মহিলাকে সংগঠিত করা হয়। সব কয়টি দলের সাপ্তাহিক সঞ্চয়ের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১,১৪,৯৬৮ টাকা যা নিজ নিজ দলের সাংগঠনিক মনোবল বৃদ্ধিতে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে। প্রায় ২৫০ জন পুরুষ ও মহিলা এবং মহিলা সদস্যকে বয়স্ক শিক্ষার আওতায় অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন করা হয়। ২৮টি বিভিন্ন প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ৭০১ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয় যাতে করে আশুরার বিলকে কেন্দ্র করে দক্ষ ব্যবস্থাপনা গড়ে ওঠে। মৎস্য চাষ, জাল, নৌকা এবং বিকল্প আয়ের জন্য প্রায় ৫,২৩,০০০ টাকার ঘূর্ণায়মান তহবিল ঋণ হিসেবে ব্যবহার করে মৎস্যজীবীরা বিভিন্ন আত্মকর্মসংস্থানমূলক

কর্মকান্ডে নিজেদের নিয়োজিত করে সফলতার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে। সাংগঠনিক গতিশীলতা ও কর্মকান্ডে সদস্যদের মাঝে দৃঢ় বন্ধন সূচিত হয়। নিজেদের ছোটখাট বিবাদ নিজেরাই মিটাতে সক্ষম হয়। নিজেদের মাঝে নেতৃত্ব চর্চার অভ্যাস গড়ে তোলে। বিল ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে যৌথ সিদ্ধান্ত নিতে এবং কার্যকর করার পদক্ষেপও গ্রহণ করে।

আশুরার বিলে ইতিপূর্বে পোনা মজুদের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির ব্যর্থ চেষ্টার মূলে মৎস্যজীবীগণ এ বিলের কারিগরি দিকের বিষয়টি বিবেচনা না করার তীব্র সমালোচনা করে। উপরন্তু তাদের অংশগ্রহণ না থাকা সত্ত্বেও মজুদ পরবর্তী ২০% পুঁজি প্রত্যাহারের বিষয়টি মৎস্যজীবীদের নিকট অযৌক্তিক বলে বিবেচিত হয়েছে। এ সংকট থেকে উত্তরণের উপায় হিসেবে প্রাকৃতিক মাছের সংরক্ষণের মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা নিতে থাকে। কিন্তু কিভাবে এটা সম্ভব। ইতিপূর্বে ১৯টি সংগঠিত দলের প্রত্যেকটি থেকে ১ জন করে প্রতিনিধি নিয়ে ১টি বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠন করা হয় এবং সাংগঠনিক কর্মকান্ড পরিচালনার জন্য সকলের সম্মতিক্রমে মনোনিত করা হয় সভাপতি, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষকে।

অভয়াশ্রমের কথা মৎস্যজীবীরা শুনেছে ঠিকই কিন্তু এর বাস্তব অভিজ্ঞতা তাদের কারোরই নেই। বিলের কোন অংশে এ ধরনের অভয়াশ্রম তৈরী করা যায় তা নিয়ে প্রায়ই বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বৈঠকে আলোচনা করে। জানতে চায় এর কারিগরি এবং ব্যবস্থাপনার দিকসমূহ সম্পর্কে। প্রকল্প থেকেও এ সম্পর্কে নানান তথ্যাদি সরবরাহ করে তাদের সুপ্ত ইচ্ছাকে বাস্তব রূপদানে বেগবান করে তোলে। অবশেষে সকলের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মাছের প্রজনন ক্ষেত্র ও আধার হিসেবে চিহ্নিত বুড়ির দহকে মৎস্য অভয়াশ্রম হিসেবে সংরক্ষণ করার দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করে।

বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে একটি মৎস্যজীবী প্রতিনিধি দলকে অভয়াশ্রম তথা মৎস্য সংরক্ষণের বাস্তব ও চাক্ষুষ অভিজ্ঞতা অর্জনের লক্ষ্যে বাংলাদেশের একটি অঞ্চলে শিক্ষা সফরের ব্যবস্থা করা হয়। প্রতিনিধি দল এ বিষয়ে মত বিনিময়ের মাধ্যমে ব্যাপক জ্ঞান লাভ করে এবং অধিক হারে অনুপ্রাণিত হতে থাকে। প্রতিনিধি দল অভিজ্ঞতা অর্জন শেষে ফিরে গিয়ে তাদের দলভুক্ত সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করে।

বুড়ির দহ ঃ না। এটি কোন বুড়ির সম্পত্তি বা আয়ত্বে নয়। বহু আগে এ দহকে ঘিরে মৎস্যজীবী ও সাধারণ মানুষের ছিল জুজুবুড়ির ভয়। প্রাকৃতিক উপায়ে সৃষ্ট বিলে ৮টি দহের মধ্যে এ দহটি খুব গভীর, বড় এবং জঙ্গলাকীর্ণ ছিল। মাছের একমাত্র আবাসস্থল হিসেবে একে চিহ্নিত করা হতো। এখানে মাছ ধরতে গিয়ে অনেকে বিভিন্নভাবে প্রাণ হারিয়েছেন তাই মানুষের মনে ছিল কল্পিত দৈত্যবুড়ির ভয়। সম্ভবত সে নামানুসারে এর নামকরণ হয়েছে বুড়ির দহ।

শুরু হয় মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা করার সামাজিক আন্দোলন। বুড়ির দহে পূর্বে স্থাপিত 'কাঠার' সকল উপকরণ কাঠা মালিকগণ স্বেচ্ছায় দান করে এ উদ্যোগের সূচনা করে। স্থানীয় থানা নির্বাহী কর্মকর্তা, কারিতাস, মৎস্য অধিদপ্তর কর্মকর্তা ও মৎস্যজীবীদের সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত গত ১লা মে,

বুড়ির দহে সমাজভিত্তিক মৎস্য অভয়াশ্রম

১৯৯৭তে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বুড়ির দহে অভয়াশ্রম স্থাপনের উদ্বোধন ঘোষণা করা হয়। বুড়ির দহ প্রায় ৮ হেক্টর বিশিষ্ট বিশাল এক গভীর জলরাশি। মাছের নিরাপদ বংশ বিস্তারের অভয়াস্থল হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য মৎস্যজীবীগণ চারিদিকে লাল পতাকা উড়িয়ে এবং নিজেদের লেখা সাইন বোর্ড ঝুলিয়ে এলাকাবাসীকে স্মরণ ও সতর্ক করিয়ে দেয়। বর্ষার শুরুতে প্রথম দুমাস বিলে মাছ ধরা বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত কার্যকর করে এবং ক্রমান্বয়ে ছোট ফাঁসের জাল ব্যবহার থেকে বিরত থাকার কঠিন সিদ্ধান্ত নেয়। এরই মধ্যে মাছের প্রজনন ক্রিয়া সম্পাদনের ফলে বিলে পরিবর্তন দেখা দেয় মৎস্য সম্পদ প্রাচুর্যতার। ফলশ্রুতিতে সারা বর্ষায় বিলে মাছের পরিমাণ অবিশ্বাস্যভাবে যায় বেড়ে। মৎস্যজীবীরা ফিরে পায় তাদের হারানো ঐতিহ্য। এই হারানো মৎস্য প্রাচুর্যতা ফিরে পাওয়ার অফুরন্ত আনন্দে মৎস্যজীবীগণ সচেষ্ট হন; কি করে বুড়ির দহকে আরো উন্নত প্রযুক্তিতে সংরক্ষণ করা যায়- কি করে বিলে প্রাকৃতিক মাছের উৎপাদন আরো বৃদ্ধি করা যায় এবং সর্বোপরি কি করে প্রকল্প কার্যক্রমে নিজেদের আরো সম্পৃক্ত করা যায়! শুরুতে হয় অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠা পরবর্তী ফলাফল নির্ণয়ের সমীক্ষা কার্যক্রম। মৎস্য অধিদপ্তর ও ইকলার্মের ব্যবস্থাপনায় আশুরার বিলে মৎস্য অভয়াশ্রম প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সমীক্ষার ফলাফল নিম্নে প্রতিফলিত হলো।

আশুরার বিলে ১৯৯৭ সালে জালভিত্তিক প্রাপ্ত গড় মাছের পরিমাণ দিন/কেজি

জালের নাম	আহরিত মাছের পরিমাণ (কেজি)		
	ডিসেঃ-ফেব্রুঃ	মার্চ-মে	আগষ্ট-নভেম্বর
ফাঁস জাল	১.৮	১.২	৩.০
বেড় জাল	৩.২	১.৮	১৫.২
ডেসাল জাল (বড়)	০.০	০.০	১২.৪
ঠেলা জাল	০.৬	.০৬	০.৮
ফাঁদ	১.৭	১.৬	৪.১
সারি বর্শি	০.৫	০.০	০.৭

গত বছর প্রাকৃতিক মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধি ও প্রাপ্তির আনন্দে মৎস্যজীবীগণ এ বছর বিলের অন্যান্য দহে স্থাপিত কাঠার সকল উপকরণ (বাঁশ, গাছের ডাল) স্ব-উদ্যোগে তুলে এনে বুড়ির দহে স্থাপন করে এর পরিধির আরো বিস্তার ঘটায়। এখন পুরো বিলে একটি মাত্র বিশাল কাঠা ধারণ করে আছে এ বুড়ির দহটি এবং সে সাথে এক গ্রামের মৎস্যজীবী অন্য গ্রামের নিকটবর্তী দহে মাছ ধরার সহজ প্রবেশাধিকার উন্মুক্ত হলো।

মৎস্যজীবীগণ বিভিন্ন সময়ে একক দলে বা সম্মিলিত দলীয় সভায় বিল ব্যবস্থাপনার সমস্যাদি ও সম্ভাব্য সমাধানের উপায়, নিয়ম-নীতি ইত্যাদি নিয়ে আলোচনা ও ছোট খাটো সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে থাকে। ইতিমধ্যে অনিয়মতান্ত্রিক উপায়ে মাছ ধরার জন্য ২/১ জন মৎস্যজীবীকে শাস্তি প্রদানের অংশ হিসেবে জরিমানা আদায়ের ঘটনাও ঘটেছে।

যে বিষয়গুলো তাদের চিন্তা ও আলোচনার মুখ্য হয়ে উঠেছে সেগুলো হলো

(ক) এতবড় সম্পদ তারা কিভাবে সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা করবে।
(খ) ব্যবস্থাপনায় কোন নীতি-নিয়ম প্রয়োগ করবে/মেনে চলবে।
(গ) বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি কিভাবে কাজ করবে। কমিটির দায়িত্ব কর্তব্য কি হবে। কমিটিতে কাহারা অন্তর্ভুক্তি থাকবে।
(ঘ) স্থায়িত্বশীল উন্নয়নে মৎস্যজীবীদের ভূমিকা কি হবে।
(ঙ) বিলের জমি পত্তনী কিভাবে বন্ধ করা যায়।
(চ) বিলের অবকাঠামোগত কি কি পরিবর্তন, সংরক্ষণ করা প্রয়োজন।
(ছ) ভবিষ্যতে সংশ্লিষ্ট সংস্থার অবর্তমানে কিভাবে জলমহালের এবং নিজেদের সংগঠনের কার্যক্রমের গতিধারা চলমান থাকবে।
(জ) স্থানীয় সরকার/প্রশাসনের সঙ্গে কার্যক্রমের অগ্রগতির ধারা বজায় রাখার জন্য পরস্পর কোন প্রক্রিয়ায় কাজ করবে। অর্থনৈতিক ও কারিগরি সহায়তা কিভাবে অব্যাহত থাকবে, ইত্যাদি।

মৎস্যজীবীদের এ চিন্তা-চেতনা-অভিজ্ঞতাকে আরো বৃহত্তর পরিসরে সহযোগিতা করে অংকুরিত ভাবনাগুলোকে গাঠনিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্যে এবং আশুরার বিলে স্থায়িত্বশীল ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে মাঠ পর্যায়ে (বিল প্রাঙ্গণ) মৎস্যজীবীদের সক্রিয় অংশগ্রহণে ২ দিনব্যাপী (৮-৯ মে, ১৯৯৮) একটি কর্মশালার আয়োজন করা হয়। মাঠ পর্যায়ের এ ধরনের প্রথম ও বিশাল আয়োজনে মৎস্য ও পশুসম্পদ প্রতিমন্ত্রী, মৎস্য মহাপরিচালক, বিভিন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থার উচ্চপদস্থ ব্যক্তিবর্গ, দেশ বিদেশের প্রখ্যাত বিজ্ঞানীবৃন্দ এ কর্মশালার উপস্থিত থেকে এর কলেবর অনেকাংশেই জাতীয় পর্যায়ের মর্যাদা লাভ করেছে। প্রতিটি দল থেকে ৪-৫ জন করে মৎস্যজীবী ও মহিলা সদস্যসহ প্রায় ১৫০ জন অতিথি এ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করেন।

কর্মশালায় দলীয় আলোচনায় অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

কর্মশালাটিতে একটি উদ্বোধনী ও সমাপনী অধিবেশনসহ দুটি কারিগরি অধিবেশন ছিল। মৎস্যজীবীরা আশুরার বিল ব্যবস্থাপনা বিষয়ক ৪টি প্রবন্ধ রচনা ও উপস্থাপন করে। পাশাপাশি কারিতাস, ইকলার্ম ও মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকেও ১টি করে প্রবন্ধ উক্ত কর্মশালায় উপস্থাপিত হয়। কর্মশালায় একটি অধিবেশনে উপস্থিত মৎস্যজীবী প্রতিনিধিগণ ৪টি দলে বিভক্ত হয়ে বিষয়ভিত্তিক বাকযুদ্ধ আলোচনায় অংশগ্রহণ করে এবং তা পূর্ণ অধিবেশনে (Plenary Session) সকল প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে আলোচনা করা হয়।

পরিশেষে দুদিনব্যাপী কর্মশালা মৎস্যজীবীদের মাধ্যমে বাস্তবায়নযোগ্য সুপারিশমালা গ্রহণের মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হয়। গৃহীত সুপারিশমালার সার সংক্ষেপ নিম্নরূপ ঃ

(ক) জ্যৈষ্ঠ-শ্রাবণ এই তিন মাস আশুরার বিলের কোন স্থানেই মাছ ধরা যাবে না।

(খ) কারেন্ট জাল দিয়ে মাছ ধরা নিষেধ। নির্দিষ্ট ফাঁসের জালে বিলে মাছ ধরা যাবে।

(গ) সর্বোপরি মাছ ধরার জন্য বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদিত সরঞ্জামই ব্যবহার করা যাবে। বিলে বাঁধ দিয়ে মাছ ধরা সম্পূর্ণ নিষেদ্ধ।

মাঠ পর্যায় ৮-৯ মে, ১৯৯৮ তারিখে অনুষ্ঠিত "আশুরার বিলে স্থায়িত্বশীল মৎস্য ব্যবস্থাপনা শীর্ষক কর্মশালায় উপস্থাপিত প্রবন্ধসমূহ

১। *আশুরার বিলে মৎস্য কার্যক্রম ব্যবস্থাপনা*
২। *বিলে মাছ ধরা ও সমবন্টন পদ্ধতি*
৩। *বিলের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনায় নিয়ম-নীতি ও প্রয়োগ পদ্ধতি*
৪। *বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির দায়িত্ব*
৫। *বিল ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ*
৬। *বুড়ির দহে মৎস্য অভয়াশ্রমের কারিগরি দিক*
৭। *বিল ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন গবেষণা কার্যক্রম।*

(ঘ) অভয়াশ্রমে কেউ মাছ ধরতে পারবে না। অভয়াশ্রমে তিন বছর পর পর সাতদিনব্যাপী মাছ ধরা যাবে। অভয়াশ্রম সীমানার ১০০ গজের মধ্যে মাছ ধরা যাবে না। অভয়াশ্রম ছাড়া বিলের অন্য কোন স্থানে কাঠা দেয়া যাবে না।

(ঙ) বহিরাগত মৎস্যজীবী বা এলাকার অন্যান্য ব্যক্তিগত শুধু খাওয়ার জন্য মাঝে মধ্যে মাছ ধরতে পারবেন। বিক্রির জন্য নয়।

(চ) প্রতিটি সংগঠিত দলের সভাপতি/সভানেত্রী ক্ষমতা বলে বিল ব্যবস্থা / কমিটির সদস্য হবেন। ৩ বছরান্তে বিল ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্বাচনের মাধ্যমে পরিবর্তন হবে। সদস্যগণ পারস্পরিক সৌহার্দ্যের ভিত্তিতে বিল ব্যবস্থাপনা যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা করবেন।

(ছ) প্রত্যেক দল থেকে প্রয়োজনে অভয়াশ্রমে পাহারার ব্যবস্থা করবে এবং পাহারাদারের পারিশ্রমিক দলীয়ভাবে সংগৃহীত হবে।

(জ) বিলে ব্যবহার নিষিদ্ধ এমন মাছ ধরার সরঞ্জাম কমিটি বাজেয়াপ্ত করতে পারবেন এবং আইন অমান্যকারীকে জরিমানা, সাময়িক শাস্তি বা সদস্যপদ বাতিল করার ক্ষমতা রাখে।

(ঞ) যে সময়কালে মাছ ধরা নিষিদ্ধ সে সময় কারিতাস বা পরবর্তীতে নিজ নিজ দলের সংগৃহীত সঞ্চয় বৃদ্ধি ও গ্রহণের মাধ্যমে বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

(ট) সরকারী সহযোগিতায় দহগুলোর গভীরতা বৃদ্ধি করে পাড়ের জমিকে ধান চাষের উপযোগী করে তোলার প্রচেষ্টা নেয়া হবে।

(ঠ) বিলের মৎস্য সম্পদ সংরক্ষণ ও মৎস্য আহরণ সহনশীল পর্যায়ে রাখার প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে।

(ড) মৎস্যজীবীগণ বিল ব্যবস্থাপনা কমিটির মাধ্যমে বিলের ওপর ধার্যকৃত ইজারামূল্য সরকারী কোষাগারে জমাদান করে নিজেদের অধিকার সংরক্ষণ করবেন।

এভাবেই আশুরার বিলের মৎস্যজীবীরা প্রকল্প সহায়তায় নিজেদের ইচ্ছা, আগ্রহ ও সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে বিল ব্যবস্থাপনায় নিজেদের সম্পৃক্ত করেছে। যে দহকে ঘিরে এলাকাবাসীর ছিল এক সময় অকল্যাণের ও মৃত্যুর জুজুবুড়ির ভয়, সেই বুড়ির দহ আজ সত্যিকারে হয়ে উঠেছে বিলবাসীদের জীবনের আশার প্রদীপ ও বিল উন্নয়নের প্রধান সোপান।

উন্মুক্ত জলাশয় ব্যবস্থাপনায় জনগণের অংশগ্রহণ

আনোয়ারা বেগম শেলী
এস.এম. নাজমুল আলম, কারিতাস

বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে মৎস্য সম্পদ জাতীয় আয়, রপ্তানী আয়, কর্মসংস্থান ইত্যাদি ক্ষেত্রে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে–একথা অনস্বীকার্য। তবে সবচেয়ে বড় অবদানটি হলো আমিষের চাহিদা পূরণ। প্রাণীজ আমিষ সুষম খাদ্যের একটি প্রধান উপাদান এবং আমাদের দেশের জনগণের জন্য মৎস্য হচ্ছে এর অন্যতম প্রধান উৎস। কারণ দেশের সিংহভাগ লোক দরিদ্র। প্রতিদিনের আহারে পরিমাণমত আমিষ জাতীয় খাদ্য হিসেবে উচ্চমূল্যের মাংস, ডিম বা দুধের সংস্থান করা তাদের পক্ষে সম্ভব নয়। আর তাই আমিষের চাহিদার শতকরা ৮০ ভাগ সরবরাহ হয়ে থাকে মাছ থেকে। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান চাপ এবং অভ্যন্তরীণ মুক্ত জলাভূমির অব্যবস্থাসহ নানাবিধ কারণে আমাদের মাথাপিছু মৎস্য প্রাপ্তি কমে এসেছে। এ অবস্থার পরিবর্তন করতে হলে মৎস্য সম্পদের সার্বিক উন্নয়ন জরুরী। অন্যথায় ভবিষ্যতে আমাদেরকে একটি পুষ্টিহীন জাতি হিসেবে পরিচিত হওয়ার সমূহ আশংকা বিদ্যমান। এমতাবস্থায়, দেশের জলাভূমি সম্পদের বর্তমান অবস্থা বিশ্লেষণ ও উৎপাদন বৃদ্ধির সম্ভাব্য ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ আবশ্যক। দেশের মোট জল সম্পদের পরিমাণ প্রায় ২১০ লক্ষ হেক্টর। এর মধ্যে ১৬৬.০৭ লক্ষ হেক্টর সামুদ্রিক এলাকা যে সম্পদের ব্যবহার অনেকটা আহরণেই সীমিত-নিয়ন্ত্রণ ও উন্নয়ন ব্যবস্থা আজও ব্যাপক নয়। অভ্যন্তরীণ বদ্ধ জলাশয়ের ২.৬১ লক্ষ হেক্টর সম্পদে বর্তমানে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির একটি গণজাগরণ সৃষ্টি হয়েছে, মাছের উৎপাদনও বেড়েছে। যদিও শিক্ষা বঞ্চিত, অভাবগ্রস্ত, মৎস্য চাষ উপকরণ পেতে সমস্যাগ্রস্ত, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবলিত আমাদের চাষীদের পক্ষে সকল ক্ষেত্রে মাছ চাষের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা সম্ভব হচ্ছে না তবে হাজামজা অব্যবহৃত পুকুর, ডোবা আগের মত নেই বললেই চলে। দেশের প্লাবনভূমির পরিমাণ ২৮.৩৩ লক্ষ হেক্টর। মাটির উর্বরতা, পানির গভীরতা, পলির আধিক্যসহ নানাবিধ কারণে এই প্লাবনভূমিগুলি মৎস্য উৎপাদন, বিচরণ ও প্রজননের জন্য উৎকৃষ্ট। সত্তরের দশকে অভ্যন্তরীণ জলাশয়ের মোট উৎপাদনের ৭০ ভাগ পাওয়া যেতো প্লাবনভূমি থেকে। উৎপাদন সম্ভাবনা বিপুল থাকা সত্ত্বেও বর্তমানে তা কমে এসেছে। বিশেষ করে যেখানে সারা বছরব্যাপী অথবা বছরের বেশিরভাগ সময়ে পানি থাকে সে ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করে জলাশয় ভিত্তিক পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন অপরিহার্য।

বাংলাদেশে প্রায় ১০,০০০ জলমহাল রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে এসব জলমহাল ভূমি মন্ত্রণালয়ের অধীনে উন্মুক্ত নিলাম অথবা বিজ্ঞপ্তি আহ্বানের মাধ্যমে শুধুমাত্র রাজস্ব আদায়ের লক্ষ্যে বর্ষভিত্তিক লীজ দেয়া হতো। মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন, স্থানীয় উপকারভোগীর কাছে লীজ প্রদান অথবা জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ - এ বিষয়গুলি উপরোক্ত লীজ পদ্ধতির পূর্বশর্ত ছিলনা। ফলতঃ ক্ষমতাবান, প্রভাবশালী, অমৎস্যজীবী এমনকি বহিরাগত ব্যক্তিবর্গ জলমহালের লীজ পেতো। লীজ গ্রহণের পর যার একমাত্র লক্ষ্য হতো প্রাপ্ত সময়ের মধ্যে কত বেশী মাছ আহরণ করা যায়। অনেক ক্ষেত্রে লীজগ্রহিতা জলমহলটি শুকিয়ে নিত, যাতে করে মৎস্য গোত্রের সর্বশেষ প্রাণীটিও আহরিত হয়।

মধ্য আশির দশক থেকে অভ্যন্তরীন জলাশয়গুলোতে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারী প্রকল্প বাস্তবায়িত হয়েছে। বিশ্ব ব্যাংকের অর্থায়নে তৃতীয় মৎস্য প্রকল্প, এডিবির অর্থায়নে দ্বিতীয় মৎস্য উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা হয়। মূলত হাওর, বাঁওড়, বিল ও মৌসুমী জলাশয়ে পোনা অবমুক্ত করার মাধ্যমে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যেই প্রকল্পগুলি পরিচালিত ছিল। পোনা অবমুক্তি মৎস্য উৎপাদনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে একথা স্বীকার্য যদিও মৎস্যজীবীদের অংশগ্রহণ, মৎস্য সংরক্ষণের দায়িত্বগ্রহণ এবং জলাশয়ের স্থায়ী উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রকল্পগুলির অবদান প্রশ্নাতীত নয়।

এমতাবস্থায়, নব্বই এর দশকে 'সমাজ ভিত্তিক মৎস্য ব্যবস্থাপনা প্রকল্প' (সিবিএফএম) বিশেষ বিশেষ লক্ষ্য সামনে রেখে বাস্তবায়িত হচ্ছে। যেমন সুনির্দিষ্ট উপকারভোগী চিহ্নিত করা (দরিদ্র মৎস্যজীবী), স্থানীয় জনগণের কাছে জলাশয় লীজ দেয়ার ব্যবস্থা করা, জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা, বছরব্যাপী মৎস্যজীবীদের কাজের সুযোগ করা, মৎস্য ব্যবস্থাপনা শিক্ষা দেয়া, উপকারভোগীদের দ্বারা জলাশয়ের স্থায়ী উন্নয়ন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা এবং আয়ের সমবন্টন কায়েম করা। সরকার, এনজিও এবং উপকারভোগীদের যৌথ উদ্যোগে প্রকল্পটির ১ম ধাপ সাফল্যজনকভাবে শেষ হতে চলেছে। ইতোমধ্যে কয়েকটি জলাশয়ে প্রকল্পের লক্ষ্য উদ্দেশ্য বাস্তবায়িত হয়েছে।

সিবিএফএম প্রকল্প বাস্তবায়নকালে উন্মুক্ত জলাশয়, বিল, বাঁওড় ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে নিম্নরূপ বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয়েছে ঃ-

* বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে থাকা উন্মুক্ত জলাশয়গুলির ধরন, ভূ-প্রাকৃতিক অবস্থা, প্রাকৃতিক সম্পদ ভিন্ন ভিন্ন। একটির সাথে অন্যটির মিল পাওয়া যায়না। এজন্য মৎস্য সম্পদ

উন্নয়নের পরিকল্পনা গ্রহণকালে এ বিষয়টি চিন্তায় রাখা তথা জলাশয়গুলোর শ্রেণীবিন্যাস করা আবশ্যক।

* যে জলাশয়গুলিতে সারা বছর অথবা বছরের বেশীর ভাগ সময়ে পানি থাকে এবং ব্যবস্থাপনাযোগ্য সেগুলিকে মাছ চাষের আওতায় আনা যেতে পারে (যেমন ঃ হামিল বিল)। এধরনের ছোট, বড় বিল, বাঁওড়ের ক্ষেত্রে স্বল্প পরিমাণ সংস্কার কার্যক্রম (যেমন পুনঃখনন, বাঁধ, কালভার্ট) হাতে নিতে হতে পারে।
* যে জলাশয়গুলি মুক্ত সেগুলিতে মৎস্য সম্পদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারে, যেগুলি নির্ভর করে জলাশয়ের ভূপ্রাকৃতিক অবস্থা, মাছের চলাচল ও আবাসের উপর। যেমন কিছু কিছু বিল রয়েছে (যেমন ঃ আশুরার বিল) বর্ষা মৌসুমে অন্যান্য জলাশয়ের সঙ্গে সংযুক্ত থাকে কিন্তু শুষ্ক মৌসুমে একক বিল হিসাবে বিরাজ করে। বিলের কিছু কিছু অংশ গভীর এবং সারা বছর পানি থাকে। এরকম বিলে মৎস্য সংরক্ষণ এবং মৎস্য চাষ দুটোই হতে পারে। যেহেতু বর্ষা মৌসুমে আমাদের দেশের অধিকাংশ মাছ প্রজনন করে সে জন্য এসময়ে বিলের গভীর ২/১ টি অংশকে অভয়াশ্রম হিসাবে মৎস্য সংরক্ষণের কাজে ব্যবহার করা এবং ২/৩ মাস মিহি ফাঁসের জাল বিলে নিষিদ্ধ করা যায়। পাশাপাশি শুষ্ক মৌসুমে গভীর অংশগুলোতে রুই জাতীয় মাছের বড় পোনা ছেড়ে মৎস্য চাষের চাষের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব।
* কিছু কিছু প্লাবন ভূমি/বিল রয়েছে যেগুলোকে রুই জাতীয় মাছের পোনা পাওয়া যায় এমন নদীর সাথে সম্পৃক্ত করা যায়। এক্ষেত্রে হয়তো সংযুক্ত খাল কাটার প্রয়োজন হতে পারে (যেমন ঃ সিংহরাগী বিল)। বর্ষা মৌসুমে নদী থেকে রুই জাতীয় পোনা এসে এসব বিলকে আবাসভূমি হিসেবে পায়; যথাযথ সংরক্ষণের ফলে মৎস্য উৎপাদন বহুলাংশে বৃদ্ধি পেতে পারে।
* আমাদের জলাশয় বহুবিধ জৈব বৈচিত্রের কেন্দ্র বিন্দু। সেখানে মৎস্য যেমন রয়েছে তেমনি বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদ, পাখী, প্রাণী রয়েছে। দরিদ্র জনগোষ্ঠীর স্থায়ীভাবে খাদ্যের যোগান দেয়া এবং জলাশয়ের পরিবেশ অনুকূল সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত সম্পদগুলোর উপস্থিতি ও উন্নয়ন অপরিহার্য। শুধুমাত্র মৎস্য সম্পদের উন্নয়নকল্পে সেগুলিকে চিন্তা না করে কিছু কিছু জলাশয় 'প্রাকৃতিক সম্পদ উন্নয়ন' ভিত্তিক কার্যক্রমের আওতায় আনা যায়, যা স্থায়ী উন্নয়নের একটি সফল পদক্ষেপ হবে বলে ধারণা করা হয়।

জলাভূমির উন্নয়ন করতে হলে স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণ তথা দায়িত্ব গ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হলে দুটো বিষয়ের উপর নজর দিতে হবে। প্রথমত, জলাশয়টি 'তাদের' এবং এর উন্নয়ন তাদেরই করতে হবে এই অনুভূতি জাগিয়ে তুলতে হবে। এর জন্য প্রয়োজন দীর্ঘমেয়াদী লীজ। এক বছরের জন্য সম্পদটি পাওয়া এবং পরবর্তী বছরে পাবে কি না অনিশ্চয়তা, এমন পরিস্থিতিতে কেউ সম্পদের মালিকানা স্বপ্ন দেখেনা। সুতরাং সে সম্পদের উন্নয়নের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনায়ও তারা উৎসাহী হয় না। দ্বিতীয়তঃ জলাশয়টি উপকারভোগীদের জীবিকার উৎস এ সত্যটি তাদের দ্বারা প্রমাণ করিয়ে দিতে হবে। এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জলাশয়ের সর্বোচ্চ সহনশীল উৎপাদন বনাম উপাকার ভোগীর সংখ্যা নির্ধারণ কাজটি সুচারুরূপে করা প্রয়োজন।

দীর্ঘমেয়াদী লীজ প্রাপ্তির পর কাঙ্খিত জনগণের মধ্যে সম্পদের নিজস্বতা অনুভূত হবে। জলাশয়ের উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের শুরুতে জলাশয় পাড়ের দরিদ্র জনগণ চিহ্নিত করে তাদের সংগঠিত করা অপরিহার্য। অতপরঃ সঞ্চয়, সচেতনতা বৃদ্ধি, বয়স্ক শিক্ষা ও অমৎস্যকাজে সহায়তা প্রদান ইত্যাদির পাশাপাশি জলাশয়গুলোতে মৎস্য সম্পদের উন্নয়ন কার্যক্রম চালিয়ে যেতে হবে। শেষদিকে রূপালী ফসল আহরণ, বিপণন ও আয়ের সমবন্টনে সহায়তা দিতে হবে। সর্বোপরি ইজারা মূল্য জমাকরণ ও পরবর্তী সময়ের জন্য জলাশয় ইজারা পাওয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। সফলভাবে মৎস্য উন্নয়ন ব্যবস্থাপনা বাস্তবায়নের মাধ্যমে জনগণ সত্যিকার অর্থে জীবিকার উপায় খুঁজে পাবে এবং তখনই তাদের মধ্যে দায়িত্ব বোধ জাগ্রত হবে। এ ভাবে একটা সময় আসবে যখন কোন প্রকল্প ছাড়াই জনগণ তাদের জলাশয়ের স্থায়ী উন্নয়ন নিশ্চিত করবে কারণ এর সাথেই সম্পর্কযুক্ত তাদের নিজেদের উন্নয়ন। সুতরাং জনগণের অংশগ্রহণই শুধু নয়, দায়িত্বগ্রহণ নিশ্চিত করতে পারলেই জলাভূমির স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন সম্ভব।

টেকসই ব্যবস্থাপনা ধারা

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনা

ডঃ মোঃ সাইফুদ্দিন শাহ্
জীব বিজ্ঞান স্কুল, খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়

ভূমিকা

সুন্দরবন সারা বিশ্বের মধ্যে একক খন্ডে সর্ববৃহৎ ম্যানগ্রুভ বনাঞ্চল। বিশ্ব পরিবেশ নিয়ন্ত্রণে এই বনভূমির ভূমিকা বিবেচনা করে সম্প্রতি IUCN এই বনভূমিকে World Heritage হিসাবে ঘোষণা করেছে। ইহা গাঙ্গেয় বদ্বীপে বাংলাদেশের সর্ব-দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে বঙ্গোপসাগরের তীর ঘেঁষে ৮৯.০০°-৮৯.৫৫° পূর্ব অক্ষাংশ এবং ২১.৩০°-২২.৩০° উত্তর দ্রাঘিমাংশে অবস্থিত। বাংলাদেশ এবং ভারতের পশ্চিমবঙ্গের ভূখন্ড জুড়ে বিস্তৃত। বাংলাদেশের ভূখন্ডে এ বনের আয়তন ৫৫,৭২৮৫ হেঃ (৫৭৭২.৮৫ বঃ কিঃ মিঃ)। এর মধ্যে ৪০,১৬৮৫ হেঃ বনভূমি এবং বাকি ১৫,৫৬০০ হেঃ নদী, খাল, খাড়ি এবং মোহনা অঞ্চল। এসব নদী, খাল, খাড়ি এবং মোহনার জলাভূমি সুন্দরবনের মধ্যে জালের মত ছড়িয়ে আছে।

ম্যানগ্রুভ বন সমুদ্রের জোয়ার ভাটা অঞ্চলে গড়ে ওঠে ফলে এ অঞ্চলের বনে যেমন উচ্চ লবনাক্ততা সহ্য করার মত বৃক্ষ প্রজাতির উদ্ভব হয়েছে তেমনি ম্যানগ্রুভ অঞ্চলের নদী-জলাভূমিতে পাওয়া যায় উচ্চলবণাক্ততা সহ্য করার মত মাছসহ নানা জাতের জলজ প্রাণী। আবার মোহনা অঞ্চলের পানির লবণাক্ততা নদীর পানির দ্বারা প্রবাহিত স্বাদু পানির মিশ্রণে হঠাৎ অস্বাভাবিক মাত্রায় কমে গেলেও এসব জলজ প্রাণী তা অনায়াসে সহ্য করতে পারে। তাছাড়া যেহেতু নদীবাহিত পানির দ্বারা প্রচুর খনিজ লবণ এবং অন্যান্য পুষ্টি নদী মোহনায় মিশে যায় সেহেতু এ অঞ্চলে পানির উর্বরতা শক্তি অনেক বেশি থাকে। ফলে এখানে মাছের খাদ্য প্রচুর তৈরি হয় এবং সে কারণে এ অঞ্চলে প্রচুর মাছও পাওয়া যায়। তাছাড়া সুন্দরবনের বিরাট বিস্তৃত এবং অপেক্ষাকৃত অগভীর জলরাশিতে বনের গাছপালার প্রচুর লতা পাতা পড়ে পচে যায় এবং জৈব পদার্থের সৃষ্টি করে যা মাছের খাদ্য শিকল তৈরি এবং আবাস ও চারণভূমি হিসাবে গড়ে উঠতে বিশেষ সহায়ক হয়ে ওঠে। সে কারণে সুন্দরবন নানা জাতের সামুদ্রিক এবং লোনা পানির মাছের লালন এবং চারণভূমি হিসাবে বিশেষ ভূমিকা পালন করছে এবং বাংলাদেশের একটি অমিয় সম্ভাবনাময় মৎস্যসম্পদ হিসাবে পরিগণিত হয়েছে।

ম্যানগ্রুভ সম্পদ

সুন্দরবনের ম্যানগ্রুভ সম্পদ একটি অনন্য বৈশিষ্ট্যধর্মী সম্পদ। সুন্দরবনে রয়েছে এক বিপুল বনজ সম্পদ যা থেকে মূল্যবান কাঠ এবং কাগজের মন্ড তৈরির জন্য অত্যন্ত জরুরী উপাদান সংগৃহীত হয়। এ বনে আছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্যধর্মী বন্য প্রাণী সম্পদ আর আছে বিপুল বিস্তৃত পানি সম্পদ এবং মাছ। বর্তমান তথ্যমতে সুন্দরবনে মোট ৩৩৪ প্রজাতির গাছ পাওয়া যায়। এসব প্রজাতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে সুন্দরী, গেওয়া, গোরান, গোলপাতা, হেঁতাল ইত্যাদি। বাণিজ্যিক ভিত্তিতে আহরিত অন্যান্য দ্রব্য হচ্ছে মধু, মোম, ঝিনুকের শেল, কাঁকড়া, বাগদা এবং গলদা চিংড়ির পোনা, বড় বাগদা এবং গলদা চিংড়ি এবং নানা জাতের সাদা মাছ। ( )

সুন্দরবনে মোট ৪২৫ প্রজাতির বন্য প্রাণী আছে বলে জানা যায়। এদের মধ্যে ৪৯টি স্তন্যপায়ীর প্রজাতি, ৩১৫টি পাখির প্রজাতি, ৫৩টি সরীসৃপের প্রজাতি এবং ৮টি উভচর প্রাণীর প্রজাতি রয়েছে। এসব প্রজাতি যথাক্রমে সারা বাংলাদেশের স্তন্যপায়ী প্রাণীর শতকরা ৩৪ ভাগ, পাখির প্রজাতির শতকরা ৩৫ ভাগ এবং সরীসৃপ প্রাণীর প্রজাতির শতকরা ২৯ ভাগ। এ থেকে অনুমান করা যায় বন্য প্রাণীর দিক থেকে সুন্দরবন কত বিপুল এবং বৈচিত্র্যময়!

আগেই বলা হয়েছে সুন্দরবনের বিশাল জলরাশি সুবিস্তৃত নদী-নালা এবং খাল দ্বারা সংযুক্ত। এ জলরাশিকে মোটামুটিভাবে ৪টি নদীর মোহনায় বিভক্ত করা যায়। এগুলো হচ্ছে রায়মঙ্গল, ভাংরা, কুঙ্গা এবং মালঞ্চ মোহনা। এসব মোহনার অনেকগুলোর আড়াআড়ি দৈর্ঘ্য স্থানভেদে এমনকি ১০ কিঃমিঃ পর্যন্ত বিস্তৃত। পশুর এবং শিবসা নদীর মোহনাকে কুঙ্গা মোহনা বলা হয় এবং এ প্রবাহের উজানেই পশুর নদীতে মংলা বন্দর স্থাপিত হয়েছে। বাংলাদেশের জলসম্পদের বৃহৎ অংশটিই হচ্ছে সুন্দরবনের এই জলসম্পদ। এই বনের জলরাশির দ্বারা দৈনিক আনুমানিক ৩৪,০০০ ঘন মিটার পানি বঙ্গোপসাগরে পতিত হয়। এ বিপুল জলরাশির বেশির ভাগ পানিই আসে গঙ্গা-পদ্মার শাখা, উপনদী-গড়াই, মধুমতি দিয়ে।

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ অত্যন্ত প্রাচুর্যময়। সুন্দরবনে বছরে যে পরিমাণ মাছ আহরিত/উৎপাদিত হয় তা সারা দেশে বাৎসরিক উৎপাদিত মাছের প্রায় শতকরা ৫ ভাগ। সুন্দরবনের বনভূমি এলাকার জলাশয় এবং জোয়ার ভাটা অঞ্চল স্বাদুপানি, সামুদ্রিক এবং লোনা পানির এক বিস্তৃত প্রজাতির মাছ এবং চিংড়ি মাছের প্রজনন এবং লালন ভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এ বনের জলাভূমিতে ছোট ও প্রান্তিক আকারের জেলে গোষ্ঠির দ্বারা এক বিরাট বিস্তৃত এবং অনিবিড় আহরণ পদ্ধতি গড়ে উঠেছে এবং এই আহরণ

প্রক্রিয়ার এক বিপুল সংখ্যক জনগোষ্ঠির কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের আহরণ ও ব্যবস্থাপনা বাংলাদেশ বন বিভাগ কর্তৃক পরিচালিত হয়। এই ব্যবস্থাপনা খুলনা সুন্দরবন বিভাগ এবং এর কতগুলো আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের অফিস দ্বারা পরিচালিত হয়।

সুন্দরবনের জলাভূমির পানি অত্যন্ত উর্বর এ কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। এর পানিতে উদ্ভিজ প্লাঙ্কটনের প্রাচুর্যতা বিষয়ে অনেক সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে। ঋতু ভেদে এর জলাভূমিতে অনেক উচ্চহারে উদ্ভিজ প্লাঙ্কটনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা গেছে। একটু বড় অথচ ক্ষুদে আকারের বিভিন্ন মাছ কিংবা অমেরুদন্ডী প্রাণীর লার্ভা যাকে প্রাণী বিজ্ঞানে ইকথিয়োপ্লাঙ্কটন বলা হয় তাদের উপস্থিতির হারও পরীক্ষামূলকভাবে অনেক বেশী দেখা গেছে। সুন্দরবনের জলাভূমিতে উচ্চহারে ইকথিয়োপ্লাঙ্কটনের উপস্থিতি কেবল একথাই ইংগিত করে যে এই অঞ্চল নিঃসন্দেহে অনেক প্রজাতির সাদা মাছ এবং চিংড়ি মাছের এক বিরাট গুরুত্বপূর্ণ প্রজনন এবং লালন ভূমি হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদ আসলেই বেশ বিস্তৃত। এ বনের জলাভূমিতে ২৭ গোত্রের আওতায় ৫৩ প্রজাতির অগভীর পানির মাছ, ৪৯ গোত্রের আওতায় ১২৪ প্রজাতির গভীর পানির মাছ, ৫ গোত্রের আওতায় ২৪ প্রজাতির চিংড়ি, ৩ গোত্রের আওতায় ৭ প্রজাতির কাঁকড়া, ২ প্রজাতির শামুক, ৬ প্রজাতির ঝিনুক, ৪ প্রজাতির লবষ্টার, ৩ প্রজাতির কচ্ছপ, ১০ প্রজাতির সাপ, ৩ প্রজাতির ব্যাঙ এবং ২ প্রজাতির কুমির পাওয়া যায়। সুন্দরবনের উল্লেখযোগ্য মৎস্য প্রজাতিসমূহ হচ্ছে *Hilsa ilisha, Lates calcarifer, Pomadasys hasta, Polynemous spp. Johnius dussumeri, J. argentatus, Harpodon nehereus, Trichiurus haumela, Setipinna taty, Pampus argenteus, Srdinala spp. Selar spp. Macrobrachium rosenbergii, Penaeus monodon, Penaeus, indicus, Metapenaeus monoceros Parapenaeopsis spp. Scylla serrata* এবং বিভিন্ন জাতের হাঙ্গর মাছ।

সুন্দরবনের মৎস্য ইনশোর এবং অফশোর মৎস্য এ দু'ভাগে বিভক্ত। অফশোর ফিশারী সমুদ্র তীরের ৩২১০ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বিস্তৃত। এ অঞ্চলে প্রধানত সেট ব্যাগ নেট দ্বারা মৎস্য আহরণ করা হয়ে থাকে। ইনশোর প্রকৃতির ফিশারী বনাঞ্চলের অভ্যন্তরের জলাশয়ের ৮১৭ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় ব্যাপৃত। এ এলাকায় প্রায় ১৪ রকমের জাল/যন্ত্র দিয়ে মাছ আহরণ প্রক্রিয়া চলে। এগুলো হলো শোর নেট, শোর সীন নেট, অপার গীল নেট, ইলিশ গীল নেট, স্টিক নেট, হুক ও লাইন, ক্যাস্ট নেট, চিংড়ি নেট, ক্যানাল গীল নেট, ক্যাব হুক ও লাইন, পাংগাস গীল নেট, বাগদা চিংড়ির পোনা টানা জাল, বাগদা চিংড়ি সেট ব্যাগ নেট ইত্যাদি। এ সব জাল/যন্ত্র দিয়ে সুন্দরবনে প্রায় ২ লক্ষ জেলে মাছ ধরার কাজে জড়িত আছে। সুন্দরবনের অধিকাংশ মাছ এবং চিংড়িই রোদে শুঁকিয়ে শুটকী বানিয়ে কিংবা লবন মিশিয়ে প্রক্রিয়াজাতকরণের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়ে থাকে। এ ছাড়াও অনেক মাছ এবং চিংড়ি সরাসরি নিকটস্থ বাজারে বিক্রি করা হয় নতুবা খুলনা অঞ্চলের মৎস্য প্রক্রিয়াজাত কারখানায় বিক্রি করা হয়ে থাকে। শুটকী মাছ এবং লবণ মিশ্রিত মাছের বেশির ভাগই চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজারে বাজারজাত করা হয়ে থাকে।

সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের সমস্যা

সুন্দরবনের এই সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদ নানা সমস্যার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে এবং এ সব সমস্যা সমাধানের জন্য আশু ব্যবস্থা গ্রহণ জরুরী হয়ে পড়েছে। এ সব সমস্যা হচ্ছে অতিরিক্ত মৎস্য নিধন, অবৈধ মৎস্য আহরণ এবং দুর্নীতি। বন বিভাগ কর্তৃক সুন্দরবনের মৎস্য আহরণ এবং ব্যবস্থাপনায় কেবল সরকারের বার্ষিক রাজস্ব আদায়ের বিষয়টিকে অগ্রাধিকার দেয়া হয়; আসলে জৈব-ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নানা বিষয়কে কখনো আমল দেয়া হয় বলে মনে হয় না। তাছাড়া এত বিশাল জলরাশিতে নিয়োজিত বিপুলসংখ্যক জেলে গোষ্ঠির উপর নিয়ন্ত্রণ রাখার মত জনবল এবং অবকাঠামো সুন্দরবন বিভাগের নেই। তাই একটি সুচিন্তিত ও সুবিন্যস্ত পদ্ধতির মাধ্যমে ব্যবস্থাপনা পরিচালিত করে এ সম্পদের সংরক্ষণ করা আজ একান্ত জরুরী হয়ে পড়েছে।

সুন্দরবনাঞ্চলে এবং এর অন্তর্গত নদী, খাল এবং মোহনায় এক বিরাট জনগোষ্ঠি বাগদা ও গলদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ করে এবং তা ঐ অঞ্চলে সাম্প্রতিক কালে গড়ে উঠা চিংড়ি চাষের ঘেরে বিক্রি করে। বাগদা ও গলদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহের সময় বিপুল সংখ্যক অন্যান্য জাতের মাছ এবং চিংড়ির পোনা ধরা পড়ে। এসব অবাঞ্ছিত জাতের পোনা মাছ শুকনায় ফেলে দিয়ে যথেচ্ছ নিধন প্রক্রিয়া চলছে। এ নিধন প্রক্রিয়া সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদকে এক গভীর সংকটের মধ্যে নিপতিত করেছে। এ বিষয়ে পরিচালিত বিভিন্ন সমীক্ষার ফলাফল নিচের সারণী থেকে দেখা যেতে পারে।

সারণী ১ ঃ একটি বাগদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহের ফলে সাদা মাছ, অন্যান্য চিংড়ির পোনা এবং ম্যাক্রোজুওপ্লাঙ্কটনের তুলনামূলক সংখ্যা

বৎসর	এলাকা	অন্যান্য চিংড়ির পোনা	সাদা মাছের পোনা	ম্যাক্রোজুওপ্লাঙ্কটন	সূত্র
১৯৮৯	কক্সবাজার	২২	৩১	৪৭	আলম (১৯৯০)
১৯৯০ ১৯৮২ ১৯৮৩	টেকনাফ চকোরিয়া সাতক্ষীরা খেপুপাড়া	১৪	২১	১৬৩১	মাহমুদ (১৯৯০)
১৯৯৭	শৈলমারী, খুলনা	৬৪১	৭৩	১৬৭০	কামাল ও অন্যান্য (১৯৯৮)
১৯৯০ শতকরা প্রতি ৩ ভাগ বাগদার পোনার জন্য	সুন্দরবন	৭৩%	২৪%	-	চৌধুরী (১৯৯০)

সুন্দরবনের নদী-নালা, খাল এবং মোহনায় মাছ ধরার জন্য প্রত্যেক নৌকাকে লাইসেন্স প্রদান করা হয় এবং প্রতি নৌকায় কতজন জেলে মাছ ধরবে তা নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়। তাছাড়া মাছ ধরার পর মাছের জাত এবং পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কর আরোপ করা হয়ে থাকে। এ পদ্ধতিতে মাছ ধরার ফলে আদতে সুন্দরবনের মৎস্য সম্পদের কোন ক্ষতি হবার কথা নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এ বিষয়ে সুন্দরবন বিভাগের তেমন নিয়ন্ত্রণ নেই। তদুপরি লাইসেন্স প্রদান এবং কর আরোপের ক্ষেত্রেও ব্যবস্থাপনা কর্তৃপক্ষের অবহেলা, অব্যবস্থাপনা এবং দুর্নীতির কথা জানা যায়। ফলে ঠিক কত সংখ্যক জেলে কি প্রকারের জাল বা যন্ত্র দিয়ে সুন্দরবনে মাছ আহরণ করছে তার পরিসংখ্যান বিষয়ে এক বিরাট রকমের তথ্যের ফাঁক রয়েছে বলে সহজেই অনুমান করা যায়। ফলে এ সম্পদের বর্তমান ব্যবহার এবং ভবিষ্যৎ অবস্থার বিষয়ে তাৎক্ষণিক এবং নির্ভরযোগ্য কোন তথ্যই পাওয়া সম্ভব নয় যা এই সম্ভবনাময় মৎস্য সম্পদের জন্য কিছুতেই কাম্য হতে পারে না। চাঁনতারাশ্রী (১৯৯৪) সুন্দবরনের মৎস্য সম্পদের উপর একটি সমীক্ষা পরিচালনা করেন এবং বিভিন্ন প্রজাতির ক্ষেত্রে উৎপাদন (Yield) আহরণ হার (Exploitation rate, E) এব MSY নির্ধারণ করেন। নিচের সারণী থেকে সমীক্ষার ফলাফল দেখা যেতে পারে।

সুন্দরবনের নদীতে বাগদা চিংড়ির পোনা সংগ্রহ

সারণী ২ ঃ সুন্দরবনের মাছের বিভিন্ন প্রজাতির উৎপাদন (Yield), MSYএবং Exploitation rate (E)

Species	Yield (Ton)	MSY (Ton)	Exploitation rate (E)	Remarks
Hilsa ilisha	750	–	0.58	Over exploited
Lates calcarifer	150	–	0.5	Fully exploited
Pangasius pangasius	150	–	0.75	Over exploited
Pomadasys hasta	200	–	0.4	Optimum exploitation
M. rosenbergii	250	–	0.37	Optimum exploitation
Scylla serrata	375	283	–	Over exploitation
Crassostrea gigas	3000	6000	–	Under exploitation
Cassidula auristelis	35	113	–	Under exploitation
P. monodon	1453	672	–	Over exploitation

সুন্দরবনের গহীনে ছোট ছোট খালে অনেক দুর্নীতিপরায়ন মৎস্যজীবী এমনকি বিষ প্রয়োগেও মাছ আহরণ করে বলে জানা যায় যা এই মৎস্য সম্পদের টিকে থাকার জন্য অত্যন্ত ভয়াবহ। অপরিকল্পিত ও সমন্বয়হীন পদ্ধতিতে সুন্দরবনে মৎস্য আহরণের কারণে ইতোমধ্যেই সম্পদের অনাকাংখিত ক্ষতি হয়ে গেছে বলে ধারণা করার অনেক সংগত কারণ রয়েছে। বিগত ১৯৯১-৯২ হতে ১৯৯৫-৯৬ পর্যন্ত সময়ে সুন্দরবনের পরিসংখ্যান থেকে সাম্প্রতিক এক সমীক্ষায় জানা যে, উক্ত সময়ে সুন্দরবনের অধিকাংশ জাতের মাছের ক্ষেত্রে বার্ষিক মোট আহরণের পরিমাণ যেমন কমেছে তেমনি বার্ষিক রাজস্ব আয়ের পরিমানও কমেছে।

উপসংহার

সুন্দরবনের এই সম্ভাবনাময় মৎস্য সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণের জন্য এর বর্তমান ব্যবস্থাপনায় আমূল পরিবর্তন আনা দরকার। সুন্দরবন বিভাগের আওতায় পরিচালিত বর্তমান ব্যবস্থাপনায় জড়িত জনবলে কোন মৎস্য জীব বিজ্ঞানী নিয়োজিত নেই। মৎস্য সম্পদ যেহেতু একটি নিরেট জৈব সম্পদ তাই এর ব্যবস্থাপনায় মৎস্য জীব বিজ্ঞানী নিয়োজিত করা ব্যতীত কোন্ গত্যন্তর নেই। পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক গুরুত্বের প্রেক্ষিতে এবং সুষ্ঠ ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষন পদ্ধতি গ্রহণের স্বার্থে সুন্দরবনের জৈব-জলজ সম্পদের উপর অবিলম্বে একটি বিস্তারিত জরীপ হওয়া প্রয়োজন। এতে করে এ বনাঞ্চলের জলাশয়ে কোন্ প্রজাতির মাছ বছরের কোন্ সময় এবং কোন্ নদীর মোহনায় প্রজনন করে এবং কোন্ এলাকায় লালিত হয় তা জানা যাবে এবং সেভাবে ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা গ্রহণ করা যাবে। সুন্দরবনের মাছের বর্তমান স্ট্যান্ডিং স্টক কত এবং এর MSY কত হওয়া উচিত তা সঠিক জানা প্রয়োজন এবং সে ভাবেই এর ব্যবস্থাপনা নীতি গৃহীত হওয়া উচিত।

হ্যাসাপ ভিত্তিক মৎস্য মান নিয়ন্ত্রণে ভেরিফিকেশনের গুরুত্ব

এস, এন, চৌধুরী
মোঃ রফিকুল ইসলাম
মৎস্য অধিদপ্তর

পরীক্ষাগারের সনাতন পদ্ধতিতে মান নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে উৎপাদিত বা প্রক্রিয়াজাত পণ্যের ভৌত, রাসায়নিক এবং অনুজীব সংক্রান্ত মান নিশ্চিত করে ভোক্তাদের চাহিদা মাফিক মানসম্পন্ন নিরাপদ খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন এবং সরবরাহ করা বর্তমান প্রেক্ষাপটে কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারছে না। সমস্ত বিশ্ব জুড়ে বিভিন্ন সংক্রমণ রোগের বাহক প্রধানতঃ খাদ্য। খাদ্যবাহিত রোগের কারণেই প্রতিবছর বিপুল পরিমাণ খাদ্য প্রধানতঃ জীবাণুঘটিত সংক্রমণ ও পচনের জন্য নষ্ট হচ্ছে। বিভিন্ন পরিসংখ্যান থেকে দেখা যায় সারা বিশ্বের মোট খাদ্য উৎপাদনের প্রায় ৫ ভাগ ভোক্তাদের নিকট পৌঁছার পূর্বেই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। তাই বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, খাদ্য উৎপাদক বা প্রক্রিয়াকারকের এবং মাননিয়ন্ত্রণের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলো কার্যকর মান নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি অন্বেষণে সচেষ্ট হন। ১৯৬১ থেকে শুরু করে সুদীর্ঘ দিন গবেষণা করে ১টি বিষয়ে একমত পোষণ করেন যে খাদ্য বা পণ্য উৎপাদনের উৎস্য স্থল থেকে যে সকল কারণে পণ্য সংক্রমিত হচ্ছে তা সত্য প্রতিপাদ্য করে যাচাই এবং নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হলেই ভোক্তাদের নিরাপদ স্বাস্থ্য, সুস্থ জীবন উপহার দেয়া সম্ভব। আর তাই সম্ভাব্য দূষণের বিন্দু বা ধাপসমূহ বিশ্লেষণের মাধ্যমে সংকটময় অবস্থান চিহ্নিতকরণ এবং তা নিয়ন্ত্রণ করা বা হ্যাজার্ড এনালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট আজ যুগের চাহিদা (HACCP)। ইহা একটি খাদ্যে অণুজীব ঘটিত সংকটময় দূষণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানভিত্তিক, যুক্তিসংগত, সহজসাধ্য ও নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি। এই পদ্ধতি অবলম্বনে প্রায় ১০০ ভাগ খাদ্যে অণুজীব ঘটিত রোগের সংক্রমণ রোধ করা সম্ভব।

হ্যাজার্ড এনালাইসিস ক্রিটিক্যাল কন্ট্রোল পয়েন্ট এই তাত্ত্বিক, যৌক্তিক, নির্ভরযোগ্য পদ্ধতিটি ৭টি মূলনীতি অবলম্বনে গড়ে উঠেছে। মূলনীতিগুলো হলো-

১। দূষণসমূহ বিশ্লেষণ (Hazard Analysis)

২। সংকটময় বিন্দু বা ধাপ নির্ধারণ

৩। সংকটময় মাত্রা নির্ধারণ

৪। সংকটময় অবস্থানসমূহ মনিটরিং করা

৫। সংকটময় অবস্থান যথাযথভাবে কার্যক্ষম না হলে তা সংশোধন এর ব্যবস্থা গ্রহণ

৬। হ্যাসাপ প্রথা যথাযথ কার্যকর হচ্ছে কিনা তা অডিট বা ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে নিশ্চিত হওয়া

৭। হ্যাসাপ প্রথার সকল কার্যক্রম এর রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

ভেরিফিকেশন বা অডিটিং হ্যাসাপ প্রথার ৬ষ্ঠ ধাপ। এই ধাপটি হ্যাসাপ প্রথা সঠিকভাবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা নির্ধারণ করে থাকে। হ্যাসাপ বাস্তবায়নে ভেরিফিকেশনের ভূমিকাই অগ্রগণ্য। বিভিন্ন গবেষণালব্ধ পরীক্ষার সাহায্যে সম্পূরক তথ্যের যথাযথ ব্যবহার করে ইহা নিশ্চিত হওয়া যে হ্যাসাপ পদ্ধতি সঠিকভাবে কার্যকর আছে।

ভেরিফিকেশন বা অডিটিং শব্দ ২টি একই অর্থে ব্যবহার করা হলেও, দেশ-স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এর কিছুটা পার্থক্য রয়েছে বলে অনেক দেশ মনে করেন। ভেরিফিকেশন শব্দটি কোন কোম্পানির ক্ষেত্রে দুর্বলভাবে ব্যবহার হয়েছে। আর অডিটিং-এর ক্ষেত্রে একটু গভীরভাবে ব্যবহার হয়েছে। কিন্তু US, FDA Verification এবং Audit একই অর্থে ব্যবহার করে থাকেন। অধিকাংশ দেশের রেগুলেটরী এজেন্সির মতে ৮৫-৯০% ভাগ রপ্তানিকারক Verification এবং Audit প্রথা মেনে চলতে চান না কেননা সঠিক Verification এবং Audit-এর ফলে কোন কোম্পানির গুপ্ত তথ্য বের হয়ে যেতে পারে বা অন্য কোন ধরনের ক্ষতির আশংকা থাকে। যেহেতু অধিকাংশ ব্যবসায়ী তার লাভের কথাকেই প্রাধান্য দেয়- সেহেতু তারা সঠিকভাবে Verification করতে চান না। কিন্তু Verification ছাড়া কোন হ্যাসাপ বাস্তবায়ন সম্ভব নহে।

হ্যাসাপ বাস্তবায়নে Verification এর গুরুত্ব ঃ

যে কোন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা সরকারি সংস্থা কিছু নির্ধারিত নীতি মানদন্ড অনুসরণ করে চলে। নিরাপদ খাদ্য তৈরির ক্ষেত্রে ২টি বিষয়ে বিশেষভাবে লক্ষ্যণীয় তাহলো System বা প্রথা এবং Compliences বা প্রথা পরিপালন করা। যে কোন ব্যবসার ভবিষ্যত উন্নতি নির্ভর করে System বা প্রথা সঠিকভাবে কার্যকর আছে কিনা তা নিরূপণের মাধ্যমে সঠিকভাবে তা প্রতিপালন করা। এই জন্য হ্যাসাপ প্রথার আলোকে Verification এর ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো বিবেচনায় আনতে হবে।

(ক) System বা প্রথা ঃ

১। প্রাতিষ্ঠানিক পরিকল্পনা এবং মাননিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা কার্যকর কিনা?

২। নিশ্চিত হতে হবে যে পরিকল্পনা এবং অন্যান্য কার্যক্রম সঠিকভাবে কার্যকর আছে?

৩। যে প্রথার পরিকল্পনা করা হয়েছে তা আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসারে তৈরি কিনা?

(খ) প্রথা প্রতিপালন করা ঃ

১। প্রমাণ খুঁজে বের করা যে প্রথা বা System যথাযথভাবে চালু আছে এবং তার রেকর্ডপত্র সংরক্ষণ করা হয়।

২। প্রথা যথাযথভাবে কার্যকর আছে তা নিশ্চিত হওয়ার মানদন্ড যাচাই করার জন্য প্রাপ্ত তথ্যসমূহের কার্যকারিতা বা গভীরতা মূল্যায়ন করা।

৩। কোন বিশেষ জায়গার বা ক্ষেত্রের মান উন্নয়ন করতে হলে এবং তার সঠিক ব্যবস্থা কি, তা চিহ্নিত করা।

Verification এর প্রকার ভেদ ঃ

ক্রেতা-বিক্রেতা এবং নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের সুষ্ঠু সমন্বয়ের Verification বা সত্য প্রতিপাদন বিষয়টি নির্ভরশীল। সেদিক লক্ষ্য রেখে Verification প্রক্রিয়াকে নিম্নরূপভাবে ভাগ করা যাচ্ছে।

১। প্রথম পক্ষ- অভ্যন্তরীণ ভেরিফিকেশন (Internal Verification) ঃ কোম্পানী তার নিজস্ব প্রথা বা প্রক্রিয়ার সত্য প্রতিপালন করবেন।

২। ২য় পক্ষ- (ক) External Verification (বাহ্যিক ভেরিফিকেশন)ঃ কোম্পানী কাঁচামাল সরবরাহকারীকে Verification করবেন।

(খ) Extriasic Verification ঃ ক্রেতা কর্তৃক বিক্রেতাকে Verification করা।

৪। ৩য় পক্ষ- Independent Verification (স্বাধীন সংস্থা)ঃ সনদপত্র প্রদানকারী কর্তৃপক্ষ কর্তৃক Verification করা।

১ম পক্ষ- কোন খাদ্য প্রস্তুতকারক তার ব্যবসার স্বচ্ছতা আনয়ন করার জন্য এবং উৎপাদিত পণ্যের মান যথাযথভাবে রক্ষা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার জন্য প্রাত্যহিক কাজের মূল্যায়ন করবেন।

(ক) ২য় পক্ষ, বাহ্যিক Verification এর মাধ্যমে ১ম পক্ষ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনের যৌক্তিক দিকগুলো যাচাই করে উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হবেন। কাঁচামাল সরবরাহকারীর সুযোগ-সুবিধা পণ্য পরিবহন ব্যবস্থা প্রভৃতি বিষয়ের মানদন্ডসমূহ সঠিকভাবে প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা ১ম পক্ষ যাচাই করবেন এবং সরবরাহকৃত কাঁচামাল নিরাপদ মানসম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে সহায়ক কিনা তা নিশ্চিত করবেন।

(খ) ক্রেতা, বিক্রেতার পণ্য উৎপাদনের সুযোগ-সুবিধা, উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার জন্য বিক্রেতার সকল কার্যক্রম মূল্যায়ন করবেন এবং তার সত্যতা যাচাই করবেন।

(গ) ৩য় পক্ষ- জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক স্বাধীন কোন সংস্থা ক্রেতা, বিক্রেতা বা বিক্রেতা দেশের চাহিদা অনুসারে আন্তর্জাতিক মানদন্ড অনুসরণ করে পণ্য উৎপাদন করা হচ্ছে কিনা তা যাচাই করবেন এবং পণ্যের মান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে যে সকল বিষয়সমূহ বিবেচনায় নেয়া প্রয়োজন তা সুষ্ঠুভাবে সত্য প্রতিপাদন করে উৎপাদিত পণ্যের মান সম্পর্কে স্বাস্থ্যকরত্ব পত্র প্রদান করবেন।

হ্যাসাপ প্রথার আলোকে Verification কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো বিবেচনা করতে হবে তা হলো-

(ক) Verification প্রক্রিয়ায় বিভিন্ন বিষয় সংযোজন ঃ

১। একটি যুগোপযোগী সত্য প্রতিপাদন পরিদর্শন ছক তৈরী

২। হ্যাসাপ প্লান পর্যবেক্ষণ

৩। সিসিপি রেকর্ড পর্যবেক্ষণ

৪। বিচ্যুতি এবং বিন্যাস পর্যবেক্ষণ

৫। ইন্দ্রিয় পরীক্ষার মাধ্যমে সিসিপি নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ

৬। দৈবচয়ন পদ্ধতিতে নমুনা সংগ্রহ এবং বিশ্লেষণ

৭। সংকটময় মাত্রা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে সংকটময় অবস্থান বা দূষণ নিয়ন্ত্রণে আছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ

৮। লিখিত রেকর্ডপত্রসমূহ পরিদর্শনের মাধ্যমে সত্য প্রতিপাদন করে সনদপত্র প্রদান করা যে হ্যাসাপ প্লান বা তার বিচ্যুতি-এর সংশোধনীর প্রক্রিয়াগুলো সঠিক তা প্রত্যায়ন করা।

৯। সরেজমিনে কারখানা পণ্য উৎপাদনের প্রবাহ পথ এবং সংকটময় অবস্থান বা বিন্দুসমূহ পরিদর্শনপূর্বক হ্যাসাপ প্লান এবং বৈধতা প্রদান এবং পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে হ্যাসাপ প্লান-এর আকার বা অবস্থানের উন্নয়ন করা।

(খ) সত্য প্রতিপাদনের মাধ্যমে পরিদর্শন প্রক্রিয়া পরিচালনা ঃ-

১। নিত্যকর্মের মাধ্যমে বা অঘোষিতভাবে নিশ্চিত করা যে প্রতিষ্ঠিত সংকটময় অবস্থান বা বিন্দু (সিসিপি) সমূহ নিয়ন্ত্রণে কোন নির্দিষ্ট পণ্যের খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে নতুন তথ্যানুসারে আতিশয্য আবরণ প্রয়োজন কিনা?

২। যখন পরিদর্শক নিশ্চিত যে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে কোন নির্দিষ্ট উৎপাদিত পণ্যের জন্য আতিশয্য আবরণের প্রয়োজন তখন তা নির্দিষ্টকরণ করা।

৩। খাদ্য তৈরীর বিভিন্ন ধাপসমূহ পর্যালোচনা করা যাতে উৎপাদিত খাদ্য দ্রব্যের সহিত কোন খাদ্যবাহিত কোন রোগ বাহিত হতে না পারে।

৪। Verification-এর সময় কোন প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় যিনি বিশেষজ্ঞ হিসাবে কাজ করেন এবং বিশেষজ্ঞ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মাত্রা প্রতিপালিত হচ্ছে কিনা তা খেয়াল করা।

৫। উৎপাদিত পণ্যের মান উন্নয়নের ক্ষেত্রে সংশোধিত মান উন্নীত হ্যাসাপ প্লান সঠিকভাবে কার্যকর কিনা তা যাচাই করা।

গ) Verification রেকর্ডসমূহে যে সকল তথ্য থাকবে তা হলো ঃ-

১। হ্যাসাপ প্লান-এর অস্তিত্ব এবং যে ব্যক্তির হ্যাসাপ প্লান-এর মান উন্নয়নে প্রশাসনিক দায়িত্বে তার নাম, ঠিকানা, পদবী।

২। হ্যাসাপ প্লান-এর কার্যকারিতা সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হচ্ছে কিনা তা যাচাই করার লক্ষ্যে কাঁচামাল সংগ্রহের উৎসস্থল হতে প্রতিটি পর্যায়ের রেকর্ড সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করা।

৩। কারখানায় প্রতিষ্ঠিত এসএসওপি এবং জিএমপি'র সকল কার্যক্রমের রেকর্ড সংরক্ষণ করা।

৪। সিসিপি মূল্যায়নে যে সকল রেকর্ড সম্পৃক্ত যুক্ত তা প্রতিষ্ঠা করা।

৫। প্রক্রিয়া চলাকালীন সময়ে সরাসরি সিসিপি মূল্যায়ন করা।

৬। এই মর্মে প্রত্যয়ন প্রদান করা যে মূল্যায়ন কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সঠিকভাবে কার্যকর এবং তা কার্যক্ষম।

৭। বিভিন্ন বিচ্যুতি এবং তার সংশোধনী কার্যক্রম।

৮। সিসিপিসমূহ নিয়ন্ত্রণে আছে তা নিশ্চিত করার জন্য নমুনা বিশ্লেষণ করা এই বিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় বাহ্যিক, রাসায়নিক অণুজীব বা ইন্দ্রিয়যোগ্য পরীক্ষাসমূহ অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

৯। হ্যাসাপ প্লান-এর মান উন্নয়ন করার রেকর্ড এবং

১০। সিসিপি মনিটরিং করার ক্ষেত্রে প্রত্যেক ব্যক্তির

কারিগরী জ্ঞান এবং সে সম্পর্ক প্রশিক্ষণ আছে কিনা তা যাচাই করা।

আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ পণ্য উৎপাদনকারী বা প্রক্রিয়াজাতকরণকারী সুষ্ঠু সমন্বয়ের মাধ্যমে উল্লেখিত কার্যক্রমসমূহ সুষ্ঠুভাবে প্রতিপালনের মাধ্যমে বা ক্রেতা দেশের ক্রেতা চাহিদা অনুসারে মানসম্পন্ন পণ্য সরবরাহ করতে পারে এবং এই প্রক্রিয়া যথাযথভাবে অনুসরণ করে পণ্যের মান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার বিশ্বাস অর্জন করতে পারে। সত্য প্রতিপাদন করে দৃঢ় বিশ্বাস অর্জন করতে পারলে বিশ্ব বাজারে উক্ত পণ্য বাজারজাত করা খুবই সহজসাধ্য সে ক্ষেত্রে সনাতন পদ্ধতিতে উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাই করার কোন প্রয়োজন দেখা দেয় না। পণ্যের মান সম্পর্কে দৃঢ় বিশ্বাসের ফলে ক্রেতা বিক্রেতা দেশের মধ্যে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরের মাধ্যমে আমদানী রপ্তানী বাণিজ্য পরিচালিত হতে পারে। এর আরো একটি ভালো দিক হলো যে ক্রেতা এবং বিক্রেতা রেগুলেটরী এজেন্সী সনাতন পদ্ধতিতে পণ্যের মান যাচাই করার জন্য যে সময় ও অর্থ ব্যয় করেন তারও যথেষ্ট সাশ্রয় হয়। এ জন্য আইন প্রয়োগকারী কর্তৃপক্ষ কারখানার উৎপাদিত পণ্যের মান যাচাই করার জন্য যে সকল রেকর্ড রয়েছে তা সততা, দক্ষতা, স্বচ্ছতার সহিত যাচাই করা হলেই হ্যাসাপ প্রথা বাস্তবায়ন করে মান সম্পন্ন মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য উৎপাদন সম্ভব। এ ব্যাপারে পণ্য উৎপাদনকারীর আন্তরিকতা, প্রতিশ্রুতি রক্ষা এবং রেগুলেটরী এজেন্সীর সততা এই তিনটি বিষয়ে সমন্বয় হলেই সঠিক ভেরিফিকেশনের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্যের মান নিশ্চিত করে ভোক্তাদের নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ করা সম্ভব।

মৎস্য সপ্তাহ '৯৮ সফল হউক

কেন সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিঃ উৎপাদিত পণ্য?

- ❑ বিজ্ঞানসম্মত, সুষম, দানাদার ও নির্ভরযোগ্য মানসম্পন্ন।
- ❑ চিংড়ি, মাছ ও মুরগীর দ্রুত বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- ❑ প্রত্যাশিত খাদ্য রূপান্তর হার (FCR) যা আর্থিকভাবে লাভজনক।
- ❑ প্রতিযোগিতামূলক দাম হলেও মানে আন্তর্জাতিক।
- ❑ আকর্ষণীয় ঘ্রাণ সমৃদ্ধ।
- ❑ পুষ্টিমান যথার্থ হওয়ায় বাড়তি উপকরণ মিশানোর প্রয়োজন নেই।
- ❑ প্যাকেটজাত থাকে বিধায় অনেকদিন গুণগত মান ঠিক থাকে।

সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিঃ উৎপাদিত পণ্যসমূহ

- ❑ স্রিম্প ফিড
- ❑ স্পেশাল স্রিম্প ফিড
- ❑ গলদা ফিড
- ❑ ফিশ ফিড
- ❑ পাংগাস ফিড
- ❑ পোলট্রি ফিড

"চরম উৎকর্ষতায় মৎস্য ও পশুসম্পদ উন্নয়নে আমরা অঙ্গীকারাবদ্ধ"

sbff

সৌদি বাংলা ফিশ ফিড লিমিটেড

১/বি, আউটার সার্কুলার রোড, মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ ফোন ঃ ৮৩৪৫১০, ৪১০১৯৩

প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় মাথাযুক্ত চিংড়ি সরবরাহ মানোন্নয়নের পূর্বশর্ত

মোঃ কদর আহমদ
জি. কে. এস. এম. সৈয়দ আমিন
মৎস্য পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ দপ্তর, চট্টগ্রাম

বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে চিংড়ির অবস্থান তৃতীয়। সম্প্রতি উপকূলীয় এলাকায় আধানিবিড় চিংড়ি চাষ চিংড়ি উৎপাদনে এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনেছে। আশা করা যায় আগামী ৩/৪ বৎসরের মধ্যে চিংড়ি রপ্তানী আয় ২০০০ কোটি টাকায় উন্নতি হবে। চিংড়ি চাষের উন্নতির সাথে সাথে উহার মান নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারটি বড় হয়ে দেখা দিয়েছে। চিংড়ি ঘের হতে প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় সরবরাহ পর্যন্ত প্রক্রিয়াজাতকরণের পূর্বে এর বিভিন্ন ধাপে যথাযথ মান নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হলে আমাদের উৎপাদিত চিংড়ির মান নষ্ট হবে এর ফলে বিদেশের বাজারে আমাদের পণ্য ন্যায্যমূল্য হতে বঞ্চিত হবে। এটা প্রায় নিশ্চিতভাবে বলা যায়। রপ্তানী কৃত চিংড়ির আন্তর্জাতিক বাজার পর্যালোচনা করলে দেখা যায় পার্শ্ববর্তী দেশের চিংড়ির তুলনায় আমাদের চিংড়ি প্রতি কেজিতে ১ (এক) ডলারেরও অধিক কম মূল্যে রপ্তানী করতে হচ্ছে কারণ খামার হতে আহরিত চিংড়ি কারখানায় পৌছার পূর্বেই উহার খাদ্যমান ও সতেজতা হ্রাস পায়।

প্রাক-প্রক্রিয়াকরণ

খামার হতে আহরিত চিংড়ি টাটকা ও উজ্জ্বল অবস্থা হারিয়ে বিবর্ণ-লাল, কাল দাগ, নরম, থেতলানো, আংশিক পচা ও গন্ধযুক্ত হওয়ার কারণ জানা প্রয়োজন। বাংলাদেশের অধিকাংশ উপকূলীয় এলাকাতে সনাতন পদ্ধতিতে চিংড়ী চাষ করা হয়। চাষকৃত চিংড়ি আহরণ অমাবশ্যা ও পূর্ণিমার জোয়ার ভাটার সাথে সম্পর্কিত। অধিকাংশ চিংড়ি রাতের বেলা স্লুইস গেটের মুখে জাল পেতে ধরা হয়। ধরাকালিন সময়ে এই চিংড়িতে লেগে থাকা ময়লা, কাদা ও জিল্লি না ধুয়েই সারারাত বরফহীন অবস্থায় অপরিষ্কার অস্বাস্থ্যকর ও নোংরা কুঁড়েঘরের মেঝেতে রাখা হয়। ফলে তেলাপোকা, ইঁদুর ও অন্যান্য পোকা-মাকড় ঐ চিংড়িকে আক্রমণ করে। এ অবস্থায় প্রাথমিকভাবে অণুজীব ও ক্ষতিকারক জীবাণু সংক্রমিত হয়। এ ছাড়াও অত্যধিক গরম ও বায়ুর সংস্পর্শে চিংড়িতে কালো দাগ আসে এবং সতেজতা হারায়।

আহরিত চিংড়ি পরদিন অপরিষ্কার অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় অবতরণ কেন্দ্র বা ডিপোতে সরবরাহ করা হয। পরিবহনকালে নামমাত্র তেরপলিন বা চাটাই আচ্ছাদিত থাকে, আবার কখনও প্রখর সূর্যের আলোতে খোলা অবস্থায় থাকে।

অবতরণ কেন্দ্র বা মাথা ছেঁড়ার কেন্দ্রে পৌছার পর ঐ চিংড়ি পুনরায় অপরিষ্কার মেঝেতে রেখে স্বাস্থ্যজ্ঞানে অজ্ঞ শ্রমিক দ্বারা মাথা ছেঁড়ার কাজ করানো হয়। কর্মীগণ একদিকে মাথা ছেঁড়ার কাজ অন্যদিকে ঐ মেঝেতে থু থু, কাশি ও নাকের হাঁচি ফেলতে দেখা যায়, যা কোন না কোন উপায়ে চিংড়িতে সংক্রমিত হয়। শ্রমিকদের সংক্রামক রোগ যেমন, টাইফয়েড, প্যারাটাইফয়েড, আমাশয়, পেটের ব্যথা বা ডায়রিয়া আছে কি না সেদিকে ডিপো বা মাথাছেঁড়া কেন্দ্রের মালিক কারো নজর থাকে না। অপরদিকে, সে সব চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্রে পায়খানা প্রশ্রাবের কোন সুব্যবস্থা নাই। এমনকি হাত জীবাণুমুক্তকরণের জন্য সাবান, ক্লোরিন পানি বা কোন জীবাণুনাশক না থাকায় কর্মীদের হাত হতে ক্ষতিকারক জীবাণু চিংড়িতে সংক্রমিত হয়।

মাথা ছেঁড়ার সময় অসংখ্য মাছি চিংড়িতে বসে। এত মাছি হওয়ার কারণ অনুসন্ধান করে দেখা যায় যে, ঐ কেন্দ্রের আশেপাশে এবং তৎসংলগ্ন আংগিনায় ড্রেন পরিত্যাক্ত চিংড়ির মাথা, অপদ্রব্য ও লতাপাতা পচে দুর্গন্ধযুক্ত হয় যা মাছি ও অন্যান্য পোকা-মাকড়ের বংশ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। এছাড়া কুকুর , গরু, ছাগল ও হাঁস মোরগ উক্ত কেন্দ্রে অবাধে বিচরণ করে। এ প্রাণীগুলোই ক্ষতিকারক রোগ জীবাণুর প্রধান বাহক। এ কারণেই চিংড়ির মান নষ্ট হচ্ছে, দেশ বঞ্চিত হচ্ছে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা আয় হতে।

ক্ষতিকারক রোগ জীবাণু, ময়লা, ধূলা-বালি, মাথা ছেঁড়া চিংড়ির খোলা মাংসে সংক্রমিত হলে তা মুক্ত করা খুবই কঠিন। মাথা ছেঁড়া চিংড়ি নামমাত্র ময়লা পানিতে ধুয়ে বরফজাত করা হয় এবং বিভিন্ন মানের চিংড়ি একই চৌবাচ্চাতে ঠাসাঠাসি করে রেখে পরিত্যাক্ত পচা হোগলার

পাটি বা চটের বস্তা দিয়ে আচ্ছাদিত করা হয়। পরিবহনের ভাড়া সাশ্রয়ের জন্য বেশি পরিমাণ চিংড়ি সংগ্রহ না হওয়া পর্যন্ত সময়ক্ষেপণ করে ট্রাক বা ভ্যান যোগে ডিপো বা প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় সরবরাহ করা হয়। পরিবহনেও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবহেলিত থাকে, চিংড়ি বোঝাই ট্রাকের তেরপলিনের উপর ট্রাকের হেলপারগণ অবাধে হাটাচলা করে থাকেন। অধিকাংশ ডিপোতে, ছোট ছোট সরবরাহকারীর চিংড়ি ডিপো মালিক পুনঃ পুনঃ নাড়া-চাড়া করে সাপ্লাইয়ার'স গ্রেড করতে দেখা যায়, এক্ষেত্রেও স্বাস্থ্যবিধি মানা হয়না। প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় কাঁচা মাল হিসাবে যে চিংড়ি পাওয়া যায় তার বাহ্যিক অবস্থা বিবর্ণ, কালোদাগ, নরম খোসা, থেতলানো, আংশিক পচা, দুর্গন্ধযুক্ত, মাথা ছেঁড়া চিংড়ির খোলা মাংস ক্রীম সাদা রং এর পরিবর্তে ময়লা আবর্জনা ভর্তি ও অত্যধিক ঝুলযুক্ত চিংড়ি দেখা যায়। অণুজীবঘটিত গুণাগুণে মাত্রাতিরিক্ত E. Coli ও মোট অণুজীব এবং কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিকারক জীবাণুও পাওয়া যায়।

এই অবস্থার উন্নতি না করে কেবল উন্নত পদ্ধতিতে চিংড়ি উৎপাদন বৃদ্ধি করেও ন্যায্যমূল্য পাওয়া যাবে না বরং বহিঃবিশ্বে আমাদের চিংড়ি'র রপ্তানী বাণিজ্যের প্রসারতা দিন দিন ছোট হয়ে আসবে। ফলশ্রুতিতে চিংড়ি চাষ হতে রপ্তানী পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের ব্যবসায়ী তথা জাতীয় কাংখিত উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

আহরিত চিংড়ির গুণাগুণ নষ্ট হওয়ার পর্যায়

প্রাকৃতিকভাবে জ্যান্ত চিংড়ির খোসা, ফুলকা ও পাকস্থলীতে অসংখ্য ব্যাকটেরিয়া বিদ্যমান থাকে কিন্তু শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতার ফলে ব্যাকটেরিয়া ঐ চিংড়িতে পচন কার্য চালাতে পারেনা। চিংড়ি মারা যাবার কিছুক্ষণ পরই শক্ত ও স্থিতিস্থাপক হয়ে যায়। এ অবস্থাকে রাইগর মর্টিস বলে। রাইগর মার্টিসকে ধরা হয় উপযুক্ত টাটকা অবস্থায়। এ অবস্থা সাধারণ তাপমাত্রায় অল্প সময় স্থায়ী হয় এবং এরপর থেকে চিংড়িতে পচন আরম্ভ হয়।

এই অবস্থায় চিংড়ির খাদ্যমান নষ্ট হয়ে যায়। দুর্গন্ধযুক্ত চিংড়ি কোন কোন ক্ষেত্রে বিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পরীক্ষা হতে জানা যায় একটি মাছি একবার কোন খাদ্যদ্রব্যে বসলে ৩০ হতে ৩০০টি ব্যাকটেরিয়া সংক্রামিত করতে পারে। সুতরাং এ থেকে মাছির ভয়াবহতা অনুমান করা যায়। অনুকূল পরিবেশে একটি ব্যাকটেরিয়া প্রতি ২০ মিনিটে দ্বিগুণ হয়। এই হিসাবে ৮ ঘন্টা পর একটি ব্যাকটেরিয়া প্রায় ৮৪ লক্ষ ব্যাকটেরিয়াতে পরিণত হয়। এই ক্ষুদ্র জীবাণুর বংশ বিস্তার তাপমাত্রা নির্ভর। নিম্ন তাপমাত্রায় উহা মারা যায় বা কর্মক্ষমতা লোপ পায়। তাই চিংড়িতে বরফ দেয়ার লক্ষ্য হলো চিংড়িতে উপস্থিত ব্যাকটেরিয়ার বংশ বৃদ্ধি এরেস্ট করা।

বরফ না দিলে আহরিত চিংড়ির আমিষের গঠনাকৃতি ভেঙ্গে যায় এবং চিংড়ি গরম হয়ে উঠে। এই অবস্থায় চিংড়ির গায়ের সংক্রমিত ব্যাকটেরিয়ার সংখ্যা দ্রুত বাড়তে থাকে, ফলে চিংড়ির পুষ্টিমান কমে এবং স্বাভাবিক সতেজতা হ্রাস পায়। একটি বিষয় জানা দরকার, টাটকা চিংড়ির গায়ে ক্রোমাজেন নামক নীলাভ পিগমেন্ট থাকে তা তাপ ও বায়ুর সংস্পর্শে লাইপোক্রমে পরিণত হয়। রান্না করা বা পচা চিংড়ির লাল রং এ কারণেই হয়ে থাকে। অপরদিকে তাজা চিংড়িতে কালো দাগ আসে, তাপ ও বায়ুর অক্সিজেনের সাথে চিংড়িতে প্রাকৃতিকভাবে উপস্থিত টাইরোসিন-এর সাথে জারক রস "টাইরোসিনএজ"-এর বিক্রিয়ার ফলে মেলানিন নামক কালো দাগের সৃষ্টি হয়। ব্যবহার করা হলে এ সকল পরিবর্তিত পন্থা থেকে চিংড়িকে রক্ষা করা যায়।

মাঠ পর্যায়ে আহরিত চিংড়ির পরিচর্যা ও করণীয়

বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলের পানি দূষণমুক্ত। তাই আমাদের চিংড়িতে E.Coli ও ক্ষতিকারক জীবাণু Salmonella এর উপস্থিতি না থাকাই স্বাভাবিক। কিন্তু এর ব্যতিক্রম ঘটে কেবলমাত্র চিংড়ি চাষ খামারে কাঁচা পায়খানা নির্মাণের ফলে। এ জন্য চিংড়ি চাষ খামারে সেফটি ট্যাংকযুক্ত পাকা পায়খানা ব্যবস্থা করা।

চিংড়ি আহরণের পূর্বে বরফের সংস্থান প্রধান কাজ। রাতের বেলায় চিংড়ি ধরার সাথে সাথে পানিতে ধুয়ে লেগে থাকা ময়লা, কাঁদা ও কিছু ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করে বরফ মিশ্রিত শীতল পানিতে চিংড়ি রেখে সহসা চিংড়ির তাপমাত্রা কমিয়ে নেয়ার ব্যবস্থাকে "পূর্ব শীতলীকরণ" বলে। মেঝে বা অপরিষ্কার স্থানে চিংড়ি না রেখে প্লাষ্টিকের ঝুড়িতে বরফ মিশ্রিত করা উত্তম প্রথা। এ অবস্থায় চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র বা ডিপোতে সরবরাহ করলে উহার টাটকা ও উজ্জ্বল বজায় থাকে।

চিংড়ি অবতরণ ও ডিহেডিং কেন্দ্রে করণীয় বিষয়

সরকারীভাবে পরিকল্পিত চিংড়ি অবতরণ কেন্দ্র না থাকায় প্রয়োজনের তাগিদে ব্যক্তি মালিকানায়

অপরিকল্পিতভাবে বেশ কটি অবতরণ কেন্দ্র বিদ্যমান আছে। অবতরণ কেন্দ্রের পাশে মাথা ছেঁড়ার ঘরগুলোতে উঁচু গেলভানাইজড বা মরিচামুক্ত টেবিলে চিংড়ি রেখে চিংড়ির মাথা ছেঁড়ার কাজ করা উচিত। অগত্যা টেবিল না থাকলে পরিষ্কার পাকা মেঝেতে মাথা ছেঁড়ার কর্মীদের হাত পা জীবাণুনাশক দ্বারা ধৌত করে কাজ করতে দেয়া বাঞ্ছনীয়।

মাথা ছেঁড়ার কেন্দ্রের চিংড়ি সংক্রমণমুক্ত রাখার উপায় হিসাবে নলকূপের পানি, বরফের যোগান, তার জ্বালিযুক্ত দরজা জানালা, স্বাস্থ্যসম্মত শৌচাগার থাকা, অযথা চিংড়ি নাড়াচাড়া না করা, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঙ্গিনা, পয়ঃনিষ্কাশনের জন্য পর্যাপ্ত গভীরতাসম্পন্ন ঢালু নর্দমা, অবাধে গৃহপালিত পশুপাখি বিচরণ করতে না দেয়া এবং হাতে ঘা ও সংক্রামক রোগে আক্রান্ত রোগীকে কাজে নিয়োজিত না করাই বাঞ্ছনীয়। পচা ও পরিত্যাক্ত ভিজা হোগলার পাটি ও চটের বস্তা প্যাকিং হিসাবে ব্যবহার না করা এবং প্রজাতি ও সতেজতা অনুযায়ী চিংড়ি আলাদা রেখে সঠিকভাবে বরফজাত করে স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে পরিবহনের মাধ্যমে কম সময়ে কাঁচামাল "চিংড়ি" কারখানায় পৌছানো উন্নত গুণাগুণ ও স্বাস্থ্যসম্মত পণ্য তৈরির একমাত্র উপায়।

চিংড়ি হেন্ডলিং-এর সংক্ষিপ্ত নিয়ম

চিংড়ি বরফে রাখার সংরক্ষণ নীতির উপর ভিত্তি করে সংরক্ষণ করতে যদি স্বাস্থ্যবিধির প্রতি লক্ষ্য না রাখা হয় তবে সংরক্ষণ যথাযথভাবে করা সম্ভব হয় না। সব সময় মনে রাখতে হবে চিংড়ি সংরক্ষণ পদ্ধতি একমাত্র পরিষ্কার ও টাটকা চিংড়ির প্রাপ্যতার উপর যথাযথভাবে কার্যকর।

সেই কারণে চিংড়ি যাহাতে সংক্রমিত ও গুণগত মান নষ্ট না হয় সেজন্য প্রাথমিকভাবে নাকের হাঁচি, নখ, মাছি ও তেলাপোকা ইত্যাদি নিরাপদ রাখা এবং সময়, তাপমাত্রা ও পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা অবহেলিত হলে চিংড়ির গুণগত মান নষ্ট হয়।

অপরিষ্কার পরিবেশে, সাধারণ তাপমাত্রায় অধিক সময় চিংড়ি থাকলে সহজেই পচে জীবাণু দুষ্ট হতে পারে। তাই চিংড়ি ধরা, নাড়াচাড়া, উঠানো-নামানো, প্যাকিং, সংরক্ষণ, পরিবহন ও গুদামজাতকরণের সর্বক্ষেত্রে কম তাপমাত্রা (শীতল অবস্থা) ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় লক্ষ্য রাখতে হবে।

উপসংহার

উপসংহারে আবারো বলবো, সংক্রমণমুক্ত টাটকা কাঁচামাল উন্নত গুণাগুণসম্পন্ন পণ্য তৈরীর একমাত্র পূর্বশর্ত। সুতরাং, ক্রমবর্ধমান চিংড়ি রপ্তানী বাণিজ্যের অর্থনৈতিক দিক বিবেচনা করে Pre-Process Handling এর সর্বক্ষেত্রে স্বাস্থ্যসম্মতভাবে সঠিক সময়ে বরফজাত করে মাথাযুক্ত চিংড়ি কারখানায় সরবরাহ একান্ত দরকার। নিয়ন্ত্রিত পণ্যের সর্বশেষ মান নিয়ন্ত্রক হচ্ছে আমদানীকারক দেশের ক্রেতা/ভোক্তা। তাদের বিচারে আমাদের উৎপাদিত পণ্যের গ্রহণযোগ্যতা এনে ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তির পথ সুগম করা আপনার আমার সকলের নৈতিক দায়িত্ব। এর ব্যতিক্রম হলে চিংড়ির দাম কমে যাবে এবং রপ্তানী বাণিজ্য ব্যাহত হবে। ফলে এ ব্যবসার সাথে জড়িত চাষী, জেলে, ক্রেতা বিক্রেতা, সরবরাহকারী, এজেন্ট, ডিপোর মালিক, মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানা ও রপ্তানীকারক সকলেরই আর্থিক বিপর্যয় ঘটবে এবং দেশের কাংখিত উন্নয়ন ব্যাহত হবে।

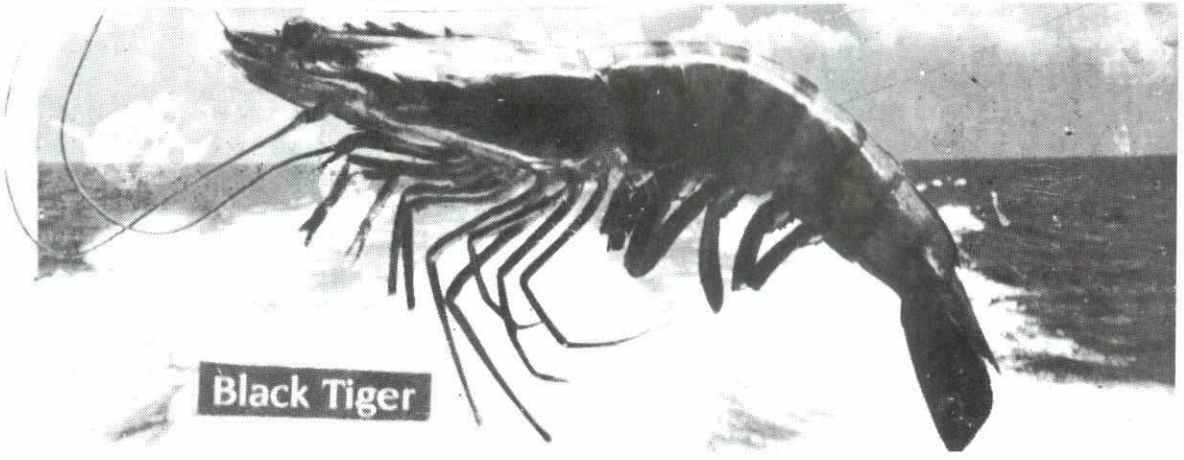

মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরনে সামগ্রীক প্রযুক্তিগত উন্নয়ন

প্রফেসর ডঃ মোঃ কামাল
পল্লব কুমার সরকার
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহ।

বাংলাদেশের মানুষের খাদ্য তালিকায় প্রাণীজ আমিষের প্রধান উৎস হল মাছ। তাই অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটানোর জন্য মাছের দ্রুত যোগান দেয়া আশু প্রয়োজন। মৎস্য সেক্টর আমাদের দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন (জি.ডি.পি), কর্মসংস্থান এবং বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে দেশের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। এই সেক্টরটি অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়া সত্ত্বেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা এখনও প্রাণীজ আমিষের ৬০ শতাংশ এবং মোট আমিষের চাহিদা পূরণে ৭ শতাংশ যোগান দিচ্ছে এই মৎস্য সম্পদ।

উৎপাদিত মাছের অধিকাংশ অভ্যন্তরীন চাহিদা মেটাতে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু ১৯৯৪-৯৫ অর্থ বছরে হিমায়িত চিংড়ি, হিমায়িত মাছ, শুটকি মাছ, লবণাক্ত শুটকী মাছ, জীবন্ত কচ্ছপ, হাংগরের পাখনা, কাঁকড়া; কাটল মাছ ও কিছু পরিমাণ স্কুইড রপ্তানী করে প্রায় ৩২৬ মিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্জিত হয়েছে। যেখানে ১৯৭২-৭৩ অর্থ বছরে মোট রপ্তানী আয় হয়েছিল ৪.৪৯ মার্কিন ডলার। পূর্বেকার দশ বৎসরের তুলনায় মৎস্য রপ্তানী প্রতি বৎসর প্রায় ১৫ শতাংশ করে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল রপ্তানীকারক পণ্যের মধ্যে মৎস্য জাত পণ্য তৃতীয় অবস্থান লাভ করেছে।

অভ্যন্তরীন ব্যবহার ও রপ্তানী বাণিজ্য উন্নীতকরণের লক্ষ্যে সরকারের পন্থা হলো মৎস্য অবতরণ কেন্দ্র এবং বাজারের গুণগতমানের উন্নয়ন। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রের উন্নয়নের প্রচেষ্টা এবং পাইকারী ও খুচরা বাজারের প্রভুত উন্নয়নের উৎসাহদান একটা উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনাময় দিক। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টা হলো উন্নত পরিচর্যা এবং মৎস্যবিধি বা আইনের যথাযথ দিক নির্দেশনা এবং স্বাস্থ্যবিধি বলবৎ করা। বাংলাদেশ সরকার সামুদ্রিক খাদ্য রপ্তানীর উন্নয়ন এবং মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন কারখানা স্থাপনের জন্য উৎসাহ যোগাচ্ছে। রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা দেওয়া সত্ত্বেও রপ্তানী বাজারে অনুপ্রবেশ সন্তোষজনক বা আশাপ্রদ নয়। রপ্তানী বাজারে প্রসার এবং রক্ষণাবেক্ষণের জন্য যথযথ পর্যবেক্ষণ এবং গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ অতীব জরুরী। রপ্তানী বাণিজ্য প্রসারের লক্ষ্যে মাছের গুণগতমানের উপর বেশী জোর দেওয়া হচ্ছে। যার ফলশ্রুতিতে রপ্তানীকারকরা নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যসম্মত উপায়ে মৎস্য জাত পণ্য রপ্তানীর লক্ষ্যে আমদানীকারদের যাবতীয় গুণগতমান নিয়ন্ত্রণে ভূমিকা রাখতে পারবে।

সামুদ্রিক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণের অবস্থা

বাংলাদেশে গত ১০-১৫ বছরে সামুদ্রিক মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন এবং হিমায়িত কারখানা স্থাপনের আশাব্যঞ্জক উন্নতি হয়েছে। ১৯৭১ সালে ৫৮ মেট্রিকটন হিমায়ন ক্ষমতাসম্পন্ন মাত্র ৯টি প্রক্রিয়াজাতকরন কারখানা ছিল। ১৯৯৩ সালের শেষের দিকে দৈনিক ৭১০ টন উৎপাদনক্ষম মোট ১০১ টি কারখানা ছিল। বর্তমানে ৮০০ টন উৎপাদনক্ষম মোট ১৩৯ টি মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানা আছে। কিন্তু অপরিকল্পিতভাবে কারখানা স্থাপন এবং কাঁচামালের দুষ্প্রাপ্যতার জন্য সবগুলো কারখানায় ব্যবহারগত উৎপাদন ক্ষমতা সন্তোষজনক নয়। ১৯৬০ সালের দিকে অধিকাংশ কারখানাই ৪০-৫০ শতাংশ, উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন ছিল। ক্রমান্বয়ে কমে তা ১৯৮৫-৮৬ সালে ২৪.১০ শতাংশে, ১৯৮৯-৯০ সালে ১৬.৬৮ শতাংশে এবং ১৯৯২-৯৩ সালে ১৯ শতাংশে নেমে আসে।

আহরনোত্তর কাঁচা মালের গুণগত মান

যে কোন মূল্যবান খাদ্য দ্রব্য প্রস্তুতির পূর্বশর্ত হলো ভাল গুণ সম্পন্ন কাঁচা মালের যোগান। আসলে এটি নির্ভর করে মৎস্য উৎপাদন চেইনের সাথে জড়িত বিভিন্ন পর্যায়ের কর্মকুশলীদের সার্বিক ব্যবস্থাপনার উপর। যেমন, সরকার, জেলে, বাণিজ্যিক ক্রেতাসাধারণ প্রভুতি। প্রত্যেকের যথাযথ ব্যবস্থাপনা দ্বারাই সম্ভব এই সম্পদের কার্যকরী ব্যবহার এবং মৎস্য উৎপাদন চেইনের প্রত্যেকটা অংশের সার্বিক উদ্দেশ্যকে সফলকাম করা।

বাংলাদেশ সরকারের ঐকান্তিক অভিপ্রায় হলো আহরনোত্তর কাঁচা মালের গুণগতমান রক্ষা কল্পে মাছের উন্নত পরিচর্যা ও মৎস্য বিধির যথাযথ দিকনির্দেশনা এবং স্বাস্থ্যবিধি বলবৎ করা। মৎস্য বাজারজাতকরন বিভিন্ন ধাপে সংঘটিত হয়। মৎস্য বাজারজাতকরণ সম্পূর্ণরূপে একটি ব্যক্তি মালিকানাধীন সেক্টর যাহার ব্যবস্থাপনা অর্থায়ন এবং নিয়ন্ত্রণে মুখ্য ভূমিকা রাখে একদলমধ্য সত্ত্বাভোগী যাহা আড়তদার এবং মহাজন হিসেবে পরিচিত। প্রকৃত অর্থে, মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন এন্টারপ্রাইজ সার্বিক মাৎস্য শিকলের ব্যবস্থাপনার কেন্দ্র বিন্দুতে অবস্থিত। আমাদের দেশে উন্মুক্ত জলায় থেকে আহরণকৃত মাছ দুই ধরনের আর্টিস্যানাল এবং ইন্ডাষ্ট্রিয়াল (ট্রেলিং শিল্প)। ইন্ডাষ্ট্রিয়াল ফিশারী প্রত্যক্ষভাবে মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরন কারখানায় মাছ যোগান দিয়ে থাকে কিন্তু আর্টিস্যানাল ফিশারী বিভিন্নধাপে পরিচর্যা ও পরিবহন (স্থল পরিবহন রেল পরিবহন এবং জল পরিবহন) এর মধ্য দিয়ে কাঁচামাল যোগান দিয়ে থাকে। কোন কোন সময় প্রক্রিয়াজাতকরন পৌঁছাতে বেশকিছু দিন লেগে যায় ফলে অনেকপ্রজাতির মাছ যাদের Shelf life তুলনামূলকভাবে

কম এসব মাছ খুব তারাতারি নষ্ট হয়ে যায়। এ ক্ষেত্রে তাদের জন্য যথাযথ পরিচর্যা ও সংরক্ষণ খুবই জরুরী। আমাদের প্যাকেজ বা মোড়কের জন্য বাশের ঝুড়ি, কাঠের বাক্স, প্লাস্টিক এবং চটের বেগ ব্যবহৃত হয়। সাধারণতঃ কলাপাতা, হুগলার তৈরী মাদুর, চটের বেগ অপরিবাহী হিসেবে ব্যবহৃত হয়। মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে, মৎস্য গ্রহণ কেন্দ্রে এবং প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় বিভিন্ন প্রভাবকের জন্য মাছের গুণগতমান নষ্ট হয়ে থাকে। প্রভাবক বা কারণগুলো বরফের অপ্রতুলতা, যোগাযোগ অবস্থার দৈন্য দশা, মোড়কের অপর্যাপ্ততা, স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে জ্ঞানের অভাব, গুণগত মান সম্পর্কে সচেতনতার অভাব এবং অবকাঠামোগত সমস্যা অধিকাংশ অবতরণকেন্দ্র গ্রহণ কেন্দ্র এবং পাইকারী বাজার সারা দেশে বিচ্ছন্নভাবে গড়ে উঠেছে এবং মাছের সঠিক পরিচর্যার জন্য সুসংগঠিত এবং পর্যাপ্ত সুযোগ সুবিধার অপ্রতুলতাও বিদ্যমান।

প্রযুক্তি

বাংলাদেশে বহু কাল থেকেই মাছ সংরক্ষণের বিভিন্ন কৌশল চালু হয়ে আসছে। সংরক্ষণের সহজ পদ্ধতিগুলোর মধ্যে শুটকীকরণ, লবণায়ন, লবণায়ন, হিমায়ন এবং আংশিক গাজন প্রক্রিয়া উল্লেখযোগ্য মৎস্য জাত রপ্তানী পণ্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ পদ্ধতি খুব বেশী আধুনিক নয়। চিংড়ি মাথা ছাড়ানো, খোলস ছাড়ানো ইত্যাদি কাজ হাত দ্বারা নিষ্পন্ন করা হয়। এদেশ থেকে মৎস্যজাত দ্রব্যের রপ্তানী অনেক বেড়েছে। কিন্তু মূল্য সংযোজন মৎস্য দ্রব্যাদির উৎপাদন ও রপ্তানী সন্তোষজনক নয়। এর প্রধানতম কারণ হচ্ছে কাঁচামালের নিম্নমান এবং বহুল ব্যবহৃত ব্লক ফ্রিজিং-এর সাদামাঠা প্রযুক্তি। আন্তর্জাতিক বাজারে অনুপ্রবেশের প্রথম প্রযুক্তিগত ধাপ হল ব্লক ফ্রিজিং। বিশেষ করে চিংড়ির জন্য আই.কিউ.এফ (Individual Quick Freezing) হলো আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সংরক্ষণের প্রযুক্তি যেখানে ২০-২৫ শতাংশ বেশী মুনাফা অর্জিত হয়। সামুদ্রিক পোয়া মাছের লবণায়িত শুটকী একটি নতুন প্রযুক্তির উদ্ভাবন যা বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। মৎস্যজাত রপ্তানী পণ্যের মধ্যে শুটকী মাছও একটি অবস্থান করে নিয়েছে। রপ্তানীযোগ্য শুটকী মাছের প্রক্রিয়াজাত করণে স্বাস্থ্যবিধি সম্পর্কে বিশেষভাবে সতর্কতা অবলম্বন একটি জরুরী বিষয়। প্রায় অধিকাংশ মৎস্য প্রক্রিয়াজত করণ কারখানা সুবিধাজনক মোড়ক ব্যবহারের বেশ আগ্রহ দেখাচ্ছে। এদের মধ্যে Modified Atmosphere Packaging (MAP) এবং film vacuum packaging উল্লেখযোগ্য। পার্শ্ববর্তী দেশ সমূহে প্রক্রিয়াজাতকরণ কারখানায় বাইক্যাচ বা অব্যবহৃত মাছ দ্বারা বিভিন্ন মৎস্য উপজাতদ্রব্য যেমন, মাছের সস্, মাছের বল, বার্গার, পেষ্ট ইত্যাদি তৈরি করা হচ্ছে।

গুণগতমান নিশ্চিত করণ

আমদানী কারক দেশসমূহ আমাদের দেশের মৎস্য প্রক্রিয়াকারীদের চাপ দিয়ে আসছে, যেন তাদের মৎস্য প্রক্রিয়াকরণ কারখানায় উৎপাদিত মৎস্যজাত দ্রব্যাদির কার্যকরী গুণগতমান নিশ্চিত করতে পারেন। জনস্বাস্থ্যের জন্য নিরাপদ ও সর্বোচ্চ মান সম্পন্ন মৎস্য উৎপাদনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য হ্যাসাপ (Hazard Analysis Critical Control point) কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন একটি উল্লেখযোগ্য দিক। বাংলাদেশ সরকারের আন্তরিক সহযোগীতায় ই.ইউ এর সব সুপারিশমালা অনুযায়ী অধিকাংশ প্রক্রিয়াজাতরকণ কারখানা একটি নির্দিষ্টমানে উন্নীত করা হচ্ছে। যাহোক, রপ্তানীযোগ্য মৎস্য দ্রব্যাদির রপ্তানীবাজার প্রসারের লক্ষ্যে প্রত্যেকটি কারখানার যথাযথ পর্যবেক্ষণ ও গুণগতমান নিয়ন্ত্রণ করা উচিত। মৎস্য প্রক্রিয়াজাত দ্রব্যাদির রপ্তানীবাজার খুবই প্রতিযোগীতামূলক। মৎস্য অধিদপ্তরের (DOF) আওতাধীন মৎস্য পরিদর্শন ও মাননিয়ন্ত্রণ সার্ভিস (IQCS) কর্তৃক যোগ্য প্রক্রিয়াকারীদের লাইসেন্স অনুমোদন করে থাকে। তাই সংশ্লিষ্ট বিভাগের যথাযথ দায়িত্বের পাশাপাশি জেলে, মৎস্যজীবি, আড়তদার, পাইকারী বিক্রেতা, পরিবহণকারী, প্রক্রিয়াকারী ও রপ্তানীকারক প্রত্যেককে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের পরিদর্শন ও মান নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হওয়া একান্ত বাঞ্চনীয়। আর এসকল কাজে সুষ্ঠ প্রয়োগ ও বাস্তবায়ন হলেই মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণে উন্নয়ন অবশ্যম্ভাবী।

মৎস্য সংক্রান্ত পরিসংখ্যান

রাখাল চন্দ্র কংশ বণিক
নাসিরউদ্দিন মোঃ হুমায়ুন
মৎস্য অধিদপ্তর, ঢাকা

প্রকৃতিগতভাবে বাংলাদেশ জলসম্পদে সমৃদ্ধ। জিডিপিতে মৎস্য সেক্টরের অবদান প্রায় শতকরা ৫ ভাগ। এ দেশের অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে মৎস্য সেক্টর প্রতিনিয়ত ভূমিকা রেখে যাচ্ছে। মৎস্য সেক্টর আমাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, প্রাণীজ আমিষের চাহিদা পূরণ, আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি, পরিবেশের উন্নয়ন, বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনসহ দারিদ্র্য বিমোচনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। আমাদের প্রাণীজ আমিষের শতকরা ৬০ ভাগ আসছে মৎস্য থেকে। মৎস্য উৎপাদন প্রবৃদ্ধি বজায় রেখে দেশের ক্রমবর্ধমান জনগোষ্ঠীর পুষ্টির চাহিদা মিটাতে সচেষ্ট থেকে গ্রামীণ অর্থনীতিকে সচল করে অধিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে মৎস্য সেক্টর উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে যাচ্ছে।

মৎস্য সেক্টরের বিভিন্ন উৎস হতে উৎপাদিত মাছের পরিসংখ্যান সারণি- 'ক' তে দেখানো হলো ঃ-

সারণি 'ক' ঃ বাংলাদেশের জলসম্পদ এবং উৎপাদন বিষয়ক পরিসংখ্যান।

উৎস	জলায়তন (হেক্টর)	উৎপাদন (লক্ষ মেট্রিক টন)		
		১৯৯৫-৯৬	১৯৯৬-৯৭ (প্রাক্কলিত)	১৯৯৭-৯৮ (প্রজেক্টেড)
১। মুক্ত জলাশয়				
নদী ও খাড়ি অঞ্চল (সুন্দরবনসহ)	১,০৩১,৫৬৩	১.৭৩	১.৫৭	১.৬১
বিল	১১৪,১৬১	০.৬১	০.৬৭	০.৭১
কাপ্তাই হ্রদ	৬৮,৮০০	০.০৬	০.০৮	০.০৯
প্লাবন ভূমি	২,৮৩২,৭৯২	৩.৬৯	৩.৭৩	৩.৭৯
মোট (মুক্ত জলাশয়)	৪,০৪৭,৩১৬	৬.০৯	৬.০৫	৬.২০
২। বদ্ধ জলাশয়				
পুকুর	১৪৬,৮৯০	৩.০৮	৩.৫৬	৪.১৬
বাঁওড় (মরা নদীর অংশ)	৫,৪৮৮	০.০৩	০.০৩	০.০৪
উপকূলীয় চিংড়ি খামার	১৪০,০০০	০.৬৮	১.১৫	১.৫০
মোট (বদ্ধ জলাশয়)	২৯২,৩৭৮	৩.৭৯	৪.৭৪	৫.৭০
মোট (অভ্যন্তরীণ জলসম্পদ)	৪,৩৩৯,৬৯৪	৯.৮৮	১০.৭৯	১১.৯০
৩। সামুদ্রিক জলসম্পদ				
ক) ট্রলিং শিল্প		০.১২	০.৩০	০.৩৩
খ) আর্টিশনাল ফিশারিজ		২.৫৭	২.৬৪	২.৬৮
মোট (সামুদ্রিক জলসম্পদ)	১৬,৬০৭,০০০	২.৬৯	২.৯৪	৩.০১
সর্বমোট	২০,৯৪৬,৬৯৪	১২.৫৭	১৩.৭৩	১৪.৯১

(খ) মৎস্য ও মৎস্য জাতীয় পণ্য রপ্তানি

বর্তমানে দেশের রপ্তানি বাণিজ্যের শতকরা ৮ ভাগ যোগান দিচ্ছে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য। মৎস্য সেক্টর বর্তমানে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে ৩য় স্থান দখল করে আছে।

সারণি 'খ' ঃ মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্য সামগ্রী রপ্তানির মাধ্যমে আয় সংক্রান্ত পরিসংখ্যান।

পরিমাণ = মেট্রিক টন
মূল্য = কোটি টাকা

রপ্তানি সামগ্রী	১৯৯২-৯৩		১৯৯৩-৯৪		১৯৯৪-৯৫		১৯৯৫-৯৬		১৯৯৬-৯৭	
	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য	পরিমাণ	মূল্য
১। হিমায়িত চিংড়ি	১৯২২৪	৬০৪.০৩	২২০৫৪	৭৮৭.৩৭	২৬২৭৭	১০৪৫.৬৭	২৫২২৫	১১০৬.৩৯	২৫৭৪২	১১৮৮.৯১
২। হিমায়িত মাছ	২৭০৪	৩৮.৩১	৩১২৫	৫১.১৮	৯২৬৭	১৮০.২৬	৮৮২৭	১৭৬.৬২	৮৭৫৪	১৭৬.৭৪
৩। শুটকি মাছ	১০৪২	১২.২৬	২৪৭৩	৪১.৮৩	৫২১	৮.৩৯	১৮২	৩.০৫	৪২৭	৭.৯২
৪। লবণাক্ত মাছ	৫৯৯	৯.৮৪	৫০	১.০৬	৬৪৯	১৫.৩৫	৪৩৬	১১.৪৭	৫৬১	১৩.৮১
৫। কচ্ছপ/কাছিম	২৮০০	২১.৬০	৪০৮৮	৩৬.৩৭	৪৭৬০	৪০.৬৭	৪২০৩	৩৯.২০	৫৯৫২	৬১.৪৮
৬। হাঙ্গরের পাখনা ও পোটকা	২৩৮	১৪.২৫	৪৫	২.৭৯	২১২	১৬.৬০	৫৬	৪.২১	১১৩	৮.৫৫
মোট রপ্তানি =	২৬৬০৭	৭০০.২৯	৩১৮৩৫	৯২০.৯৬	৪১৬৮৬	১৩০৬.৯৪	৩৮৯২৯	১৩৪০.৯৪	৪১৫৪৯	১৪৫৭.৪১
মোট রপ্তানি আয়ের (%) হার =		৭.৫৭		৯.১২		৯.৩৮		৮.৪৪		৭.৭৫

উৎস- রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো।

গ) মৎস্য হ্যাচারিতে রেণু উৎপাদন

দেশের অভ্যন্তরীণ জলাশয়ে মৎস্য উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য বদ্ধ জলাশয়ের পুকুর, বাঁওড়, কাপ্তাই হ্রদ ইত্যাদিতে কাঙ্ক্ষিত প্রজাতির নির্দিষ্ট আকারের গুণগতমানসম্পন্ন পোনা মজুদ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া বর্তমানে মুক্ত জলাশয়ে যে পোনা মজুদ করা হচ্ছে তা গুণগতমানসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। দেশের বর্ধিত চাহিদাসহ এর ব্যাপক বাজার সৃষ্টি হওয়ার মৎস্য অধিদপ্তরের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা/কর্মচারীদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মাধ্যমে রেণু উৎপাদন সম্পর্কিত কলা-কৌশল বেসরকারি পর্যায়ের সম্প্রসারণের উদ্যোগটি সফলতার সাথে প্রতিপালিত হওয়ার ফলে ব্যক্তিমালিকানাধীন পর্যায়ে এর ব্যাপক প্রসার ঘটেছে। ফলশ্রুতিতে বর্তমানে ব্যক্তি মালিকানাধীন হ্যাচারি হতে প্রায় শতকরা ৯৫ ভাগ রেণুর উৎপাদিত হচ্ছে।

সারণি 'গ' ঃ রেণু উৎপাদন পরিসংখ্যান।

উৎপাদন উৎস	উৎপাদিত রেণুর পরিমাণ (কেজি)	শতকরা হার
ক) প্রাকৃতিক উৎস	২,৩৯৯.০০	২.০২
খ) কৃত্রিম উৎস (হ্যাচারিতে উৎপাদিত)	-	-
১। সরকারী হ্যাচারি/মৎস্য বীজ উৎপাদন খামার	৩,৪৩৭.৫০	২.৯০
২। মৎস্য গবেষণা ইন্সটিটিউট	১,১৭৮.৯২	০.১৫
৩। ব্যক্তিমালিকানাধীন হ্যাচারি (বেসরকারী)	১,১২,৫৯৫.৫৫	৯৪.৯৩
	১,১৯,৬১০.৯৭	১০০.০০

নোট- ৪-৫ দিন বয়সের ১ কেজি রেণু পোনা হতে প্রায় ৪.০ (চার) লক্ষ ধানী পোনা পাওয়া যায়;

উৎস, ফিশারী স্টেটিসটিক্যাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ ১৯৯৫-৯৬।

(ঘ) চিংড়ি চাষ এলাকা -

বাংলাদেশের অর্থনীতিতে মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের ক্ষেত্রে মৎস্যজাত পণ্যের মধ্যে চিংড়ি অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। বহিঃবিশ্বে চিংড়ির বিশাল বাজার সৃষ্টি হওয়ায় সারাদেশে চিংড়ি চাষ এলাকা ব্যাপকভাবে সম্প্রসারিত হচ্ছে। মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনে মৎস্য ও মৎস্যজাত পণ্যের রপ্তানি আয়ের শতকরা ৮০ ভাগ-এর বেশি আসছে চিংড়ি হতে।

সারণি 'ঘ' ঃ বাংলাদেশের চিংড়ি চাষ এলাকা বিষয়ক পরিসংখ্যান (আয়তন হেক্টরে)।

জেলার নাম	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯	১৯৯৩-৯৪	১৯৯৪-৯৫	১৯৯৫-৯৬	বৃদ্ধির হার (%) (ভিত্তি বছর হতে)
চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার	১৯,৫৩১	২৩,৪৩৭	২৪,৭৫৫	২৪,৭৫৫	২৭,৪৫৩	২৯,৭১৭	২৯,৭১৭	২৯,৭১৭	৫২
খুলনা সাতক্ষীরা ও বাগেরহাট	৩১,৮১৭	৩৯,৪৫৩	৬২,১২০	৬৮,৩৬৩	৭৯,৭২৮	১০৩,৯৯৮	১০৩,৯৯৮	১০৩,৯৯৮	২২৭
যশোর	৪২২	৫২৩	৩২৮	৬৯০	৬৯০	৬২৬	৬২৬	৬২৬	৪৮
পটুয়াখালী	৪২	৫২	২৬	৬৪	৩২৬	২৪৬	২৪৬	২৪৬	৪৮৬
নোয়াখালী	-	-	২৬	২৬	৬১	৭৫	৭৫	৭৫	১৮৮
বরিশাল	-	৭৮১	৪৫	১১২	২২	৩,০৯৫	৩,০৯৫	৩,০৯৫	২৯৬
ঢাকা বিভাগ	-	-	-	-	-	২৩৯	২৩৯	২৩৯	-
মোট =	৫১,৮১২	৬৪,২৪৬	৮৭,৩০০	৯৪,০১০	১০৮,২৮০	১৩৭,৯৯৬	১৩৭,৯৯৬	১৩৭,৯৯৬	১২৯৭

নোট- মৎস্য অধিদপ্তরের থানা মৎস্য কর্মকর্তা এবং সহকারী থানা মৎস্য কর্মকর্তা কর্তৃক ১৯৯৩-৯৪ সালে বিস্তারিত জরিপ পরিচালনা করে বর্তমান চাষকৃত চিংড়ি এলাকার আয়তন নিরূপণ করা হয়।

উৎস, ফিশারী স্টেটিসটিক্যাল ইয়ার বুক অব বাংলাদেশ, ১৯৯৫-৯৬।

প্রয়োজনীয় টেলিফোন নম্বর

নাম ও পদবী	☎ নম্বর
মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।	(পি এ বি এক্স ঃ ৮৬৩৬৩৯-৪৩ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৮৬১১৭)
❑ শ্রী সতীশ চন্দ্র রায় মাননীয় প্রতিমন্ত্রী	৮৬২৪৩০, ৮৬১৫৫৫, (অ) ৮৪২৮১৮ (বা)
❑ জনাব সৈয়দ আতাউর রহমান মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর একান্ত সচিব	৮৬৩৯৩০ (অ) ৯১২০৬৮৩ (বা)
❑ জনাব মোঃ নূরুল ইসলাম মাননীয় প্রতিমন্ত্রীর সহকারী একান্ত সচিব	৮৬৪৭০২ (অ) ৯১৩১৬৮৭ (বা)
❑ জনাব এ.এফ.এম আমিনুল ইসলাম তথ্য অফিসার	৮৬২৫১৬ (অ) ৯১২০০৩১ (বা)
❑ জনাব আইয়ুব কাদরী সচিব	৮৬৪৭০০ (অ) ৯১২৮১৪২ (বা)
❑ সচিবের একান্ত সচিব	৮৬১২৫৮ (অ)
❑ জনাব সৈয়দ গোলাম কিবরিয়া যুগ্মসচিব	৮৬৬২৬৩ (অ) ৮২২২৩২ (বা)
❑ জনাব ডি.কে চৌধুরী যুগ্ম সচিব (মৎস্য)	৮৬১৯৭৭ (অ) ৯১২০১৯০ (বা)
❑ জনাব আজিজুল করিম যুগ্ম প্রধান	৮৬৭৯৬৯ (অ) ৯১২০৭১১ (বা)
❑ জনাব আব্দুস সামাদ উপসচিব (প্রশাসন)	৮৬৯৫৬২ (অ) ৮০৫২৫৭ (বা)
❑ জনাব নূরুল আমিন উপসচিব (মৎস্য)	৮৬৯৫৬৫ (অ) ৮৪২৯২০ (বা)
❑ জনাব হেমায়েত উদ্দিন, উপসচিব (সামুদ্রিক)	৮৬৯৫৬৪ (অ)
❑ প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয় সি.জি.এ ভবন ঢাকা	৪১৭৩৩১

নাম ও পদবী	☎ নম্বর
মৎস্য অধিদপ্তর, মৎস্য ভবন ১ পার্ক এ্যাভিনিউ রমনা, ঢাকা-১০০০	(পিএবিএক্সঃ ৯৫৬৫০২১-৩ ৯৫৬৬১০৩-৪ ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-২-৯৫৬৮৩৯৩)
❑ জনাব মোঃ লিয়াকত আলী মহাপরিচালক	৯৫৬২৮৬১ (অ) ৯১১৫৯১১ (বা)
❑ জনাব আব্দুল মতিন পরিচালক (অভ্যন্তরীণ)	৯৫৬৭২১৯ (অ) ৯৫৬৮১২৫ (বা)
❑ জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান পরিচালক (সামুদ্রিক)	৯৫৬১৩৫৫, ৯৫৬১৭১৫ (অ) ৫০৯০০২ (বা)
❑ জনাব মোঃ নাসির উদ্দিন আহমেদ প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৬৯৯৩৪ (অ) ৫০০৩২৫ (বা)
❑ জনাব সমরেন্দ্র নাথ চৌধুরী প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা, কিউ.সি	৯৫৬৭২১৬ (অ) ৩২৭৩৬৯ (বা)
❑ জনাব মোঃ নজরুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক	৯৫৬১৬৮৫ (অ) ৮১৭০৫৭ (বা)
❑ জনাব মোঃ মোজাহার আলী উপপরিচালক (প্রশাঃ)	৯৫৬৭২১৭ (অ) ৯০০৪৬২৯ (বা)
❑ জনাব আব্দুল লতিফ খান উপ-পরিচালক (পরিকল্পনা)	৯৫৫৩০৮৮ (বা)
❑ জনাব মহিউদ্দিন আহমেদ উপ-পরিচালক, মাননিয়ন্ত্রণ	৯৬৬৬১৭৪
❑ জনাব মেছবাহ উদ্দিন আহমেদ উপপ্রধান	৯৫৬১৪৩৭
❑ জনাব মোঃ মোকাম্মেল হোসেন প্রকল্প পরিচালক (সি.বি.এফ.এম)	৯৫৬০৫২৫ (অ), ৪১২৯২৪ (বা)
❑ জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম উপপরিচালক (এ্যাকুয়াকালচার)	৯৫৬১৫৯২ (অ) ৯৩৪৮০০২ (বা)
❑ ডঃ মোঃ মমতাজ উদ্দিন উপপ্রধান	৯৫৬০৫৪৩ (অ) ৯০০৭৯০২ (বা)
❑ জনাব মোঃ ছিদ্দিকুর রহমান উপ-পরিচালক, ঢাকা বিভাগ	৯৫৫০৮২২ (অ) ৯০০৭৮৭৫ (বা)
❑ জনাব এ.কে বর্মন, প্রকল্প পরিচালক	৯৫৫৫৩৫১ (অ)

নাম ও পদবী	☎ নম্বর
❑ জনাব মোঃ জহিরুল ইসলাম উপ-পরিচালক, মৎস্য একাডেমী	৯৫৬০৬৫৩ (অ) ৪১৬২৮৫ (বা)
❑ মিসেস ফেরদৌস পারভিন প্রকল্প পরিচালক এফ.টি.ই.পি	৯৫৬৯৯৫৩ (অ)
❑ জনাব এস.এম. জহিরুল হক প্রকল্প পরিচালক, এফসিডিআই	৯৫৫৪৮৭৫ (অ) ৯৫৬০৪৭২ (বা)
❑ জনাব কে.ইউ.এম শহিদুর রহমান উপ-পরিচালক, এফসিডিআই	৯৫৫৪৮৩৬ (অ)
❑ ডাঃ কিউ.ইউ.এম গোলাম কাদের উপ-পরিচালক, এফসিডিআই	৯৫৫৪৬৯৫
❑ জনাব মোহাম্মদ ইসমাইল জেলা মৎস্য কর্মকর্তা, ঢাকা	৯৫৫৮৮৮৩
❑ জনাব আবুবকর শিকদার প্রধান মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬০৫২২৪ (অ)
❑ বেগম আনওয়ারী সহকারী পরিচালক	৮৩৩৩৯৩ (বা)
❑ জনাব এম.এ. কাফি নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬০৫২৬
❑ জনাব এস.এম নাজমুল ইসলাম সহকারী পরিচালক	৯৫৫৪৭১৭ (অ) ৩২৭৩৮৭ (বা)
❑ জনাব ওয়াহিদুন্নবী চৌধুরী সহকারী প্রধান	৯৫৫২১৭৯ (অ) ৪১০১৭৩ (বা)
❑ জনাব রাখাল চন্দ্র কংস বনিক উর্ধ্বতন বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা	৯৫৫৪৮৬৭ (অ)
❑ জনাব এ.কে.এম ইয়াহিয়া নির্বাহী প্রকৌশলী	৯৫৬৭২১৮ (অ)
❑৪ ডঃ আনোয়ার হোসেন সহকারী পরিচালক	৮১০৭৭১ (বা)
❑ জনাব মোঃ আমিনুল ইসলাম মৎস্য সম্প্রসারণ কর্মকর্তা	৯৫৬৯৩২০
❑ বেগম আখতার জাহান চৌধুরী সহকারী পরিচালক	৯৬৬২৭৯০ (বা)
❑ মিসেস ফরিদা বেগম সহকারী পরিচালক	৯৫৬৯৯৪৩
❑ জনাব মোহাম্মদ আলী মিয়া মূল্যায়ন কর্মকর্তা	৯৫৬০৫১৭ (অ) ৯৩৪২০৩০ (বা)

নাম ও পদবী	☎ নম্বর
❑ জনাব এ.জে.এম বদরুল হাসান উর্ধ্বতন প্রশাসনিক কর্মকর্তা	৯৫৫৫৩৪৯ (অ)
❑ জনাব অর্জুন চন্দ্র চন্দ সহকারী প্রধান	৯৫৬৭২২০ (বা) ৫০৪৮০৮ (বা)

ঢাকা মহানগরী

❑ প্রকল্প পরিচালক, ইফাদেপ, ধানমন্ডি	৯১২৫৫৭৮
❑ ধানমন্ডি লেক	৯১১৮৩৭৪
❑ গুলশান লেক	৬০৭৫৯৮
❑ ফিল্ড ম্যানেজমেন্ট সাপোর্ট সার্ভিস গুলশান	৮৮২৫৯৮ (অ) ৮৮২৫৮৯ (বা)

বিএফডিসি (ফ্যাক্স ঃ ৮৮০-০২-৯৫৬৩৯৯০)
মতিঝিল, ঢাকা।

❑ চেয়ারম্যান	৯৫৬৯০৮৬
❑ পরিচালক বিপণন	৯৫৫৩৯৭৫
❑ ফিশারিজ ট্রেনিং একাডেমী, সাভার	৯৩৪৭০০৬

পরিকল্পনা কমিশন
শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।

❑ যুগ্মপ্রধান (বন,মৎস্য ও পশুপালন উইং)	৮১৪৭৩১
❑ উপপ্রধান (বন, মৎস্য ও পশুপালন উইং)	৯১১৭৫৪৬
❑ সহকারী প্রধান (বন, মৎস্য ও পশুপালন উইং)	৯১১৪৬৫৭
❑ উপ-পরিচালক, আই,এম,ইডি	৯১১০৮০২

মাৎস্য গবেষণা ইনষ্টিটিউট, ময়মনসিংহ

❑ মহা পরিচালক	৫৪৮৭৪ (অ), ৫৫৪১০ (বা)
❑ পরিচালক	৫৪৪১০ (অ), ৫৪২৯২ (বা), ৫৪৮৭৪
❑ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (ময়মনসিংহ)	(০৯১) ৫৪২২১
❑ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (কক্সবাজার)	(০৩৪১) ৩৮৫৫ (অ) (০৩৪১) ৩২২৭ (অ)
❑ মুখ্য বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা (চাঁদপুর)	(০৮৪১) ৩৪০৭ (অ) (০৮৪১) ৩১৩২ (বা)